মাযহাব কি ও কেন

মাওলানা তাকী উছমানী

Contents

মাযহাব কি ও কেন?

প্রথম ভাগ

মাওলানা তাকী উছমানী

দ্বিতীয় ভাগ

মাওলানা সাঈদ আল–মিসবাহ

প্রচ্ছদঃ বশির মেসবাহ

মূল্যঃ সাদাঃ ১২০/= টাকা।

মুদ্রণে

আবদুল্লাহ্ এন্টারপ্রাইজ

৪৯/এ, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা–১২১১।

পরিবেশনায়

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১ ফোন ২৩ ৫৮ ৫০

মোহাম্মদী কতুবখানা

৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

লতীফ বুক করপোরেশন

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

Contents

সূচী পত্র

Contents



প্রকাশকের কথা

মাযহাব, ইজতিহাদ, তাকলীদ– এই শব্দগুলো মুসলিম সমাজে বহু পরিচিত ও বহুল আলোচিত শব্দ। অল্প কথায় শব্দগুলোর ব্যাখ্যা এরকম–

ইজতিহাদের শাব্দিক অর্থ, উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করা। ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় ইজতিহাদ অর্থ, কোরআন ও সুন্নায় যে সকল আহকাম ও বিধান প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেগুলো চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে আহরণ করা। যিনি এটা করেন তিনি হলেন মুজতাহিদ। মুজতাহিদ কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যে সকল আহকাম ও বিধান আহরণ করেন সেগুলোই হলো মাযহাব। যাদের কোরআন ও সুন্নাহ থেকে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে আহকাম ও বিধান আহরণের যোগ্যতা নেই তাদের কাজ হলো মুজতাহিদের আহরিত আহকাম অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়তের উপর আমল করা। এটাই হলো তাকলীদ। যারা তাকলীদ করে তারা হলো মুকাল্লিদ।

বস্তুতঃ ইজতিহাদ নতুন কোন বিষয় নয়, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কোরআনে বা হাদীসে কোন বিধান প্রত্যক্ষভাবে না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান আহরণ করার এবং সে মোতাবেক আমল করার। মু'আয বিন জাবালের হাদীস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তবে এটা বাস্তব সত্য যে, ইজতিহাদের যোগ্যতা সকলের নেই। অথচ কোরআন ও হাদীস তথা শরীয়তের উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ পাক ইজতিহাদের যোগ্যতা দান করেছেন তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে, আর যাদের সে যোগ্যতা নেই তারা তাকলীদের মাধ্যমে কোরআন হাদীস তথা শরীয়তের উপর আমল করবে। এটাই শরীয়তের বিধান। বস্তুতঃ তাকলীদ ও ইজতিহাদ হচ্ছে শরীয়তের দুই ডানা, কোনটি বাদ দিয়ে শরীয়তের উপর চলা সম্ভব নয়। তাই ছাহাবা কেরামের যুগ থেকেই চলে আসছে এই তাকলীদ ও ইজতিহাদ। এখন প্রশ্ন হলো, কোরআন যেখানে এক, হাদীস যেখানে এক সেখানে বিভিন্ন মাযহাব কেন হলো? এ প্রশ্নের জবাব এই

যে, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মন যা চায় সেটা শরীয়ত নয়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যা চান সেটাই হলো শরীয়ত। আর ইমামদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইচ্ছাতেই হয়েছে এবং এতেই উম্মতের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা কোরআন ও হাদীসে মৌলিক বিষয়গুলো (যেমন, তাওহীদ, রিসালত, হাশর, নশর এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ফরজ হওয়া) প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই সেখানে ইমামদের কোন মতপার্থক্যও নেই। পক্ষান্তরে অমৌল বিষয়গুলো পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণনা করে আলিমদের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মতপার্থক্য আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছা না হলে সকল বিষয় অবশ্যই প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হতো।

ইজতিহাদের ক্ষেত্র তথা কোরআন ও সুন্নাহ অভিন্ন হলেও যেহেতু ইজতিহাদকারী মস্তিষ্ক ভিন্ন সেহেতু ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ছাহাবা কেরামের মাঝে ইজতিহাদের মতপার্থক্য হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল কোন পক্ষকেই দোষারোপ করেননি, বনু কোরায়যার হাদীস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বর্ণিত আছে, বনী কোরায়যার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাদের নির্দেশ দিলেন যে, বনু কোরায়যার বস্তিতে পৌঁছে তোমরা আছর নামায পড়বে। কিন্তু পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলো। তখন ছাহাবাদের একাংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে বললেন, আমরা এমনকি নামায কাযা হয়ে গেলেও বনু কোরায়যার বস্তিতে না গিয়ে নামায পড়ব না। কিন্তু অন্যরা ইজতিহাদ প্রয়োগ করে আদেশের উদ্দেশ্য বিচার করে বললেন, দ্রুত গতিতে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়াই ছিলো আদেশের উদ্দেশ্য। নামায কাযা করতে বলা নয়। সুতরাং আমরা পথেই যথাসময়ে নামায আদায় করবো। পরবর্তীতে বিষয়টি তাঁর কাছে আরয করা হলো কিন্তু কোন পক্ষকেই তিনি দোষারোপ করেননি।

কেননা উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য ছিলো শরীয়তের উপর আমল করা, যদিও হাদীসের উদ্দেশ্য নির্ধারণে তারা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং

উভয় পক্ষের মুজতাহিদ এবং তাদের মুকাল্লিদরা সঠিক পথেরই অনুসারী ছিলেন।

যাই হোক, শরীয়তের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ উভয় মহলেই অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা বিদ্যমান। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ না থাকাটাই এর অন্যতম কারণ। এই অভাব পূরণের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা 'মাযহাব কি ও কেন?' বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি, বইয়ের প্রথম অংশ (তাকলীদ ও ইজতিহাদ)টি মূলতঃ পাকিস্তান শরীয়া কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী রচিত 'তাকলীদ কি শরয়ী হাইছিয়ত' এর বাংলা অনুবাদ। আর দ্বিতীয় অংশটি (ইমামদের মতপার্থক্য) গবেষক আলিম মাওলানা ছাঈদ আল-মিসবাহ এর মৌলিক রচনা। বিষয়গত সাদৃশ্যের কারণে দুটোকে একত্রে মাযহাব কি ও কেন? নামে প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের মেহনত অনুগ্রহপূর্বক কবুল করুন।

বিনীত

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

মুহাম্মদী লাইব্রেরী

تقلید کی شرعی حیثیت

ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও ইজতিহাদ

প্রথম ভাগ

মূলঃ
মাওলানা তাকী উছমানী
বিচারপতি শরিয়া কোর্ট, পাকিস্তান

অনুবাদঃ
আবু তাহের মেসবাহ

প্রসংগ কথা

তাকলীদ ও ইজতিহাদ প্রসংগে এ পর্যন্ত এন্তার লেখা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে নতুন গবেষণাকর্ম সংযোজন করতে পারবো তেমন ধারণাও আমার ছিলো না। কিন্তু কুদরতের পক্ষ থেকেই যেন আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার পরিবেশ ও কার্যকারণ তৈরী হয়ে গেলো।

ষাট দশকের দিকে পকিস্তানে তাকলীদ প্রসংগে বিতর্কের ঝড় শুরু হলো। আর বিতর্কের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যা হয়ে থাকে এখানেও তাই হলো। অর্থাৎ উভয় পক্ষই বাড়াবাড়ীর চূড়ান্ত করে ছাড়লো। এমনকি পক্ষ বিপক্ষকে কাফের, গোমরাহ বলতেও পিছপা হলো না। সত্যানুসন্ধান যেন কারো উদ্দেশ্য নয়। নিজস্ব অবস্থান নির্ভুল প্রমাণ করাই একমাত্র লক্ষ্য। ফলে বিতর্কের সেই ধুলিঝড়ে কোরআন–সুন্নাহর নূরাণী আলো আড়াল হয়ে গেলো। তখন ১৯৬৩ তে করাচী থেকে প্রকাশিত ফারান সাময়িকীর মান্যবর সম্পাদক মাহের আল কাদেরী আমাকে তাকলীদ সম্পর্কে একটি তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখার ফরমায়েশ করলেন। আমিও এই ভেবে রাজি হয়ে গেলাম যে, কোরআন–সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাকলীদ ও ইজতিহাদের স্বরূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে সকলে একটি স্বচ্ছ ও বাস্তব ধারণা লাভ করবেন এবং সকলের সামনে চিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। প্রবন্ধটি ১৯৬৩ সালে ফারান এর মে সংখ্যায় প্রকাশিত হলো এবং আল্লাহর মেহেরবাণীতে বুদ্ধিজীবী মহলে তা প্রত্যাশার অধিক প্রশংসিত হলো। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা তা পুনঃপ্রকাশও করল। এমন কি ভারতের জুনাগড় থেকে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হলো।

এরপর দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত এ বিষয়ে কলম ধরার ফুরসত ও প্রয়োজন কোনটাই হয়নি। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ বন্ধু মহল থেকে বার বার অনুরোধ ও তাগাদা আসছে, ভারতের মত পাকিস্তানেও প্রবন্ধটিকে স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ–পঞ্জি রূপে এটি ধরে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তাবটি আমার মনঃপূত হলো। তাই প্রবন্ধটি

আগাগোড়া সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজে মনোনিবেশ করলাম। সাপ্তাহিক আল-ইতিসামে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী (রঃ) যে ধারাবাহিক সমালোচনা লিখেছেন সেটিও আমার সামনে ছিলো। তাই তিনি যে সকল 'একাডেমিক' প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেগুলোর সন্তোষজনক সমাধানও ইতিবাচক আংগিকে এসে গেছে। সম্পূর্ণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে এটি এখন পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করছি।

তবে এ কথা বলে দেয়া খুবই জরুরী মনে করি যে, এটা বিতর্ক-বিষয়ক গ্রন্থ নয় বরং তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে একটা বিনীত গবেষণাকর্ম মাত্র। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী উম্মাহর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামত ও অবস্থান তুলে ধরা। যারা প্রায় সকল যুগেই ইমাম ও মুজতাহিদগণের তাকলীদ করে আসছেন; সেই সাথে তাকলীদ সম্পর্কে সবরকম বাড়াবাড়ী পরিহার করে আহলে সুন্নাত আলিমগণের গরিষ্ঠ অংশ যে ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করে আসছেন পাঠকবর্গের খিদমতে সেটা তুলে ধরাও আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং বিতর্কের মনোভাব নিয়ে নয় বরং একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভংগী নিয়েই এ আলোচনা পড়া উচিত হবে। সংস্কারবাদী লোকদের পক্ষ থেকে মুক্তবুদ্ধির নামে তাকলীদের বিরুদ্ধে যে সব প্রচারণা চালানো হচ্ছে আশা করি সেগুলোরও সন্তোষজনক উত্তর এখানে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত প্রার্থনা। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তিনি যেন কবুল করেন এবং ইসলামী উম্মাহর জন্য তা কল্যাণবাহী করেন। আমীন।

"আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করছি। তাঁর হুজুরেই আমি সমর্পিত হচ্ছি।

বিনীত মুহাম্মদ তাকী উসমানী

করাচী, দারুল উলূম

৪ জুমাদাল উখরা, ১৩৯৬ হিঃ

তাকলীদের হাকীকত

মুসলিম হিসাবে আমাদের অন্তরে এ নিষ্কম্প বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের মাধ্যমে লা–শারীক আল্লাহর একক ও নিরংকুশ আনুগত্যই হলো ইসলামের মূল কথা– তাওহীদের সারনির্যাস। এমন কি স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যও এজন্য অপরিহার্য যে, আসমানী ওয়াহীর তিনি সর্বশেষ অবতরণ ক্ষেত্র এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' শরীয়তে ইলাহীয়ারই প্রতিবিম্ব।

সুতরাং দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলেরই আনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিতচিত্তে; এখলাস ও একনিষ্ঠার সাথে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এ আনুগত্যের সামান্যতম হকদার মনে করারই অপর নাম হলো শিরক। অন্য কথায় হালাল–হারাম সহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধি–বিধানের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহই হলো মাপকাঠি। আর এ দু'য়ের একক আনুগত্যই হলো ঈমান ও তাওহীদের দাবী। এ বিষয়ে ভিন্নমতের কোনও অবকাশ নেই। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আহকাম দু'ধরনের। কিছু আহকাম যাবতীয় অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, বাহ্যবিরোধ মুক্ত এবং সে গুলোর উদ্দেশ্য ও মর্ম এতই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে, বিশিষ্ট সাধারণ সকলের পক্ষেই নির্ঝন্ঝাটে তা অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন কোরআনুল কারীমের ইরশাদ–

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (سورة الحجرات)

তোমাদের কেউ যেন কারো গীবতে লিপ্ত না হয়।

আরবী জানা যে কেউ অনায়াসে এ আয়াতের মর্ম অনুধাবন করতে পারে। কেননা এখানে যেমন কোন অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই তেমনি নেই কোরআন ও সুন্নাহর অন্য কোন নির্দেশের সাথে এর বাহ্যবিরোধ।

অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলের ইরশাদ- لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ

আরব অনারবের মাঝে তাকওয়া ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের আর কোন ভিত্তি নেই।

অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত এ হাদীসেরও বাণী ও মর্ম অনুধাবন করা আরবী জানা যে কারো জন্যই সহজসাধ্য।

পক্ষান্তরে সকলের পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব, এমন আহকামের সংখ্যাও কোরআন সুন্নায় কম নয়। সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক উপস্থাপনা কিংবা আয়াত ও হাদীসের দৃশ্যতঃ বৈপরিত্যের কারণে এ জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কোরআনুল কারীমের ইরশাদ–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ

তালাকপ্রাপ্তারা তিন 'কুরু' পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা নির্দেশ প্রসংগে এখানে قـــروء শব্দটির ব্যবহার এসেছে। কিন্তু মুশকিল হলো; আরবী ভাষায় হায়েয ও তোহর[১] উভয় অর্থে আলোচ্য শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং প্রথম অর্থে ইদ্দতের সময়সীমা হবে তিন হায়েয। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে সে সময়সীমা দাঁড়াবে তিন তোহর। বলাবাহুল্য যে, قـــروء শব্দের দ্ব্যর্থতাই এ জটিলতার কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো; এ দুই বিপীরত অর্থের কোনটি আমরা উম্মী লোকেরা গ্রহণ করবো?

১। হায়েয অর্থ স্ত্রী লোকের মাসিক ঋতুস্রাব। শরীয়তের দৃষ্টিতে হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিনদিন ও সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন। তিন দিনের কম ও দশ দিনের অধিক রক্ত দেখা দিলে সেটা হায়েয নয়। ফিকাহর পরিভাষায় সেটা ইসতিহাযাহ। হায়েযের সময় সালাত মাওকুফ ও সিয়াম স্থগিত থাকে। কিন্তু ইসতিহাযার সময় সালাত, সিয়াম সবই স্বাভাবিক নিয়মে করে যেতে হয়।

তোহর অর্থ দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তোহরের সর্বনিম্ন সীমা পনের দিন। অর্থাৎ একবার হায়েয হওয়ার পর পনের দিনের কম সময়ে দ্বিতীয় হায়েয হতে পারে না। এ সময়ে রক্ত দেখা দিলে সেটা ইসতিহাযাহ হবে। তোহরের সর্বোচ্চ কোন সময়সীমা নেই। অর্থাৎ রোগ বা অন্য কোন কারণে এক হায়েযের পর দু, তিন, চার, পাঁচ বা অন্য কোন কারণে এক হায়েযের পর দু, তিন, চার, পাঁচ মাস এমনকি আরো বিলম্বে পরবর্তী হায়েয হতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ গ্রন্থে দেখুন।

তদ্রূপ হাদীসে রাসূলের ইরশাদ–

مَنْ لَّمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ

বর্গা ব্যবস্থা যে পরিহার করে না তাকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ঝুঁকি নিতে হবে।

আলোচ্য হাদীস কঠোর ভাষায় বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ করলেও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার কারণে এটা অস্পষ্ট যে, বর্গা প্রথার সব ক'টি পদ্ধতিই নিষিদ্ধ না বিশেষ কোন পদ্ধতি উক্ত নিশেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত? এ প্রশ্নের সমাধান পেতে রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন।

আরেকটি উদাহরণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

ইমামের ক্বিরাত মুকতাদীর ক্বিরাতরূপে গণ্য হবে।

এ হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া কিছুতেই চলবে না। অথচ অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاری)

সূরাতুল ফাতেহা যে পড়েনি তার নামাজ শুদ্ধ হয়নি।

এ হাদীসের আলোকে ইমাম মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক। হাদীসদ্বয়ের এ দৃশ্যতঃ বিরোধ নিরসনকল্পে প্রথম হাদীসকে মূল ধরে দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এ হাদীসের লক্ষ্য ইমাম ও মুনফারিদ, মুক্তাদী নয়। সুতরাং ইমাম ও মুনফারিদের জন্য সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও মুক্তাদীর জন্য তা নিষিদ্ধ। কেননা, ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর ক্বিরাত বলে গণ্য হবে।

আবার দ্বিতীয় হাদীসকে মূল ধরে প্রথমটির এরূপ ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এখানে এর অর্থ হলো, 'সুরাতুল ফাতিহা'র সাথে অন্য সূরা যোগ করা। অর্থাৎ (দ্বিতীয় হাদীসের আলোকে ইমাম, মুনফারিদ ও মুক্তাদী) সবার জন্য সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও অন্য সূরা যোগ করার ক্ষেত্রে মুক্তাদীর জন্য ইমামের ক্বিরাতই যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো; এ ব্যাখ্যাদ্বয়ের কোনটি আমরা গ্রহণ করবো? এবং কোন যুক্তিতে একটি ব্যাখ্যা পাশকেটে অন্যটিকে প্রাধান্য দিবো?

কোরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলে সমাধান কল্পে আমরা দুটি পন্থা অনুসরণ করতে পারি। অর্থাৎ নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রথম জামানার মহান পূর্বসূরীগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ।

ইনসাফের দৃষ্টিতে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা এই যে, প্রথম পন্থাটি অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল ও বিপদসংকুল।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি হলো বাস্তবসম্মত ও নিরাপদ। এটা অতিরিক্ত বিনয় কিংবা হীনমন্যতা নয়; বাস্তব সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি মাত্র। কেননা ইলম ও হিকমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও স্মৃতি শক্তি, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য ও নিঃশ্বতা এতই প্রকট যে, খায়রুল কুরুন তথা তিন কল্যাণ যুগের আলিম ও ওয়ারিসে নবীগণের সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়াও এক নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া কিছু নয়। তদুপরি খায়রুল কুরুনের মহান আলিমগণ ছিলেন পবিত্র কোরআন অবতরণের সময় ও পরিবেশের নিকটতম প্রতিবেশী। এ নৈকট্যের সুবাদে কোরআন সুন্নাহর মর্ম অনুধাবন ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ তাদের জন্য ছিলো সহজ ও স্বচ্ছন্দপূর্ণ। পক্ষান্তরে নবুওতের 'পূন্যস্নাত' যুগ থেকে সময়ের এত সূদীর্ঘ ব্যবধানে আমরা দুনিয়ায় এসেছি যে, কোরআন সুন্নাহর পটভূমি, পরিবেশ এবং সে যুগের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও বাক্ধারা সম্পর্কে নিঁখুত, নির্ভূল ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কষ্ট সাধ্য এবং পদস্খলনের আশংকা পূর্ণ অবশ্যই। অথচ সঠিক অনুধাবনের জন্য এটা একান্ত অপরিহার্য।

এ সকল কারণে জটিল ও সূক্ষ্ম আহকামের ক্ষেত্রে নিজেদের ইলম ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা না করে খায়রুল কুরুনের মহান পূর্বসূরী আলিমগণের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করাই হলো নিরাপদ ও যুক্তিসম্মত। আর এটাই তাকলীদের খোলাসা কথা।

আমি আমার বক্তব্য পরিবেশনে ভুল না করে থাকলে এটা নিশ্চয় প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্ব্যর্থতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা দৃশ্যতঃ বৈপরিত্যের কারণে কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলেই শুধু ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে সহজ ও সাধারণ আহকামের ক্ষেত্রে তাকলীদের বিন্দু মাত্র প্রয়োজন নেই। সুপ্রদ্ধি হানাফী আলিম আব্দুল গণী লাবলুসী (রাঃ) লিখেছেন–

فَالْأَمْرُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْمَعْلُوْمُ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ لَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّقْلِيْدِ فِيْهِ لِأَحَدِ الْأَرْبَعَةِ كَفَرْضِيَّةِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا وَحُرْمَةِ الزِّنَا وَاللِّوَاطَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ وَالْأَمْرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ هُوَ الَّذِىْ يُحْتَاجُ إِلَى التَّقْلِيْدِ فِيْهِ ـ

সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে চার ইমামের কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই। যেমন, সালাত, সিয়াম, জাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং জিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি হারাম হওয়া দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ বিষয়ে কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই।) পক্ষান্তরে ভিন্নমতসম্বলিত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদের প্রয়োজন।

আল্লামা খতীব বোগদাদী (রঃ) লিখেছেন

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا يُعْلَمُ ضَرُوْرَةً مِّنْ دِيْنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ وَ

الزكوة وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه لان الناس كلهم يشتركون في ادراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه، وضرب اخر لا يعلم الا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الاحكام فهذا يسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولانا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل احد ان يتعلم ذلك وفي ايجاب ذلك قطع عن المعايش وهلاك الحرث و الماشية فوجب ان يسقط۔

শরীয়তের আহকাম দু' ধরনের। অধিকাংশ আহকামই দ্বীনের অংশরূপে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যেমন; পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির ফরজিয়ত বা অপরিহার্যতা এবং যিনা, মদ্যপান ইত্যাদির হুরমত ও নিষিদ্ধতা। এ সকল ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বৈধ নয়। কেননা এগুলো সবার জন্য সমান বোধগম্য। পক্ষান্তরে ইবাদত, মুয়ামালাত, ও বিয়ে-শাদীর খুঁটিনাটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে রীতিমত বিচার গবেষণা প্রয়োজন বিধায় তাকলীদ অপরিহার্য। ইরশাদ হয়েছে- "তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও।" তদুপরি এ সকল ক্ষেত্রে তাকলীদ নিষিদ্ধ হলে সবাইকে বাধ্যতামূলক ইলম চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই অচল হয়ে যাবে। আর খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসার-পরিবার সবই উচ্ছন্নে যাবে। এমন আত্মঘাতী পথ অবশ্যই বর্জনীয়

পাক-ভারত উপমহাদেশের বিরল ব্যক্তিত্ব হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) লিখেছেন-

শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও মাসায়েল তিন প্রকার, প্রথমতঃ দৃশ্যতঃ

বিরোধপূর্ণ দলিলনির্ভর মাসায়েল। দ্বিতীয়তঃ দ্ব্যর্থবোধক দলিলনির্ভর মাসায়েল। তৃতীয়তঃ দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট দলিলনির্ভর মাসায়েল। প্রথম ক্ষেত্রে আয়াত ও হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদের করণীয় হলো ইজতিহাদ আর সাধারণের করণীয় হলো পূর্ণাংগ তাকলীদ।

উসূলে ফিকাহর পরিভাষায় দ্বিতীয় প্রকার আহকামগুলো বা দ্ব্যর্থবোধক দলিলনির্ভর। এ ক্ষেত্রেও মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ আর সাধারণের কর্তব্য হলো মুজতাহীদের হুবহু অনুসরণ। তৃতীয় প্রকার আহকামগুলো উসূলে ফিকাহর পরিভাষায় الدلالة القطعي বা অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিলনির্ভর। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়েরই আমরা বিরোধী।১

মোটকথা; কাওকে আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়ে তার স্বতন্ত্র আনুগত্য তাকলীদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মুজতাহিদ নির্দেশিত পথে কোরআন-সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণই হলো তাকলীদের নির্ভেজাল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আহকামের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর যথার্থ মর্ম অনুধাবনের জন্যই আমরা আইনজ্ঞ হিসাবে মুজতাহিদের শরণাপন্ন হই এবং পূর্ণ সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করি। পক্ষান্তরে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আহকামের ক্ষেত্রে ইমাম ও মুজতাহিদের সাহায্য ছাড়াই যেহেতু কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুধাবন ও অনুসরণ সম্ভব সেহেতু তাকলীদও সেখানে নিরর্থক। উপরের উদ্ধৃতি তিনটি এ বক্তব্যেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইসলামী ফেকাহর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে প্রমাণ মিলে যে, মুজতাহিদ কোন ক্রমেই আইন প্রণয়নকারী নন বরং কোরআন-সুন্নায় বর্ণিত আইনের ব্যাখ্যা দানকারী মাত্র। আল্লামা ইবনে হোমাম ও আল্লামা ইবনে নজীম (রঃ) তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে।

اَلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ اِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا -

যার বক্তব্য শরীয়তের উৎস নয়, তার বক্তব্যকে দলিল প্রমাণ দাবী না করে মেনে নেয়ার নাম তাকলীদ।

১। الاقتصاد فى التقليد والاجتهاد ص/٣٤ دهلى

সুতরাং একজন মুকাল্লিদ (তাকলীদকারী) কোনক্রমেই মুজতাহিদকে শরীয়তের স্বতন্ত্র উৎস মনে করে না বরং ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই সে বিশ্বাস করে যে, কোরআন ও সুন্নাহ (এবং সেই সূত্রে ইজমা ও কিয়াস)ই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের শাশ্বত উৎস। ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা শুধু এজন্য যে, কোরআন-সুন্নাহর বিশাল ও বিস্তৃত জগতে সে একজন আনাড়ী পথিক। পক্ষান্তরে মুজতাহিদ হলেন কোরআন সুন্নাহর মহা সমুদ্র মন্থনকারী আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সুতরাং শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার পরিবেশিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তই আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।

এবার আপনি ইনসাফের সাথে বিচার করে বলুন, শিরক নামে আখ্যায়িত করার মত এমন কি অপরাধটা এখানে হলো? তাকলীদের নামে কাউকে আইন প্রণেতার মর্যাদায় বসানো নিঃসন্দেহে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতা ও পবিত্রতার এ দৈন্যের যুগে নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ভরসা না করে আইনের ব্যাখ্যদানকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করাই নিরাপদ। শরীয়ত ও যুক্তির দাবীও তাই।

ধরুন, দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ আকারে আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু দেশের কোটি কোটি নাগরিকের মধ্যে কয়জন সংবিধানের উপর সরাসরি আমল করতে পারে? নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কথা তো বলাই বাহুল্য। এমন কি যারা আইনশাস্ত্রে সনদধারী নন, অথচ উচ্চ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, তারাও ইংরেজী জানেন বলেই আইনগ্রন্থ খুলে আইনের জটিল ধারা সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোকামি করেন না, বরং বিজ্ঞ আইনবিদের পরামর্শ মেনে চলারই প্রয়োজন অনুভব করেন। এটা নিশ্চয় কোন অপরাধ নয় এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সরকারের পরিবর্তে আইনবিদকে আইন প্রণেতার মর্যাদা দানের অভিযোগও তুলবে না কিছুতেই। তাকলীদের ব্যাপারটাও কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। কেননা তাকলীদের দাবী শুধু এই যে, জটিল মাসায়েলের ক্ষেত্রে কোরআন- সুন্নাহ সম্পর্কে মুজতাহিদ প্রদত্ত ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে তার নির্দেশিত পথেই কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল

করে যেতে হবে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এ অপবাদ দেয়া যায় না যে, মুকাল্লিদ কোরআন–সুন্নাহর পরিবর্তে মুজতাহিদকে শরীয়তের উৎস মনে করে তাওহীদের সীমা লংঘন করেছে।

কোরআন ও তাকলীদঃ

প্রধানতঃ তাকলীদ দুই প্রকার– تقليد مطلق (মুক্ততাকলীদ) ও تقليد شخصى (ব্যক্তিতাকলীদ)।

শরীয়তের পরিভাষায় সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণের নাম তাকলীদে মুতলাক বা মুক্ততাকলীদ। পক্ষান্তরে সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণের নাম তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তিতাকলীদ।

অবশ্য উভয় তাকলীদেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নিজস্ব যোগ্যতার অভাবহেতু সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহীদের পরিবেশিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কোরআন–সুন্নাহর উপর আমল করে যাওয়া। বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত অর্থে তাকলীদের বৈধতা ও অপরিহার্যতা কোরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

প্রথমে আমরা তাকলীদের সমর্থনে কোরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত কিঞ্চিত ব্যাখ্যা সহ পেশ করবো।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء ٥٩)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ইতায়াত করো এবং রসূলের ইতায়াত করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদেরও।

প্রায় সকল তাফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়াতের 'উলিল আমর' শব্দটি দ্বারা কোরআন–সুন্নাহর ইলমের অধিকারী ফকীহ ও মুজতাহিদগণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত মুজাহেদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত আতা বিন আবী বারাহ রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি। হযরত আতা বিন ছাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আলিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ জগদ্বরেণ্য আরো অনেক তাফসীরকার। দু' একজনের মতে অবশ্য আলোচ্য উলিল আমরের অর্থ হলো মুসলিম শাসকবর্গ। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা ইমাম রাজি প্রথম তাফসীরের সমর্থনে বিভিন্ন সারগর্ভ যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করে শেষে বলেছেন। "বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতের اولى الا مر ও العلماء শব্দদুটি সমার্থক"।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাসের মতে اولى الا مر শব্দটিকে বিস্তৃত অর্থে ধরে নিলে উভয় তাফসীরের মাঝে মুলতঃ কোন বিরোধ থাকে না। কেননা তখন আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে– "রাজনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে তোমরা প্রশাসকবর্গের এবং আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে আলিমগণের ইতায়াত করো। অন্য দিকে আল্লামা উবনুল কায়্যিমের মতে اولى الا مر এর অর্থ– 'মুসলিম শাসক' ধরে নিলে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। কেননা আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ আলিমগণের ইতায়াত করতে বাধ্য। সুতরাং শাসকবর্গের ইতায়াত আলিমগণের ইতায়াতের নামান্তর মাত্র।১

মোটকথা; আলোচ্য আয়াতের আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের ইতায়াত যেমন ফরজ তেমনি কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে আলেম ও মুজতাহিদগণেরও ইতায়াত ফরজ। আর এরই পারিভাষিক নাম হলো তাকলীদ।

অবশ্য আয়াতের শেষ অংশ করো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। ইরশাদ হয়েছে–

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

১। আহকামুল কোরআন খঃ২ পৃঃ ২৫৬ উলিল আমর প্রসংগ, তাফসীরে কবীর খঃ৩ পৃঃ৩৩৪,
আলামুল মুআক্কায়ীন খঃ১ পৃঃ ৭

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ইতায়াত করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' তাদেরও। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সমীপেই পেশ করো, যদি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর তোমরা ঈমান এনে থাকো।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আয়াতের প্রথমাংশে সর্বসাধারণকে এবং শেষাংশে মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। আহকামুল কোরআন প্রণেতা আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাসের ভাষায়–

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَقِيْبَ ذٰلِكَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُوْلِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ الخ فَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ إِلَىٰ كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَتِ الْعَامَّةُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هٰذِهِ مَنْزِلَتَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُوْنَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللّٰهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوْهِ دَلَائِلِهِمَا عَلَىٰ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ فَثَبَتَ أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْعُلَمَاءِ

(فان تنازعتم) অংশটি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, اولى الامر এর অর্থ ফকীহ ও মুজতাহিদ ছাড়া অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ সর্বসাধারণকে উলিল আমর বা মুজতাহিদের ইতায়াতের হুকুম দিয়ে তাঁদেরকে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকের সে যোগ্যতা নেই। সুতরাং অবধারিতভাবেই বলা যায় যে, আয়াতের শেষাংশে আলিম ও মুজতাহিদগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ আহলে হাদীস পণ্ডিত আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও فتح البيان গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌّ مُسْتَأْنَفٌ مُوَجَّهٌ لِلْمُجْتَهِدِيْنَ

স্পষ্টতঃই এখানে মুজতাহিদগণকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের নির্দেশমতে সাধারণ লোকেরা উলিল আমর তথা মুজাহিদগণের বাতানো মাসায়েল মোতাবেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের ইতায়াত করবে। পক্ষান্তরে আয়াতের শেষাংশের নির্দেশ মতে মুজতাহিদগণ তাদের ইজতিহাদ প্রয়োগের মাধ্যমে কোরআন–সুন্নাহ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সুতরাং ইজতিহাদের যোগ্যতাবঞ্চিত লোকেরাও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোরআন হাদীস চষে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এ ধরনের দায়িত্ব–জ্ঞানহীন উক্তির কোন অবকাশ আলোচ্য আয়াতে নেই।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (نساء، ٨٣)

তাদের (সাধারণ মুসলমানদের) কাছে শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌছলে তারা তার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি যদি তারা রাসূল এবং উলিল আমরগণের কাছে পেশ করতো তাহলে ইস্তিম্বাত ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টি (রাসূল রহস্য) উদঘাটন করতে পারতো।

আয়াতের শানেনুযূল এই; সুযোগ পেলেই মদিনার মুনাফিকরা যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে নিত্য নতুন গুজব ছড়াতো। আর সে গুজবে কান দিয়ে দু'একজন সরলমনা ছাহাবীও অন্যদের কাছে তা বলে বেড়াতেন। ফলে মদিনায় এক অস্বস্তিকর ও অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হতো। তাই ঈমানদারদের সর্তক করে দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন; যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত যে কোন খবরই আসুক, নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে তাদের কর্তব্য হলো, উলিল আমরগণের শরণাপন্ন হওয়া এবং অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণের পর যে সিদ্ধান্ত তারা দেন অম্লান বদনে তা মেনে নিয়ে সে মুতাবেক আমল করা।

এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উসুলে তাফসীর ও উসুলে ফিকাহর সর্বসম্মত মূলনীতি অনুযায়ী আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে আয়াতের বিশেষ প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে শব্দের স্বাভাবিক ব্যাপকতার বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। সুতরাং আলোচ্য আয়াত থেকে এ মৌলিক নির্দেশ আমরা পাই যে, কোন জটিল বিষয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে সর্বসাধারণের কর্তব্য হলো, প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিগণের শরণাপন্ন হওয়া এবং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁদের নির্ধারিত পথ ও পন্থা অম্লান বদনে মেনে নেয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম তাকলীদ।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম রাজী লিখেছেন

فَثَبَتَ اَنَّ الاِسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ وَالقِيَاسُ اِمَّا اسْتِنْبَاطٌ اَوْ دَاخِلٌ فِيْهِ، فَوَجَبَ اَنْ يَكُوْنَ حُجَّةً اِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ: اَلْاٰيَةُ دَالَّةٌ عَلٰى اُمُوْرٍ اَحَدُهَا اَنَّ فِىْ اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاِسْتِنْبَاطِ وَثَانِيْهَا اَنَّ الْاِسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ، وَثَالِثُهَا اَنَّ الْعَامِىَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيْدُ الْعُلَمَاءِ فِىْ اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ শরীয়তস্বীকৃত একটি হুজ্জত বা দলিল। আর কিয়াসের প্রক্রিয়াটি ইজতিহাদের সমার্থক কিংবা অন্তর্ভুক্ত বিধায় সেটাও শরীয়তস্বীকৃত হুজ্জত। মোটকথা; এ আয়াত থেকে তিনটি বিষয় স্থীর হলো, প্রথমতঃ কোরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশের অবর্তমানে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত শরীয়তস্বীকৃত হুজ্জত। তৃতীয়তঃ উদ্ভূত সমস্যা ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে 'আম' লোকের পক্ষে আলিমগণের তাকলীদ করা অপরিহার্য।

অবশ্য কারো কারো মৃদু আপত্তি এই যে, এটা যুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কিত আয়াত। সুতরাং যুদ্ধ বহির্ভূত ও শান্তিকালীন অবস্থাকে এর আওতাভুক্ত করা যায় না।১ কিন্তু এ ধরনের স্থূল আপত্তির উত্তরে আগেই আমরা

---

১ 'মুক্ত বুদ্ধি আন্দোলন' (উর্দু) মাওঃ মুহাম্মদ ইস্মাইল সলফী কৃত, পৃষ্ঠাঃ ৩১

বলে এসেছি যে, আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে শানে নুযুলের বিশেষ প্রেক্ষাপট নয় বরং শব্দের স্বাভাবিক ব্যাপকতাই বিচার্য। তাই আল্লামা ইমাম রাজী লিখেছেন,

إِنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُرُوبِ وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ الْوَقَائِعِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَمْنَ وَالْخَوْفَ حَاصِلٌ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ التَّكْلِيفِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُوجِبُ تَخْصِيصَهَا بِأَمْرِ الْحُرُوبِ

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধান আলোচ্য আয়াতের বিস্তৃত পরিধির অন্তর্ভুক্ত। কেননা আহকাম সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রেই শান্তি ও শংকার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। মোটকথা; এখানে এমন কোন শব্দ নেই যা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সাথে আয়াতের সীমাবদ্ধ সম্পর্ক দাবী করে।

আরো সম্প্রসারিত আকারে একই উত্তর দিয়েছেন ইমাম আবু বকর জাস্সাস (রঃ)। সেই সাথে বেশ কিছু প্রাসংগিক প্রশ্ন-সন্দেহেরও অত্যন্ত চমৎকার সমাধান পেশ করেছেন তিনি।১

এমনকি সুপ্রসিদ্ধ আহলে হাদীস পন্ডিত নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও আলোচ্য আয়াতের আলোকে কিয়াসের বৈধতা প্রমাণ করে লিখেছেন।

فِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ، وَأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ .... مَا يُدْرَكُ بِالْاِسْتِنْبَاطِ

এখানে কিয়াসের বৈধতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাতের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কিন্তু আমাদের বিনীত জিজ্ঞাসা; শান্তিকালীন অবস্থার সাথে আয়াতের কোন সম্পর্ক না থাকলে এর সাহায্যে কিয়াসের বৈধতা কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

১। —— احكام القرآن للجصاص ج/٢/ص/ ٢١٣

তৃতীয় আয়তঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة، ١٢٣)

ধর্মজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়ে না, যেন ফিরে এসে স্বজাতিকে তারা সতর্ক করতে পারে?

আয়াতের মূল বক্তব্য অনুযায়ী উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল বিদ্যমান থাকা একান্তই জরুরী যারা দিবা–রাত্র কোরআন–সুন্নাহর ইলম অর্জনে নিমগ্ন থাকবে এবং ইলম অর্জনের সুযোগ বঞ্চিত মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে। আরো পরিষ্কার ভাষায় একটি নির্বাচিত জামাতের প্রতি নির্দেশ হলো, কোরআন–সুন্নাহর পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের এবং সর্বসাধারণের প্রতি নির্দেশ হলো তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার। তাকলীদও এর বেশী কিছু নয়।

আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রঃ) লিখেছেন।

فَأَوْجَبَ الْحَذَرَ بِإِنْذَارِهِمْ وَأَلْزَمَ الْمُنْذَرِيْنَ قَبُوْلَ قَوْلِهِمْ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আলিমগণকে সতর্ক করার এবং সর্বসাধারণকে সে সতর্কবাণী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন

চতুর্থ আয়াতঃ

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النحل ٤٣ والانبياء ٧

'তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।'

আলোচ্য আয়াতও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে। কেননা এখানথেকে এ মৌলিক নির্দেশ আমরা পাই যে, অনভিজ্ঞ ও অপরিপক্কদেরকে অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করতে হবে। তাকলীদের খোলাসা কথাও এই। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে আল্লামা আলুসী লিখেছেন;

وَاسْتَدَلَّ بِهَا اَيْضًا عَلٰى وُجُوْبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِيْمَا لَا يُعْلَمُ وَ فِى الْاِكْلِيْلِ لِلْجَلَالِ ...... اَلسُّيُوْطِىْ اَنَّهُ اِسْتَدَلَّ بِهَا عَلٰى جَوَازِ تَقْلِيْدِ الْعَامِّىِّ فِى الْفُرُوْعِ

আলোচ্য আয়াতে (শরীয়তের) জটিল বিষয়ে আলেমগণের সিদ্ধান্ত মেনে চলার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। ইমাম সুয়ুতীর মতেও এ আয়াত মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের জন্য তাকলীদের বৈধতা প্রমাণ করছে।

অনেকে বলেন, এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। পূর্ণ আয়াত এরূপ–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

আপনার পূর্বেও মানুষকেই আমি রসূলরূপে পাঠিয়েছি। তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত অস্বীকার করার অজুহাত হিসাবে মক্কার মুশরিকরা বলে বেড়াতো– "কোন ফেরেশ্‌তা রাসূল হয়ে আসলে তার কথা অম্লান বদনে আমরা মেনে নিতাম। তা না করে আল্লাহ তোমাকে কেন রসূল করে পাঠালেন হে!?" কোরেশদের এই বাচালতাই আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল। তদুপরি আয়াতে উল্লেখিত اهل الذكر। শব্দের অর্থ নিয়ে তাফসীরকারদের তিনটি ভিন্ন মত রয়েছে। যথাঃ– 'বিজ্ঞ আহলে কিতাবীগণ' রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী আহলে কিতাবীগণ ও "কোরআনী ইলমের অধিকারী ব্যক্তিগণ।" সুতরাং শানে নুজুলের আলোকে আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে; "আহলে যিকিরগণ বেশ জানেন যে, অতীতের সব নবী রসূলই মানুষ ছিলেন। অতি মানব বা ফেরেশতা ছিলেন না একজনও। তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না কেন?

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাকলীদ ও ইজতিহাদ প্রসংগের সাথে আয়াতের পূর্বাপর কোন সম্পর্ক নেই।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, دلالة النص (পরোক্ষ ইংঙ্গিত) এর মাধ্যমে এখানে তাকলীদের বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা আহলে যিকিরের যে অর্থই করা হোক, এটাতো স্বীকৃত যে, অজ্ঞতার কারণেই তাদেরকে আহলে যিকিরের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ নির্দেশের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে যে মূলনীতির উপর তা হলো; অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। আর এ মূলনীতির আলোকেই তাকলীদ এক স্বতঃসিদ্ধ ও অনস্বীকার্য প্রয়োজনরূপে সুপ্রমাণিত। তদুপরি আগেই আমরা বলে এসেছি যে, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে আয়াতের উপলক্ষ্য বা শানে নুযুল নয় বরং শব্দের স্বাভাবিক দাবীই হলো মূল বিচার্য। সুতরাং মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হলেও সম্প্রসারিত অর্থে এখানে এ মূলনীতি অবশ্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য আহলে ইলমদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। তাই আল্লামা খতীবে বোগদাদী (রঃ) লিখেছেন।

اَمَّا مَنْ يَّسُوْغُ لَهُ التَّقْلِيْدُ فَهُوَ الْعَامِّيُّ الَّذِىْ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة، فَيَجُوْزُ لَهُ اَنْ يُّقَلِّدَ عَالِمًا وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

শরীয়তী আহকাম থেকে বঞ্চিত সাধারণ লোকদের উচিত কোন বিজ্ঞ আলিমের নিদের্শ পালনের মাধ্যমে তাঁর তাকলীদ করে যাওয়া। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

অতঃপর আল্লামা বোগদাদী নিজস্ব সনদ ও সূত্রযোগে ছাহাবী হযরত আমর বিন কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতামত উল্লেখ করে লিখেছেন; اهل الذكر। এর অর্থ 'আহলে ইলম' ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাকলীদ ও হাদীস

আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের পাশাপাশি অসংখ্য হাদীসও পেশ করা যেতে পারে তাকলীদের সমর্থনে। তবে সংকুচিত পরিসরের কথা বিবেচনা করে এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র হাদীস কিঞ্চিত আলোচনাসহ পেশ করছি।

প্রথম হাদীসঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ لَا اَدْرِىْ مَا بَقَائِىْ فِيْكُمْ، فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رواه الترمذى وابن ماجه واحمد)

হযরত হোজাইফা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জানি না; আর কত দিন তোমাদের মাঝে আমি বেঁচে থাকবো। তবে আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমর এ দুজনের ইকতিদা করে যাবে।

এখানে اقتداء শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ধর্মীয় আনুগত্যের অর্থেই শুধু এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রশাসনিক আনুগত্যের অর্থে নয়।

সুপ্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ও আভিধানিক আল্লামা ইবনে মঞ্জুর লিখেছেন-

اَلْقُدْوَةُ وَالْقِدْوَةُ مَا تَسَنَّنْتَ بِهٖ

অর্থাৎ যার সুন্নত বা তরীকা তুমি অনুসরণ করবে তাকেই শুধু কুদওয়া বলা যাবে। কিছুদূর পর তিনি আরো লিখেছেন القدوة الاسوة। অর্থাৎ قدوة ও اسوة। শব্দ দুটি সমার্থক। উভয়ের অর্থ হলো 'আদর্শ'[১]

দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে নবী ওলীগণের আনুগত্যের নির্দেশ দিতে গিয়ে কোরআনুল করীমেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

---

১। لسان العرب/ج/٢/ص/٣١

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (انعام ٩٠)

"এরাই হলেন হেদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং তোমরা এঁদেরই 'ইকতিদা' করো।

তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত সম্পর্কিত হাদীসেও একই অর্থে এর ব্যবহার এসেছে।

يَقْتَدِى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ،

আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সালাতের ইকতিদা করছিলেন আর পিছনের সবাই আবু বকরের 'সালাতের' ইকতিদা করছিলো।

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে হযরত আবু ওয়াইলের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

جَلَسْتُ اِلَى شَيْبَةَ ابْنِ عُثْمَانَ ؓ، فَقَالَ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِىْ مَجْلِسِكَ هٰذَا، فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَدَعَ فِى الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ اِلَّا قَسَمْتُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ قُلْتُ : لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ لَمْ يَفْعَلَا ذٰلِكَ فَقَالَ هُمَا الْمَرْاٰنِ يُقْتَدٰى بِهِمَا.

আমি শায়বা বিন উসমানের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হযরত ওমর ঠিক তোমার জায়গাটাতে বসেই বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, কাবা–ঘরে গচ্ছিত সমুদয় সোনা চাঁদি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেই। শায়বা বলেন, আমি বললাম, সে অধিকার তো আপনার নেই। কেননা আপনার আগের দু'জন তা করেননি, শুনে তিনি বললেন, এ দুজনের ইকতেদা অবশ্যই করা উচিত।

আরো অসংখ্য হাদীসে এই অর্থে اقتداء শব্দটির ব্যবহার এসেছে। বলাবাহুল্য যে, দ্বীনী বিষয়ে কারো ইকতিদা করার নামই হলো তাকলীদ।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেছেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا

বান্দাদের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না। বরং আলেম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নিয়ে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। একজন আলিমও যখন থাকবে না মানুষ তখন জাহিল মুর্খকেই পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দিয়ে বসবে। আর তারা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে অন্যদেরও গোমরাহ করবে।

আলোচ্য হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ফতোয়া প্রদানকে আলিমগণের অন্যতম ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সর্বসাধারণের কর্তব্য হবে শরীয়তের সকল ক্ষেত্রে আলিমগণের ফতোয়া হুবহু অনুসরণ করে যাওয়া। বলুন দেখি; তাকলীদ কি ভিন্ন কিছু?

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যখন কোথাও কোন আলিম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে সেই নাযুক মুহূর্তে বিগত যুগের হক্কানী আলিম মুজতাহিদগণের তাকলীদ ও অনুসরণ ছাড়া দ্বীনের উপর অবিচল থাকার আর কি উপায় হতে পারে?

মোটকথা; আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম এই যে, ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন আলিমগণ যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁদের কাছেই মাসায়েল জেনে নিতে হবে। কিন্তু যখন তাদের কেউ বেঁচে থাকবেন না তখন স্বঘোষিত মুজতাহিদদের দরবারে ভিড় না করে বিগত যুগের মুজতাহিদ আলিমগণের তাকলীদ করাই অপরিহার্য কর্তব্য।

তৃতীয় হাদীসঃ

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ (رواه ابوداود)

(পরিপক্ক ইল্‌ম ছাড়া কোন বিষয়ে ফতোয়া দিলে সে পাপ ফতোয়াদাতার ঘাড়েই চাপবে।

এ হাদীসও তাকলীদের সপক্ষে এক মজবুত দলীল। কেননা তাকলীদ শরীয়ত অনুমোদিত না হলে অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়ার সকল দায়দায়িত্ব মুফতি সাহেবের একার ঘাড়ে না চাপিয়ে উভয়ের ঘাড়ে সমানভাবে চাপানোটাই বরং যুক্তিযুক্ত হতো। অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়াদানকারী মুফতী সাহেব এবং চোখ বুজে সে ফতোয়া অনুসরণকারী মুকাল্লিদ উভয়েই যেখানে সমান অপরাধী, সেখানে একজন বেকসুর খালাস পাবে কোন সুবাদে?

মোটকথা; আলোচ্য হাদীসের আলোকে সাধারণ লোকের কর্তব্য শুধু যোগ্য ও বিজ্ঞ কোন আলিমের কাছে মাসায়েল জেনে নেওয়া। এর পরের সব দায়িত্ব উক্ত আলিমের উপরেই বর্তাবে। প্রশ্নকারীর উপর নয়। আর এটাই হলো তাকলীদের খোলাসা কথা।

চতুর্থ হাদীসঃ

হযরত ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল আযায়ী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهٗ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، (رواه البيهقى)

সুযোগ্য উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এই ইলম গ্রহণ করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এর হিফাজত করবে।

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুর্খ জাহিলদের তাবীল ও ভুল ব্যাখ্যাদানের কঠোর নিন্দা করে এখানে বলা হয়েছে যে, মুর্খদের হাত থেকে ইলমের হিফাজত হচ্ছে প্রত্যেক যুগের হক্কানী আলিমগণের পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং কোরআন সুন্নাহর নির্ভুল অনুসরণের জন্য তাঁদেরই শরণাপন্ন হতে হবে। এই সরল পথ ছেড়ে তথাকথিত ইজতিহাদের নামে যারা কোরআন–সুন্নাহর

বিকৃত ব্যাখ্যাদানের অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত হবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনই হবে শেষ ঠিকানা।

বলাবাহল্য যে, কোরআন-সুন্নাহর তাবীল বা ভুল ব্যাখ্যা এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অল্প বিস্তর বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে। কিন্তু হাদীস শরীফে তাদেরকেও জাহিল আখ্যায়িত করায় প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও মাসায়েল ইস্তিম্বাত করার জন্য আরবী ভাষা-জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, ইজতিহাদী প্রজ্ঞারও প্রয়োজন।

পঞ্চম হাদীসঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাইদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, দু'একজন বিশিষ্ট ছাহাবী জামাতের পিছনে এসে শরীক হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে যথাসময়ে মসজিদে এসে প্রথম কাতারে 'সালাত' আদায়ের তাকিদ দিয়ে ইরশাদ করলেন-

إِيْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

তোমরা (আমাকে দেখে) আমার ইকতিদা করো আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের দেখে ইকতিদা করবে।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন।

وَقِيْلَ مَعْنَاهُ تَعَلَّمُوْا مِنِّيْ أَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ، وَلْيَتَعَلَّمْ مِنْكُمُ التَّابِعُوْنَ بَعْدَكُمْ وَكَذٰلِكَ أَتْبَاعُهُمْ إِلَى .. انْقِرَاضِ الدُّنْيَا-

অনেকের মতে হাদীসের মর্ম এই যে, তোমরা আমার কাছ থেকে শরীয়তের আহকাম শিখে রাখো, কেননা পরবর্তীরা তোমাদের কাছ থেকে এবং আরো পরবর্তীরা তাদের কাছ থেকে শিখবে। আর এ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারীসহ কারো কারো মতে হাদীসের অর্থ এই যে, সালাতে প্রথম কাতারের বিশিষ্ট ছাহাবাগণ রাসূলের ইকতিদা করবেন আর পরবর্তী কাতারের সাধারণ ছাহাবাগণ তাঁদের ইকতিদা করবেন। যে ব্যাখ্যাই

গ্রহণ করা হোক তাকলীদ যে শরীয়তস্বীকৃত একটি চিরন্তন প্রয়োজন তাতে আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ষষ্ঠ হাদীসঃ

হযরত সাহাল বিন মুআয তাঁর বাবার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ انْطَلَقَ زَوْجِيْ غَازِيًا وَكُنْتُ أَقْتَدِيْ بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ فَأَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِيْ عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ الخ مسند احمد ج/٣/ص/٤٣٩

জনৈক মহিলা ছাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী জিহাদে গিয়েছেন। তিনি থাকতে আমি তাঁর সালাত ও অন্যান্য কাজ অনুসরণ করতাম। এখন তার ফিরে আসা পর্যন্ত এমন কোন আমল আমাকে বাতলে দিন যা তাঁর আমলের সমমর্যাদায় আমাকে পৌঁছে দিবে।

আলোচ্য হাদীসের সনদ সমালোচনায় ইমাম হায়ছামী বলেন

ইমাম আহমদ বর্ণিত সনদে যাব্বান ইবনে ফায়েদ রয়েছেন। কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদের মতে তিনি 'দুর্বল' হলেও ইমাম আবু হাতেম তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। সনদের অন্যান্যরা বিশ্বস্ত।

দেখুন, মহিলা ছাহাবী সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীয় সালাতসহ সকল আমলের ইকতিদা করার ঘোষণা দিচ্ছেন, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোন রকম অসম্মতি প্রকাশ করেননি।

ছাহাবাযুগে মুক্তাকলীদঃ

নবীজীর প্রিয় ছাহাবাগণের পূণ্যযুগেও কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত 'তাকলীদ' এর উপর ব্যাপক আমল বিদ্যমান ছিলো। ছাহাবাগণের মধ্যে যাদের ইলম অর্জনের পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ ছিলো না কিংবা যাদের ইজতিহাদ প্রয়োগের ক্ষমতা ছিলো না। তারা নির্দ্বিধায় ফকীহ ও মুজতাহিদ ছাহাবাগণের শরণাপন্ন হয়ে তাদের ইজতিহাদ মোতাবেক আমল করে যেতেন।

৩—

মোটকথা, ছাহাবাগণের পূণ্যযুগে মুক্ততাকলীদ ও ব্যক্তিতাকলীদ উভয়েরই প্রচলন ছিলো।

বিশেষকরে মুক্ততাকলীদের এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে, তার সংক্ষিপ্ত সংগ্রহও এক বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। পরিসরের কথা বিবেচনা করে কয়েকটি মাত্র নযীর এখানে আমরা তুলে ধরবো।

প্রথম নযীরঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْقُرْاٰنِ فَلْيَأْتِ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رض وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رض وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رض، وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِىْ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ لَهٗ وَالِيًا وَّقَاسِمًا ، (رواه الطبرانى فى الاوسط)

জাবিয়া নামক স্থানে হযরত ওমর একবার খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন, লোক সকল! কোরআন (ইলমুল ক্বিরাত) সম্পর্কে তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে উবাই ইবনে কা'বের কাছে এবং ফারায়েয সম্পর্কে কিছু জানতে হলে জায়েদ বিন সাবেতের কাছে আর ফিকাহ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে মু'আয বিন জাবালের কাছে যাবে। তবে অর্থ সম্পদ সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন থাকলে আমার কাছেই আসবে। কেননা আল্লাহ আমাকে এর বন্টন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

এ খুৎবায় হযরত ওমর তাফসীর, ফিকাহ ও ফারাইজ বিষয়ে সকলকে বিশিষ্ট তিনজন ছাহাবার মতামত অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। আর এটা বলাইবাহুল্য যে, মাসায়েলের উৎস ও দলিল বোঝার যোগ্যতা সবার থাকে না। সুতরাং খলীফার নির্দেশের অর্থ হলো; প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তিন ছাহাবার খিদমতে গিয়ে মাসায়েল ও দালায়েল (সিদ্ধান্ত ও উৎস) উভয়ের ইলম

হাসিল করবে। আর যাদের সে যোগ্যতা নেই তারা শুধু মাসায়েলের ইলম হাসিল করে সে মোতাবেক আমল করবে। তাকলীদও এর অতিরিক্ত কিছু নয়। তাই ছাহাবা যুগে আমরা দেখতে পাই, যাদের ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিলো না তারা নিঃসংকোচে ফকীহ ও মুজতাহিদ ছাহাবাগণের শরণাপন্ন হতেন এবং বিনা দলিলেই তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করে যেতেন।

দ্বিতীয় নযীরঃ

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ বলেন–

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ اِلَى اَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْاٰخَرُ، فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رض وَنَهٰى عَنْهُ،

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো; প্রথম জন দ্বিতীয় জনের কাছে মেয়াদী ঋণের পাওনাদার। আর সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরিশোধের শর্তে আংশিক ঋণ মওকুফ করে দিতে সম্মত হয়েছে। (এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি?) হযরত ইবনে ওমর প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে তা নাকচ করে দিলেন।

এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ সম্বলিত কোন মরফু হাদীস না থাকায় নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায় যে, এটা হযরত ইবনে ওমরের নিজস্ব ইজতিহাদ। অথচ তিনি নিজে যেমন তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন দলিল পেশ করেননি, তেমনি প্রশ্নকারীও তা তলব করেনি। আর শরীয়তের পরিভাষায় বিনা দলিলে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করার নামই হলো তাকলীদ।

তৃতীয় নযীরঃ

হযরত আবদুর রহমান বলেন–

عَنْ عبد الرحمن قال سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال كان عمر بن الخطاب رض يكرهه،

মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে আমি হাম্মাম খানায় গোসলের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে শুধু তিনি বললেন, হযরত ওমর এটা অপসন্দ করতেন।

দেখুন; মুহাম্মদ ইবনে সীরীন প্রশ্নকারীর জবাবে হাদীস-দলিল উল্লেখ না করে হযরত ওমরের অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছেন। অথচ এ সম্পর্কে এমনকি হযরত ওমর বর্ণিত মরফু হাদীসও রয়েছে।

চতুর্থ নযীরঃ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ رض خَرَجَ حَاجًّا حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهٗ وَإِنَّهٗ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض اِصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

আবু আইয়ুব আনসারী (রঃ) একবার হজ্জ সফরে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার পথে 'নাযিয়া' নামক স্থানে তার সওয়ারী খোয়া গেলো। ফলে জিলহজ্জের দশ তারিখে (হজ্জ হয়ে যাওয়ার পর) তিনি হযরত ওমরের খিদমতে এসে পৌঁছলেন। ঘটনা শুনে হযরত ওমর বললেন। এখন তুমি ওমরা করে নাও। এভাবে আপাততঃ হজের এহরাম থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। তবে আগামী বছর সামর্থ্য অনুযায়ী কোরবানীসহ হজ্জ আদায় করে নিও। এখানেও দেখা যাচ্ছে; হযরত ওমর (রাঃ) প্রয়োজনীয় দলিল উল্লেখ না করে শুধু ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছেন। অন্য দিকে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)ও খলিফার ইলম ও প্রজ্ঞার উপর পূর্ণ আস্থার কারণে বিনা দলিলেই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন।

পঞ্চম নযীরঃ

হযরত মুসআব বিন সাআদ বলেন–

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ اَبِيْ اِذَا صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ تَجَوَّزَ وَاَتَمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَالصَّلٰوةَ وَاِذَا صَلّٰى فِي الْبَيْتِ اَطَالَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَالصَّلٰوةَ، قُلْتُ يَا اَبَتَاهُ اِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ جَوَّزْتَ وَاِذَا صَلَّيْتَ فِي الْبَيْتِ اَطَلْتَ؟ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنَّا اَئِمَّةٌ يُقْتَدٰى بِنَا، رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح -

আমার বাবা সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস মসজিদে সালাত পড়ার সময় পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত রুকু সিজদা করতেন। কিন্তু ঘরে তিনি দীর্ঘ রুকু সিজদা সহ প্রলম্বিত সালাত পড়তেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, ছেলে! আমরা ইমাম বলে আমাদের ইকতিদা করা হয়। (সুতরাং আমাদের দীর্ঘ সালাত দেখে ওরাও তা জরুরী মনে করবে। ফলে সালাত তথা গোটা শরীয়ত তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।)

এ রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ ছাহাবাগণের বাণী ও বক্তব্যের সাথে সাথে তাঁদের কর্ম ও আচরণেরও ইকতিদা করতো। তাই নিজেদের খুঁটিনাটি আমল সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বলাবাহুল্য যে, কারো আমল দেখে ইকতিদা করার ক্ষেত্রে দলিল প্রমাণ তলব করার কোন প্রশ্নই আসে না।

ষষ্ঠ নযীরঃ

মুআত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে–

اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض رَاٰى عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ رض: مَا هٰذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوْغُ يَا طَلْحَةُ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ، فَقَالَ عُمَرُ رض:

إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هٰذَا الثَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ (مسند احمد ج-١ / ص- ٩٢)

হযরত ওমর (রাঃ) তালহা বিন ওবায়দুল্লাহকে একবার ইহরাম অবস্থায় রঙ্গীন কাপড় পরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। রংগানো কাপড় পরেছো যে? হযরত তালহা বললেন, আমীরুল মুমেনীন! এতে তো কোন সুগন্ধী নেই। (আর রংগানো কাপড়ে সুবাস না থাকলে ইহরাম অবস্থায় তা পরতে আপত্তি থাকার কথা নয়।) হযরত ওমর তখন তাকে বললেন, তালহা! তোমরা হলে ইমাম। সাধারণ মানুষ তোমাদের সব কাজের ইকতিদা করে থাকে। কোন অজ্ঞ লোক এ অবস্থায় তোমাকে দেখলেই বলবে, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ইহরাম অবস্থায় রংগানো কাপড় পরতেন। (অজ্ঞতাবশতঃ সুবাসহীন ও সুবাসিত সবধরনের কাপড়ই তারা তখন পরা শুরু করবে।) সুতরাং এ ধরনের কাপড় তোমরা পরো না।

সপ্তম নযীরঃ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কে একবার বিশেষ ধরনের মোজা পরতে দেখে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন–

عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَلَّا نَزَعْتَهُمَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْكَ فَيَقْتَدُوْنَ بِكَ (الاستيعاب، ج-٢- ص- ٣١٥)

তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, মোজা জোড়া খুলে ফেলো। কেননা আমার আশংকা, মানুষ তোমাকে দেখে তোমার ইকতিদা শুরু করবে।

উপরের তিনটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মর্যাদার অধীকারী ছাহাবাগণের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার পাশাপাশি তাঁদের কর্ম ও আমলেরও তাকলীদ করা হতো। এ জন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও একে অপরকে তাঁরা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের তাকীদ দিতেন।

অষ্টম নযীরঃ

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কুফা পাঠানোর প্রাক্কালে কুফাবাসীদের নামে লেখা এক চিঠিতে হযরত ওমর বলেছেন–

إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمِيْرًا، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَاقْتَدُوْا بِهِمَا وَاسْمَعُوْا مِنْ قَوْلِهِمَا

আম্মার বিন য়াসিরকে শাসক এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদেকে শিক্ষক ও পরামর্শদাতারূপে আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। এরা বিশিষ্ট বদরী ছাহাবী। সুতরাং তোমরা এদের ইকতিদা করবে এবং যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে।

নবম নযীরঃ

হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন–

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رض لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ يُقْتَدٰى بِهِمْ وَإِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ نَاسٌ يُقْتَدٰى بِهِمْ، وَكَانَ الْقَاسِمُ مِمَّنْ لَا يَقْرَأُ۔

(موطا امام محمد باب القرائة خلف الامام ۔)

হযরত ইবনে ওমর ইমামের পিছনে কখনো ক্বিরাত পড়তেন না। কাসিম বিন মুহাম্মদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে পড়তে পারো আবার না পড়ারও অবকাশ আছে। কেননা আমাদের অনুকরণীয় যারা তাঁরা কেউ পড়েছেন কেউ পড়েননি। অথচ কাসেম বিন মুহাম্মদ নিজে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়ার বিরোধী ছিলেন।

দেখুন; মদিনার 'সাত ফকীহের' অন্যতম বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ নিজে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ার বিরোধী হয়েও অন্যকে উভয় আমলের উদার অনুমতি দিচ্ছেন। এতে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণিত

হয় যে, দলিলের বিভিন্নতার কারণে মুজতাহিদগণের মাঝে মতভিন্নতা দেখা দিলে বিশুদ্ধ নিয়তে (মতভিন্নতার সুযোগে সুবিধা লাভের মতলবে নয়) যে কোন এক মুজতাহিদের ইকতিদা করা যেতে পারে।

দশম নযীরঃ

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে তাবকাতে ইবনে সাআদের বরাতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَتَشْرَبُ مِنْ مَاءِ هٰذِهِ السِّقَايَةِ اَلَّتِيْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، قَالَ الْحَسَنُ قَدْ شَرِبَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْ سِقَايَةِ أُمِّ سعد فمه (كنز العمال، ج-٣، ص-٢١٨)

হযরত হাসান (রাঃ) কে একবার বলা হলো; মসজিদে রক্ষিত ঐ সিকায়া (পান পাত্র) থেকে আপনি পানি পান করছেন, অথচ তা সদকার সামগ্রী। হযরত হাসান (তিরস্কারের স্বরে) বললেন, থামো হে! আবু বকর ও ওমর উম্মে সাআদের সিকায়া থেকে পানি পান করেছেন। দেখুন; আত্মপক্ষ সমর্থনে হযরত হাসান (রাঃ) খলীফাদ্বয়ের আমল ভিন্ন অন্য কোন দলিল পেশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। আসলে তিনি তাদের তাকলীদ করছিলেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা বিবেচনা করে মাত্র অল্প কয়েকটি নযীর এখানে আমরা পেশ করলাম। এ ধরনের আরো অসংখ্য নযীর আপনি পেতে পারেন– মুআত্তা মালেক, কিতাবুল আসার লিল ইমাম আবু হানিফা, মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, শরহে মায়ানিল আছার লিত্তাহাবী এবং মাতালেবে আলিয়া লি–ইবনে হাজার প্রভৃতি গ্রন্থে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন;

وَالَّذِيْنَ حُفِظَتْ عَنْهُمُ الْفَتْوٰى مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ وَنَيِّفٌ وَثَلَاثُوْنَ نَفْسًا مَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

একশ ত্রিশজন ছাহাবীর ফতোয়া আমাদের কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাদের মধ্যে পুরুষ ছাহাবীর পাশাপাশি মহিলা ছাহাবীও রয়েছেন।[১]

١۔ اعلام الموقعين لابن القيم: ج/١ ص/٩، المرأة — ١١

Contents

ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ছাহাবীগণ উভয় পন্থাই অনুসরণ করতেন। কখনো কোরআন–সুন্নাহ থেকে দলিল উল্লেখ করে ফতোয়া দিতেন আবার কখনো বিনা দলিলে শুধু সিদ্ধান্তটুকু শুনিয়ে দিতেন। আর মানুষ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করতো।

ছাহাবা–তাবেয়ী যুগে ব্যক্তিতাকলীদ

মুক্ততাকলীদের পাশাপাশি ব্যক্তিতাকলীদের ধারাও সমানভাবে বিদ্যমান ছিলো ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের পূণ্য যুগে। অনেকে যেমন একাধিক ছাহাবীর তাকলীদ করতেন তেমনি অনেকে নির্দিষ্ট কোন ছাহাবীর তাকলীদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। এ সম্পর্কিত দু' একটি নযীর শুধু এখানে তুলে ধরছি।

প্রথম নযীরঃ

বোখারী শরীফে হযরত ইকরামার বর্ণনায় আছে।

وَاِنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ. قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لَانَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ (البخارى، كتاب الحج)

একদল মদিনাবাসী হযরত ইবনে আব্বাসকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করলো। তাওয়াফ অবস্থায় কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কি করবে? (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে নাকি তখনি ফিরে যাবে?) ইবনে আব্বাস বললেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) ফিরে যাবে। কিন্তু মাদীনাবাসী দলটি বললো; যায়েদ বিন ছাবেতকে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা মানতে পারি না।

অন্যত্র মদিনাবাসী দলটির মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

لَا نُبَالِى أَفْتَيْتَنَا اَوْلَمْ تُفْتِنَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَاتَنْفِرُ

আপনার ফতোয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। যায়েদ বিন ছাবেত তো বলেছেন, (তাওয়াফুল বেদা না করে) যেতে পারবে না।

পক্ষান্তরে মুসনাদে আবু দাউদের রেওয়ায়েত হলো

لَانُتَابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا

فَقَالَ سَلُوْا صَاحِبَتَكُمْ اُمَّ سُلَيْمٍ رض (مسند ابو داؤد الطيالسي - ص ٢٢٩)

হে আব্বাসের পুত্র! যায়েদ বিন ছাবিতের মুকাবেলায় আপনার কথা আমরা মানতে পারি না। হযরত ইবনে আব্বাস তখন বললেন, (মদিনায় গিয়ে) উম্মে সুলায়ম (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করো (দেখবে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক)

এখানে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো। প্রথমতঃ মদিনাবাসী দলটি হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের মুকাল্লিদ ছিলো। তাই তাঁর মুকাবেলায় অন্য কারো মতামত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। এমনকি এর বর্ণনা মতে নিজের ফতোয়ার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস তাদেরকে উম্মে সুলায়মের হাদীসও শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যায়েদ বিন ছাবিতের ইলম ও প্রজ্ঞার উপর তাদের আস্থা এত গভীর ছিলো যে, তার মতের পরিপন্থী বলে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদীসনির্ভর ফতোয়াও তারা প্রত্যাখ্যান করলো। দ্বিতীয়তঃ এই অনমনীয় ব্যক্তিতাকলীদের 'অপরাধে' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের মৃদু তিরস্কারও করেননি। বরং হযরত উম্মে সুলায়মের কাছে অনুসন্ধান করে বিষয়টি যায়েদ বিন ছাবিতের কাছে পুনরুত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। মদীনাবাসী দলটি অবশ্য সে পরামর্শ অনুসরণ করে ছিলো এবং মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী শরীফের বর্ণনা মতে সংশ্লিষ্ট হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর যায়েদ বিন ছাবিতেরও মতপরিবর্তন ঘটেছিলো। আর সে সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাসকে তিনি অবহিতও করেছিলেন।১

জনৈক আহলে হাদীস পণ্ডিত এই বলে আমাদের বক্তব্য নাকচ করে দিতে চেয়েছেন যে, মদীনাবাসী দলটি যদি সত্যই যায়েদ বিন ছাবিতের মুকাল্লিদ হতো তাহলে উম্মে সুলায়মের হাদীস সম্পর্কে নিজেরাই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান চালাতে যেতো না।২

১। فتح الباری : ج/٣ ص/٤٦٨-٤٦٩

২। মুক্তবুদ্ধি আন্দোল (উর্দু) ইসমাইল সলফী কৃত পৃঃ ১৩৬

অর্থাৎ পণ্ডিতপ্রবর এটা ধরেই নিয়েছেন যে, কোন মুজতাহিদের তাকলীদের পর এমনকি কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কিত গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। মূলতঃ এ ভুল ধারণাই আহলে হাদীস পণ্ডিতগণের অধিকাংশ অনুযোগ-অভিযোগের বুনিয়াদ। অথচ বারবার আমরা বলে এসেছি যে, তাকলীদের দাবী শুধু এই-আয়াত ও হাদীসের বাহ্যবিরোধ নিরসন এবং নাসিখ-মনসুখ১ নির্ধারণের মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহর মর্ম অনুধাবনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও ধর্মীয় প্রজ্ঞার যিনি অধিকারী নন তিনি একজন মুজতাহিদের তাকলীদ করবেন। অর্থাৎ বিস্তারিত দলিল প্রমাণের দাবী না তুলে পুর্ণ আস্থার সাথে তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুসরণের মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করে যাবেন। তাই বলে চিন্তা ও গবেষণার দুয়ার কারো জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহর বিস্তৃত অংগনে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের অধিকার একজন মুকাল্লিদের অবশ্যই থাকে। কেননা তাকলীদ মানে চিন্তার বান্ধাত্য নয়, নয় অন্ধ অনুকরণ। তাই দেখা যায়, প্রত্যেক মাযহাবের মুকাল্লিদ আলিমগণ স্ব- স্ব ইমামের তাকলীদ সত্ত্বেও ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় অমূল্য অবদান রেখে ইসলামের সোনালী ইতিহাসে আজ অমর হয়ে আছেন। এমনকি (অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণাকালে) ইমামের কোন সিদ্ধান্ত হাদীস বিরোধী মনে হলে ইমামকে পাশ কেটে নির্দ্বিধায় তাঁরা হাদীস অনুসরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

১। যে আয়াত বা হাদীস দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াত বা হাদীস রহিত হয়ে যায় তাকে নাসিখ বলা হয়। আর রহিত আয়াত বা হাদীসকে মনসূখ বলা হয়।

মোটকথা; মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত হাদীস বিরোধী মনে হলে 'বিজ্ঞ' মুকাল্লিদ সে সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে অবাধ অনুসন্ধান চালাতে পারেন। এটা তাকলীদের পরিপন্থী নয়। বিশেষ করে উম্মে সুলায়ম ও যায়েদ বিন ছাবিতের বেঁচে থাকার কারণে আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তো অনুসন্ধান ও মত বিনিময়ের পূর্ণ সুযোগই

বিদ্যমান ছিলো। সে সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলো মদীনাবাসী দলটি, যার ফলশ্রুতিতে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন।

অবশ্য আমাদের মতে এ দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে মদীনাবাসীদের এই ছোট্ট মন্তব্যটুকুই সকল বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে।

لَا نُتَابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا

'যায়েদ বিন ছাবিতের মোকাবেলায় আপনার ফতোয়া আমরা মেনে নিতে পারি না।"

বলাবাহুল্য যে, ব্যক্তিতাকলীদের কারণেই মদীনাবাসীরা যায়েদ বিন ছাবিত ছাড়া কারো ফতোয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না।

দ্বিতীয় নযীর

বোখারী শরীফে হযরত হোযায়ফা বিন শোরাহবিল বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন। তবে সেই সাথে প্রশ্নকারীকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতামত জেনে নেয়ারও নির্দশ দিলেন। হযরত ইবনে মাসউদের বরাবরে বিষয়টি পেশ করা হলে তিনি বিপরীত সিদ্ধান্ত দিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সব বিষয় অবগত হয়ে হযরত ইবনে মাসউদের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে বললেন, لَا تَسْأَلُوْنِيْ مَادَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ এ মহা জ্ঞানসমুদ্র যত দিন বিদ্যমান আছেন ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।১

দেখুন; হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সকলকে ইবনে মাসউদের জীবদ্দশায় তাঁর কাছেই মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দানের মাধ্যমে কি সুন্দরভাবে ব্যক্তি তাকলীদকে উৎসাহিত করলেন।

কোন কোন বন্ধুর মতে "হযরত আবু মুসা (রাঃ) সকলকে ইবনে মাসউদের উপস্থিতিতে নিজের তাকলীদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সত্য। কিন্তু এতে এ কথার প্রমাণ নেই যে, অন্যান্য ছাহাবার তাকলীদ থেকেও

সকলকে তিনি নিবৃত্ত করেছেন। তাঁর নিষেধের অর্থ বেশীর চেয়ে বেশী এই হতে পারে যে, শ্রেষ্ঠের উপস্থিতিতে অশ্রেষ্ঠের কাছে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটা হযরত উসমানের খিলাফত কালে কুফা শহরের ঘটনা।২ সেখানে তখন হযরত ইবনে মাসউদের চেয়ে বড় আলিম বিদ্যমান ছিলেন না। কেননা কুফায় তখনো হযরত আলী (রাঃ)র আগমন ঘটেনি। সুতরাং বন্ধুদের ব্যাখ্যা মেনে নিলেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না। কেননা তখন তাঁর কথার অর্থ দাঁড়াবে এই, "ইবনে মাসউদের জীবদ্দশায় তাকেই শুধু জিজ্ঞাসা করবে। আমাকে কিংবা অন্য কাউকে নয়। কেননা কুফায় তাঁর চেয়ে বড় আলেম নেই।"

১। বুখারী, কিতাবুল ফারাইয, খঃ ২ পৃঃ ৯৯৭ এবং মুসনাদে আহমদ খঃ১ পৃঃ৪৬৪
২। উমদাতুল কারী খঃ১১ পৃঃ৯৮ এবং ফাতহুল বারী খঃ১২ পৃঃ ১৪

তাবরানীর বর্ণনায় আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে। সেখানে আবু মুসা (রাঃ)র নিষেধবাণীতে বলা হয়েছে,

لَا تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أُتَامَ هٰذَا بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (مجمع الزوائد ، ج ـ ٤ ـ ص ـ ٢٦٢)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের ছাহাবাগণের মাঝে ইবনে মাসউদ যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

মোটকথা; সময় ও পরিবেশের বিচারে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)র একক তাকলীদের প্রতি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিলো হযরত আবু মুসার উপরোক্ত নির্দেশের উদ্দেশ্য। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, মুক্ততাকলীদের মত ব্যক্তিতাকলীদও ছাহাবা যুগে 'নিষিদ্ধ ফল' ছিলো না।

তৃতীয় নযীরঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ اَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَاْئِىْ، وَ لَا اٰلُوْ، فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهٗ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)۔

তিরমিযি ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবালকে য়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন– কিভাবে তুমি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে? হযরত মুআয (রাঃ) আরয করলেন। কিতাবুল্লাহর আলোকে ফয়সালা করবো। নবীজী প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে! হযরত মুআজ বললেন, তাহলে সুন্নাহর আলোকে তার ফয়সালা করবো। নবীজী আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোন সমাধান খুঁজে না পেলে তখন? হযরত মুআয বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো এবং (সত্যের সন্ধান পেতে) চেষ্টার ত্রুটি করবো না। নবীজী তখন তাঁর প্রিয় ছাহাবীর বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক কথা বলার তাওফিক দিয়েছেন।১

১। আবু দাউদ, কিতাবুল আকযিয়াহ, ইজতিহাদুর রায় ফিল কাযা।

তাকলীদ ও ইজতিহাদের বিতর্ক মঞ্চে এ হাদীস এমন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যার নিষ্কম্প শিখায় আমরা সবাই সত্যের নির্ভুল সন্ধান পেতে পারি। অবশ্য পূর্বশর্ত হলো মনের পবিত্রতা এবং চিন্তার বিশুদ্ধতা। বিস্তারিত

আলোচনা বাদ দিয়ে এখানে আমরা আলোচ্য হাদীসের একটি বিশেষ দিক শুধু তুলে ধরতে চাই।

ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহবাগণের মধ্য থেকে এক জনকেই শুধু আল্লাহর রাসূল শাসক, বিচারক ও শিক্ষকরূপে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। কোরআন–সুন্নাহ অনুসরণের পাশাপাশি প্রয়োজনে নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ইজতিহাদ করার অধিকারও তাকে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল। আর ইয়ামেনবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর অখণ্ড আনুগত্যের। আরো গুছিয়ে বলতে গেলে ইয়ামেনবাসীকে আল্লাহর রাসূল হযরত মুআয বিন জাবালের তাকলীদে শাখছী বা একক আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়; এমন সহজ ও পরিচ্ছন্ন হাদীসও আমার অনেক বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। এক বন্ধুতো এমনও বলেছেন যে, হাদীসটি এখানে টেনে আনার আগে একটু কষ্ট স্বীকার করে এর বিশুদ্ধতা যাচাই করে নেয়া উচিত ছিলো।১

অতঃপর আবু দাউদের পার্শ্বটিকা থেকে আল্লামা জাওযেকানীর মন্তব্য তুলে ধরে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তিনি। মজার ব্যাপার এই যে, তাকলীদের বিরুদ্ধে কলম দাগাতে গিয়ে বন্ধুটি নিজেই আটকা পড়ে গেছেন তাকলীদের অদৃশ্য ফাঁদে। অর্থাৎ মনপুত নয় এমন একটি হাদীস রদ করার জন্য আল্লামা জাওযেকানীর মন্তব্য তুলে ধরাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। তদুপরি আবু দাউদের পার্শ্বটিকার উপর দৃষ্টি বুলিয়েই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের দুরূহ কর্মটি বুঝিবা সাংগ হয়ে গেছে। অথচ দয়া করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের গবেষণালব্ধ পর্যালোচনাটি একবার পড়ে দেখলেই তাঁর অনেক মুশকিল আসান হয়ে যেতো। জাওযেকানীর বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন।

১। আত্তাহকীক ফী জওয়াবে তাকলীদ পৃঃ ৪৯

হযরত মুআয বিন জাবালের সূত্রে যারা এ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তাদের কারো মধ্যেই আপত্তিজনক খুঁত নেই।

তদুপরি আল্লামা খতীব বোগদাদীর বরাতে ভিন্ন এক সুত্রে হযরত মুআয বিন জাবাল থেকে (আব্দুর রহমান বিন গনম এবং তার কাছ থেকে ওবাদা বিন নাসী) হাদীসটি পেশ করে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এটি মুত্তাসিল সনদ সমৃদ্ধ হাদীস। (হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় যে সনদের আগাগোড়া সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ রয়েছে এবং কোথাও সংযোগ বিচ্ছিন্নতা নেই সে সনদকে মুত্তাসিল বলা হয়) তদুপরি বর্ণনাকারীদের সকলেই বিশ্বস্ততায় সুপরিচিত।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের সর্বশেষ যুক্তি এই যে, উম্মাহর সর্বস্তরে সাদরে গৃহিত হওয়ার কারণে হাদীসটি দলিলরূপে ব্যবহারযোগ্য।১

আরেক বন্ধু মন্তব্য করেছেন, হযরত মুআয বিন জাবালকে পাঠানো হয়েছিলো শাসক হিসাবে। শিক্ষক বা মুফতী হিসাবে নয়। সুতরাং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত হাদীসকে ফতোয়া ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে টেনেআনা যুক্তিযুক্ত নয়।২

---

১ ইলামুল মুকিয়ীন, খঃ১ পৃঃ ১৭৫ ও ১৭৬
২। মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন, পৃঃ ১৪০

আসলে ইনিও দুঃখজনক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বুখারী শরীফের রিওয়ায়েত দেখুন।

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا اَوْ اَمِيْرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ اِبْنَتَهُ وَاُخْتَهُ فَاَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْاُخْتَ النِّصْفَ۔

(البخاري، كتاب الفرائض ج ٢، ص ٩٩٧)

হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বলেন– শাসক ও শিক্ষক হয়ে হযরত মুআয বিন জাবাল আমাদের এলাকায় এসেছিলেন। তাই আমরা তাকে মাসআলা

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত ব্যক্তির বোন ও কন্যা আছে (তাদের মাঝে মিরাস কিভাবে বন্টিত হবে?) তিনি উভয়কে আধাআধি মিরাস দিয়েছিলেন।

এখানে হযরত মুআয বিন জাবাল যেমন মুফতি হিসাবে ফতোয়া দিয়েছিলেন তেমনি হযরত আসওয়াদ সহ সকলে তাকলীদের ভিত্তিতেই প্রমাণ দাবী না করে তা মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য হযরত মুআয (রাঃ) এর এ ফয়সালা ছিলো কোরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ দলিলনির্ভর। এবার আমরা তাঁর নিছক ইজতিহাদনির্ভর একটি ফতোয়া পেশ করছি

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِي قَالَ كَانَ مُعَاذ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِي مَاتَ وَتَرَكَ أَخَا مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ (مسند احمد، ج- ٥/ ص ٢٣٠)

হযরত আবুল আসওয়াদ দোয়ালী বলেন– মুআয বিন জাবাল ইয়ামানে অবস্থানকালে একবার একটি মাসআলা উত্থাপিত হলো– জনৈক ইহুদী মুসলমান ভাই রেখে মারা গেছে। (এখন সে কি মৃত ইহুদী ভাইয়ের মিরাস পাবে?) সব শুনে হযরত মুআয বিন জাবাল মিরাস লাভের পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূলকে আমি বলতে শুনেছি যে, "ইসলাম বৃদ্ধি করে হ্রাস করে না।" (সুতরাং ইসলামের কারণে ইহুদী ভাইয়ের মিরাস থেকে বঞ্চিত করা যায় না।)১

দেখুন; নিজের ফয়সালার সমর্থনে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) এমন একটি হাদীস পেশ করলেন মিরাসের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। পক্ষান্তরে–

মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না।

এ হাদীসের আলোকে অন্যান্য ছাহাবার সিদ্ধান্ত ছিলো ভিন্ন। কিন্তু হযরত মুআয বিন জাবালের নিছক ইজতিহাদনির্ভর এ ফয়সালাও ইয়ামেনবাসীরা

১। মুসনাদে আহমদ, খঃ৫ পৃঃ ২৩০ ও ২৩৬, ইমাম হাকিম বলেন, এ সনদ বুখারী ও মুসলিমের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ, মাসতাদরাকে হাকিম, খঃ৪ পৃঃ ৩৪৫

অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিলো।

মুসনাদে আহমদ ও মু'জামে তাবরানীর একটি রিওয়ায়েতও এ ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য।

إن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان ..... فقامت فسلمت على معاذ ... فقالت : من أرسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها معاذ : سليني عما شئت .

(مجمع الزوائد، ج ٤ - ٤/ ص ٣٠٧)

হযরত মুআয (রাঃ)র ইয়ামেনে আগমনের পর খাওলা গোত্রীয় এক মহিলা এসে সালাম আরয করে বললো, এখানে আপনাকে কে পাঠিয়েছেন? হযরত মুআয বললেন, আল্লাহর রাসূল পাঠিয়েছেন। মহিলা বললো, তাহলে তো আপনি আল্লাহর রাসূলের রাসূল (দূত)। আচ্ছা, হে আল্লাহর রাসূলের রাসূল! আপনি কি আমাদেরকে (দ্বীনের কথা) শোনাবেন না? হযরত মুআয বললেন, অকপটে তুমি তোমার সমস্যার কথা বলতে পারো।

দ্ব্যর্থহীনভাবেই আলোচ্য রিওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, সাধারণ প্রশাসকের মর্যাদায় নয় বরং আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিরূপে যুগপৎ শাসক ও শিক্ষকের মর্যাদায় তিনি ইয়ামেন গিয়েছিলেন। সুতরাং মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব ছিলো। এ সূত্র ধরেই মহিলা তাঁর কাছে মাসায়েল সম্পর্কিত প্রশ্নের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো আর তিনিও অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করে তাকে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সাদর অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিলো স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সম্পর্কিত। উত্তরে হযরত মুআয বিন জাবাল কোরআন সুন্নাহর উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধু কয়েকটি মৌলিক উপদেশ দিয়েছিলেন; আর মহিলাও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গিয়েছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট ছাহাবাগণের মাঝে হযরত মুআয বিন জাবাল ছিলেন অন্যতম। ইলমের ময়দানে তাঁর অত্যুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন।

أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

হালাল–হারাম সম্পর্কিত ইলমের ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের মাঝে মুআয বিন জাবালই শ্রেষ্ঠ।১

আরো ইরশাদ হয়েছে।

إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ بِنَبْذَةٍ ـ

(مسند احمد عن رواية عمر رض –)

কেয়ামতের দিন তিনি আলিমগণের নেতার মর্যাদায় উত্থিত হবেন এবং এক তীর পরিমাণ অগ্রবর্তী দূরত্বে অবস্থান করবেন।

শুধু ইয়ামেনবাসী মুসলমানদের কথাই বা কেন বলি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের তথ্য মতে সাধারণ ছাহাবাগণও হযরত মুআয বিন জাবালের তাকলীদ করতেন পরম আস্থা ও নির্ভরতার সাথে। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবিস্মরণীয় এই আশির্বাদবাক্যই তাকে মর্যাদার এমন উচ্চাসনে আসীন করেছিলো। সুবিখ্যাত তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানীর কাছে শুনুন–

عَنْ اَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِي قَالَ اَتَيْتُ مَسْجِدَ اَهْلِ دَمِشْقَ فَاِذَا حَلْقَةٌ فِيْهَا كُهُولٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وفي رواية كثيرة بن هشام : فَاِذَا فِيْهِ نَحْوُ ثَلَاثِيْنَ كَهْلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِذَا شَابٌّ فِيْهِمْ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا، كُلَّمَا اخْتَلَفُوْا فِي شَيْءٍ رَدُّوْهُ اِلَى الْفَتَى فَتًى شَابٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَلِيْسٍ لِيْ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رض

১। ইমাম নাসাঈ, তিরমিযি ও ইবনে মাযা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযির মতে এটা হাসান ও সহী হাদীস

দামেস্কের মসজিদে একবার দেখি; প্রবীন ছাহাবাগণের এক জামাআত (ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে প্রায় ত্রিশজন) বৃত্তাকারে বসে ইলম চর্চা করছেন। তাঁদের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন সুদর্শন যুবক। টানা টানা সুরমা চোখ, উজ্জ্বল ঝকঝকে দন্তপাটি। (আশ্চর্যের বিষয় এই যে,) যখনই কোন বিষয়ে মতানৈক্য হচ্ছে তখনই সকলে তার শরণাপন্ন হচ্ছেন। পাশের এক জনের কাছে যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইনিই তো মু'আয বিন জাবাল।

অপর এক রিওয়ায়েতের ভাষা এরূপ

إِذَا اخْتَلَفُوا فِيْ شَيْءٍ أَسْنَدُوْهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَأْيِهِ
(مسند احمد، ج- ٥/ ص- ٢٣٣)

কোন বিষয়ে মতানৈক্য হলে তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে (সন্তুষ্টচিত্তে) ফিরে যেতেন।

মোটকথা; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহবাণী এ কথাই প্রমাণ করে যে, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছাহাবাগণের মাঝেও হযরত মুআয বিন জাবাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এ কারণে ছাহাবাগণও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাঁর তাকলীদ করতেন। একই কারণে শাসক ও শিক্ষকের মর্যাদায় তিনি যখন ইয়ামেন প্রেরিত হলেন তখন দরবারে রিসালাত থেকে ইয়ামেনী মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ হলো শরীয়তী আহকামের ব্যাপারে তাঁর নিরংকুশ আনুগত্যের। বলাবাহুল্য যে, ইয়ামেনী মুসলমানগণ অক্ষরে অক্ষরেই পালন করেছিলেন দরবারে রিসালাতের সে মহান নির্দেশ। এভাবে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশেই হয়েছিলো একক তাকলীদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

চতুর্থ নযীরঃ

আমর বিন মায়মুন আত্তদী বলেন–

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْيَمَنَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيْرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ قَالَ، فَأُلْقِيَتْ

مُحَبَّتِيْ عَلَيْهِ، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتّٰى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى اَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَزِمْتُهُ حَتّٰى مَاتَ (ابوداؤد، ج-١/ص-٦٢)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে মুআয বিন জাবাল ইয়ামেনে আমাদের মাঝে এসেছিলেন। ফজরের সালাতে আমি তার তাকবীর শুনতে পেতাম। গভীর ও ভরাট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে ভালবাসলাম এবং শামদেশে তাঁকে দাফন করার পূর্বপর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য আকড়ে থাকলাম। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। একইভাবে আমরণ তাঁর সান্নিধ্য সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি।

"তাঁর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকীহ" হযরত আমর বিন মায়মুনের এ মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, ফিকাহ ও মাসায়েলই ছিলো যথাক্রমে হযরত মুআয বিন জাবাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে তাঁর সম্পর্কের বুনিয়াদ। এবং হযরত মুআযের জীবদ্দশায় ফিকাহ ও মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁর সাথেই ছিলো তাঁর একক সম্পর্ক। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সে সম্পর্ক গড়ে উঠে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সাথে

আরো কিছু নযীর

তাবেয়ীগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ছাহাবীর একক তাকলীদের আরো বহু নযীর ছড়িয়ে আছে হাদীস গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম শা'বী (রাঃ) বলেন,

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّاْخُذَ بِالْوَثِيْقَةِ فِى الْقَضَاءِ فَلْيَاْخُذْ بِقَوْلِ عُمَرَ رض

বিচার ক্ষেত্রে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করতে হলে হযরত ওমর (রাঃ)এর মতামতই অুসরণ করা উচিত।

অপর তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রঃ) এর নির্দেশ হলো–

اِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ شَىْءٍ فَانْظُرُوْا مَا صَنَعَ عُمَرُ فَخُذُوْا بِهِ

কোন বিষয়ে মতানৈক্য হলে দেখো, হযরত ওমর কি করেছেন, তাকেই তোমরা অনুসরণ করবে। সর্বজনমান্য তাবেয়ী হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) এর অনুসৃত নীতি প্রসংগে ইমাম আ'মশ (রঃ) বলেন–

إِنَّهُ كَانَ لَا يَعْدِلُ بِقَوْلِ عُمَرَ رض وَعَبْدِ اللّٰهِ رض إِذَا اجْتَمَعَا، فَإِذَا اخْتَلَفَا كَانَ قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ رض أَعْجَبَ إِلَيْهِ ـ

হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদের (রাঃ) সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মুকাবেলায় কাউকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তবে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিলে হযরত ইবনে মাসউদের মতামতই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতো।

হযরত আবু তামীমাহ (রঃ) বলেন–

قَدِمْنَا الشَّامَ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ يُطِيْفُوْنَ بِرَجُلٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا هٰذَا أَفْقَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا عَمْرٌ الْبَكَالِيُّ رض (اعلام الموقعين لابن القيم - ج - ١/ص ١٤)

সিরিয়ায় গিয়ে দেখি; লোকেরা দল বেঁধে একজনকে ঘিরে বসে আছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তারা বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট ছাহাবাগণের মাঝে ইনিই শ্রেষ্ট ফকীহ। নামা 'আমর আল বাকালী (রাঃ)

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী বলেন–

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ أَصْحَابٌ مَعْرُوْفُوْنَ حَرَّرُوْا فُتْيَاهُ وَمَذَاهِبَهُ فِي الْفِقْهِ غَيْرَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَكَانَ يَتْرُكُ مَذْهَبَهُ وَقَوْلَهُ لِقَوْلِ عُمَرَ رض وَكَانَ لَا يَكَادُ يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ وَيَرْجِعُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَقْنُتُ، وَقَالَ وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللّٰهِ رض

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া আর কোন ছাহাবীর স্বনামধন্য শিষ্য ছিলো না। ফলে তাঁদের ফতোয়া ও ইজতিহাদ (আগাগোড়া) বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ইবনে মাসউদই একমাত্র ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও নিজস্ব ইজতিহাদের পরিবর্তে হযরত ওমর (রাঃ)কেই তিনি অনুসরণ করতেন। পারতপক্ষে হযরত ওমর (রাঃ)এর কোন ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেননি। বরং নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তাঁর মতামতই মেনে নিতেন। ইমাম শা'বী বলেন, ইবনে মাসউদ কুনূত পড়তেন না। (কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে,) হযরত ওমর (রাঃ) কুনূত পড়লে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ অবশ্যই তা পড়তেন।

এই হলো ছাহাবাযুগের ব্যক্তিতাকলীদের নমুনা। তবে মুকাল্লিদের ইলম ও প্রজ্ঞার তারতম্যের কারণে তাকলীদেরও স্তর তারতম্য হতে পারে। এমনকি ব্যক্তিতাকলীদের গণ্ডীতে থেকেও মুকাল্লিদ ক্ষেত্রবিশেষে আপন ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হানাফী মাযহাবের মাশায়েখ ও শীর্ষ আলিমগণ মূলনীতি পর্যায়ের ইমাম আবু হানিফার তাকলীদ বজায় রেখে বিশেষ বিশেষ মাসআলায় এসে নিঃসংকোচে ভিন্ন ফতোয়াও প্রদান করেছেন। "তাকলীদের স্তর তারতম্য" শিরোনামে এ সম্পর্কে সম্প্রসারিত আলোচনা পরে আসছে। এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, ছাহাবাগণের পুণ্যযুগে মুক্ততাকলীদের পাশাপাশি ব্যক্তিতাকলীদের ধারাও বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা যার ছিলো না, তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ ছাহাবীগণের তাকলীদ করতেন। তবে কেউ অনুসরণ করেছেন ব্যক্তিতাকলীদের পথ। আর কারো বা মুক্ততাকলীদই ছিলো অধিক পছন্দ। সুতরাং দু একটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল উদাহরণ টেনে এতগুলো সুস্পষ্ট ও সুসংহত তথ্য প্রমাণ উপেক্ষা করা কোন অবস্থাতেই বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিচায়ক হতে পারে না। বস্তুতঃ এরপরও ছাহাবাযুগে তাকলীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মেঘখণ্ডের কারণে মধ্যাকাশে সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) তাঁর বিপ্লবী গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন–

وَلَيْسَ مَحَلُّهُ فِيْمَنْ لَا يَدِيْنُ إِلَّا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْتَقِدُ حَلَالًا إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا حَرَامًا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ لٰكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِطَرِيْقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ مِنْ كَلَامِهِ وَلَا بِطَرِيْقِ الْاِسْتِنْبَاطِ مِنْ كَلَامِهِ اتَّبَعَ عَالِمًا رَاشِدًا عَلٰى أَنَّهُ مُصِيْبٌ فِيْمَا يَقُوْلُ وَيُفْتِيْ ظَاهِرًا مُتَّبِعٌ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ خَالَفَ مَا يَظُنُّهُ أَقْلَعَ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِدَالٍ وَلَا إِصْرَارٍ فَهٰذَا كَيْفَ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مَعَ أَنَّ الْاِسْتِفْتَاءَ وَالْإِفْتَاءَ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَفْتِيَ هٰذَا دَائِمًا، أَوْ يَسْتَفْتِيَ هٰذَا حِيْنًا وَذٰلِكَ حِيْنًا بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ مُجْمِعًا عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ ـ (حجة الله البالغة ج-١/ص-١٥٦)

কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে, রাসূল ছাড়া অন্য কারো উক্তি হুজ্জত নয় এবং আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য কারো হালাল হারাম নির্ধারণের এখতিয়ার নেই। অতঃপর যদি সে হাদীসের অর্থ নির্ধারণ, দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং হাদীস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে অক্ষমতার কারণে হিদায়াতপ্রাপ্ত কোন আলিমকে এই শর্তে অনুসরণ করে যে, তিনি সুন্নাহ মুতাবেক ফতোয়া দিবেন এবং সুন্নাহ বিরোধী ফতোয়া দিচ্ছেন, প্রমাণিত হওয়া মাত্র নির্দ্বিধায় তাকে বর্জন করা হবে। তাহলে আমার মতে কোন বিবেকবানের পক্ষে তার নিন্দা করা সম্ভব নয়। কেননা ফতোয়া প্রদান ও গ্রহণের বৈধতা যখন প্রমাণিত হলো তখন) নির্দিষ্ট একজনের কিংবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের ফতোয়া গ্রহণ একই কথা। তবে ফতোয়াদাতাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

ব্যক্তিতাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

আশা করি উপরের আলোচনায় সন্দেহাতীতরূপেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের তিন কল্যাণযুগে উম্মাহর মাঝে শরীয়ত স্বীকৃত উভয় প্রকার তাকলীদই বিদ্যমান ছিলো।

তবে পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে মুক্ততাকলীদের পরিবর্তে ব্যক্তিতাকলীদের অপরিহার্যতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁদের পাক রুহের উপর আল্লাহর অশেষ করুণার শীতল বারিধারা বর্ষিত হোক। যুগের পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং সমাজের ক্রমাবনতি ও বিপথগামীতার উপর ছিলো তাদের সদা সতর্ক দৃষ্টি। তাই ওয়ারিসে নবী হিসাবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বৈপ্লবিক ফতোয়া তাঁরা প্রদান করেছিলেন। তাঁরা জানতেন; প্রবৃত্তির গোলামী এমন এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি যা মানুষকে যে কোন সময় নিমজ্জিত করতে পারে কুফর ও নাস্তিকতার অতল পংকে। এজন্যই কোরআন ও সুন্নাহ মানুষকে প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বেচেঁ থাকার উদাত্ত আহবান জানিয়েছে বারবার। বস্তুতঃ কোরআন সুন্নাহর এক বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে প্রবৃত্তির গোলমীর বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা ও সতর্কবাণী।

পাপকে পাপ জেনেও প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ অনেক সময় বিরাট বিরাট অপরাধ করে বসে। মানব চরিত্রের এ--এক দুর্বল ও ঘৃণ্য দিক সন্দেহ নেই। তবু এ ক্ষেত্রে অনুশোচনা জাগ্রত হওয়ার এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করার কিঞ্চিত অবকাশ ও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ যখন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টায় লেগে যায় তখন তওবা ও অনুশোচনার কোন সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট থাকে না। শরীয়ত তখন হয়ে পড়ে তার ইচ্ছার দাস। বলাবাহুল্য যে, এ অপরাধ আরো জঘন্য, আরো খতরনাক।

সমাজনাড়ির স্পন্দনের উপর হাত রেখে ওয়ারিসে নবী আলিমগণ স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, জীবনের সর্বস্তরে নৈতিকতা ও ধার্মিকতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এবং তাকওয়া এখলাস ও পরকাল চিন্তার স্থানে শিকড় গেড়ে বসেছে শয়তানী, মুনাফেকী ও স্বার্থান্ধতা। প্রবৃত্তির ঘৃণ্য চাহিদা পূরণে

শরীয়তকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেও মানুষ তখন দ্বিধাবোধ করছে না। এমতাবস্থায় সীমিত পর্যায়েও যদি মুক্ততাকলীদের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ সেই ছিদ্রপথে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতসারে জড়িয়ে পড়বে প্রবৃত্তির গোলামীতে। যা তার জন্য বয়ে আনবে দ্বীন ও দুনিয়ার ধ্বংস ও বরবাদী।

যেমন শরীরের কোন অংশ থেকে রক্ত বের হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানিফার ইজতিহাদ মতে অজু ভেঙ্গে গেলেও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অজু ভংগের কারণ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর ফতোয়া মতে স্ত্রীলোকের স্পর্শ অজু ভংগের কারণ হলেও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাতে একমত নন। এবার মনে করুন, প্রচণ্ড শীতের রাতে কারো দাঁত থেকে রক্ত বের হলো আবার তার স্ত্রীও তাকে স্পর্শ করলো তখন প্রবৃত্তি তাড়িত দুর্বল মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একবার ইমাম আবু হানিফা এবং একবার ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর তাকলীদের নামে বিনা অজুতেই নামাজ পার করে দিতে চাইবে। মোটকথা; মানুষের আরামপ্রিয় ও সুযোগসন্ধানী মন যখন যে ইমামের মাযহাবকে সুবিধাজনক মনে করবে তখন সেদিকে ঝুঁকে পড়বে। যে ইমামের ফতোয়া ও ইজতিহাদ তার চাহিদা ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হবে সে ইমামের দলিল যুক্তিই তার কাছে মনে হবে অকাট্য। এভাবে মানুষের দুনিয়া, আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়ত হয়ে পড়বে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের শয়তানী চাহিদার বাহন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রসংগটি তুলে ধরেছেন তাঁর এ বিশ্লেষণধর্মী লেখায়।

وَقَدْ نَصَّ الاِمَامُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّعْتَقِدَ الشَّيْءَ وَاجِبًا وَحَرَامًا، ثُمَّ يَعْتَقِدُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ اَوْ مُحَرَّمٍ بِمُجَرَّدِ هَوَاهُ، مِثْلُ اَنْ يَّكُوْنَ طَالِبًا لِشُفْعَةِ الْجِوَارِ يَعْتَقِدُهَا اَنَّهَا حَقٌّ لَهُ ثُمَّ اِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ شُفْعَةُ الْجِوَارِ اعْتَقَدَهَا اَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً، اَوْ مِثْلُ مَنْ يَعْتَقِدُ اِذَا كَانَ اَخًا مَعَ جَدٍّ اَنَّ الاِخْوَةَ تُقَاسِمُ الْجَدَّ فَاِذَا صَارَ جَدًّا مَعَ اَخٍ اعْتَقَدَ اَنَّ الْجَدَّ لَا تُقَاسِمُ الاِخْوَةَ ... فَمِثْلُ هٰذَا مِمَّنْ يَكُوْنُ فِيْ اعْتِقَا ده

حَلَّ الشَّيْءُ وَحُرْمَتُهُ وَوُجُوبُهُ وَسُقُوطُهُ بِسَبَبِ هَوَاهُ هُوَ مَذْمُومٌ مَجْرُوحٌ خَارِجٌ عَنِ الْعَدَالَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ هٰذَا لَا يَجُوزُ ـ

ইমাম আহমদ সহ অন্যান্যদের দ্ব্যর্থহীন মত এই যে, নিছক প্রবৃত্তি বশতঃ কোন বিষয়কে ওয়াজিব বা হারাম দাবী করে পর মুহূর্তে বিপরীত কথা বলার অধিকার নেই। যেমন, প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে শোফা দাবী করার মতলবে কেউ বললো (আবু হনিফার মতে তো) শোফা একটি শরীয়তসম্মত অধিকার। কিন্তু পরে যখন তার প্রতিকুলেও শোফার দাবী উঠলো তখন বেমালুম সুর পালটে সে বলা শুরু করল যে, (ইমাম শাফেয়ীর মতে তো) প্রবিবেশিতা সূত্রে কারো শোফা দাবী করার অধিকার নেই।

তদ্রূপ, ভাই ও দাদার জীবদ্দশায় কারো মৃত্যু হলো। অমনি ভাই সাহেব দাবী জুড়ে দিলেন যে, (অমুক ইমামের মতে) দাদার সাথে ভাইও মিরাসের অংশীদার। কিন্তু যেই তিনি দাদা হলেন আর নাতি এক ভাই রেখে মারা গেলো অমনি তিনি সুর পাল্‌টে দিব্যি বলতে শুরু করলেন যে, (অমুক ইমামের মতে কিন্তু) দাদার জীবদ্দশায় ভাই অংশ পায় না। মোটকথা; হারাম হালাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধিই যার একমাত্র মাপকাঠি সে অবশ্যই অধার্মিক।১

অন্যত্র তিনি লিখেছেন–

يَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُفْسِدُهُ وَفِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُصَحِّحُهُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ وَالْهَوٰى وَمِثْلُ هٰذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ،

"এ ধরনের লোকেরা স্বার্থের অনুকূল হলে সেই ইমামের তাকলীদ করে যিনি বিবাহ বিশুদ্ধ হয়েছে বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আবার স্বার্থের প্রতিকূল হলে ঐ ইমামের তাকলীদ করে যিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রবৃত্তির এমন বল্‌গাহীন গোলামী সকল ইমামের মাযহাবেই হারাম। কেননা এটা দ্বীন ও শরীয়তকে ছেলে খেলার পাত্র বানানোর শামিল।২

১। ফাতাওয়াল কুবরা, খঃ ২ পৃষ্ঠা ২৩৭
২। আল ফাতাওয়াল কুবরা, খঃ২ পৃঃ ২৮৫–৮৬

মোটকথা; প্রবৃত্তি বশতঃ একেক সময় একেক ইমামের ফতোয়ার উপর আমল করা কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে খুবই সংগীন অপরাধ। এখানে আমরা আর সবাইকে বাদ দিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা ব্যক্তিতাকলীদ বিরোধীরাও তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের সামনে শ্রদ্ধাবনত। তদুপরি তিনি নিজেও ব্যক্তিতাকলীদ সমর্থক নন। এমন যে ইবনে তায়মিয়া, তিনি পর্যন্ত এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মুতাবেক হারাম বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন।

ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের পূণ্যযুগে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে যেহেতু পরকাল চিন্তা ও আল্লাহভীতি বিদ্যমান ছিলো। ছিলো ইখলাস ও তাকওয়ার অখণ্ড প্রভাব। সেহেতু মুক্ততাকলীদের ছদ্মাবরণে প্রবৃত্তিসেবা ও ইন্দ্রীয় পরায়নতার কথা কল্পনাও করা যেতো না সে যুগের সে সমাজ ও পরিবেশে। তাই মুক্ততাকলীদের উপর বিধি নিষেধ আরোপেরও কোন প্রয়োজন হয়নি তখন।

কিন্তু পরবর্তীতে উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও ফকীহগণ যখন সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বিবেক ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট আলামত দেখতে পেলেন তখন দ্বীন ও শরীয়তের হিফাজতের স্বার্থেই তারা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, মুক্ততাকলীদের পরিবর্তে এখন থেকে ব্যক্তিতাকলীদের উপরই আমল করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। বস্তুতঃ ওয়ারিসে নবী হিসাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিলো তাঁদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিতাকলীদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাদাতা শায়খুল ইসলাম আল্লামা নববী (রঃ) লিখেছেন–

وَوَجْهُه اَنَّهُ لَوْجَازَ اِتِّبَاعُ اَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ لَاَفْضَى اِلَى اَنْ يَّلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ وَالْوُجُوْبِ الْجَوَازِ، وَذٰلِكَ يُؤَدِّىْ اِلَى انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيْفِ بِخِلَافِ

العَصْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ المَذَاهِبُ التَّوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الحَوَادِثِ مُهَذَّبَةً وَعُرِفَتْ فَعَلَى هٰذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ عَلَى التَّعْيِينِ

ব্যক্তিতাকলীদ অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই যে, মুক্ততাকলীদের অনুমতি দেয়া হলে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ সকল মাযহাবের অনুকূল বিষয়গুলোই শুধু বেছে নিবে। ফলে হারাম হালাল ও বৈধাবৈধ নির্ধারণের এখতিয়ার এসে যাবে তার হাতে। প্রথম যুগে অবশ্য ব্যক্তিতাকলীদ সম্ভব ছিলো না। কেননা ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবগুলো যেমন সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাংগ ছিলো না তেমনি সর্বত্র সহজলভ্যও ছিলো না। কিন্তু এখন তা সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাংগ আকারে সর্বত্র সহজলভ্য।

সুতরাং যে কোন একটি মাযহাব বেছে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে তা অনুসরণ করাই এখন অপরিহার্য।১

১। শরহুল মুহায্যাব, খঃ১ পৃঃ ১৯

আল্লামা নববীর বক্তব্যের খোলাসা কথা এই যে, ছাহাবাযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যত ফকীহ মুজতাহিদ গত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের ফতোয়া সমুষ্টিতেই কিছু না কিছু সহজ ও সুবিধাজনক বিষয় রয়েছে। তদুপরি মানুষ হিসাবে কোন মুজতাহিদই সর্বাংশে ভুলের উর্ধ্বে নন। ফলে প্রত্যেকের মাযহাবেই এমন কিছু ফতোয়া পাওয়া যাবে যা উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের সম্মিলিত মতামতের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। এমতাবস্থায় মুক্ততাকলীদের চোরা পথে স্বার্থান্ধ মানুষ যদি সকল মাযহাবের সুবিধাজনক বিষয়গুলোই শুধু বেছে নিতে শুরু করে, তাহলে আল্লামা নববীর আশংকাই সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং হারাম হালাল নির্ভর করবে মানুষের স্বার্থ ও মর্জির উপর। ধরুন; ইমাম শাফেয়ী ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের (অসমর্থিত) মতে যথাক্রমে দাবা ও সংগীতচর্চা বৈধ ও নির্দোষ চিত্তবিনোদনের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ কাসেম বিন মুহাম্মদ সম্পর্কে বলা হয় যে, আলোকচিত্রের বৈধতার অনুকূলে তাঁর ফতোয়া

রয়েছে। এদিকে ইমাম আ'মাসের মতে ফজর উদয়ের পরিবর্তে সূর্যোদয় হচ্ছে রোযার প্রারম্ভিক সময়। আর আতা বিন আবী রাবাহ–এর মতে শুক্রবারে ঈদ হলে জুমা যোহর উভয়টি নাকি মওকুফ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেদিন আসর পর্যন্ত কোন ফরজ সালাত নেই। দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাযাম এর মাযহাব মতে বিবাহের উদ্দেশ্যে যে কোন নারীর নগ্ন শরীর দেখা যেতে পারে। আর আল্লামা ইবনে শাহনুনের মতে নাকি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সংগমও বৈধ।১

এখানে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে ফকীহ ও মুজতাহিদগণের ফতোয়া সমষ্টিতে এ ধরনের বহু মাসায়েল রয়েছে। **এমতাবস্থায় মুক্তাকলীদের অনুমতি দেয়া হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপরোক্ত ফতোয়া ও মাসায়েলের সমন্বয়ে এমন এক পাঁচ মিশালীমাযহাব তৈরী হবে যার প্রবর্তককে শয়তানের সাক্ষাত মুরীদ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।**

হযরত মুআম্মার বড় সুন্দর বলেছেন–

لَوْاَنَّ رَجُلاً اَخَذَ بِقَوْلِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِى اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَاِتْيَانِ النِّسَاءِ فِى اَدْبَارِهِنَّ، وَبِقَوْلِ اَهْلِ مَكَّةَ فِى الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ، وَبِقَوْلِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فِى الْمُسْكِرِ كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللّٰهِ

১। নববী কৃত শারহে মুসলিম খঃ২ পৃঃ১৯৯। ইতহাফে সাদাতিল মুত্তাকীন, খঃ২ পৃঃ৪৫৮। তাহযীবুল আসমা, খঃ১ পৃঃ ৩৩৪। রুহুল মা'আনী, খঃ২ পৃঃ২৭। ফাতহুল মুলহিম, খঃ৩ পৃঃ৪৭৬। তালখীসল হাবীর ইবেন হাজর কৃত, খঃ৩ পৃঃ১৮৬–৮৭

কেউ যদি গান, সংগীত ও গুহ্যদ্বারে স্ত্রী–সংগমের ক্ষেত্রে (কতিপয়) মদীনাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে এবং মোতা বিবাহের১ ক্ষেত্রে (কতিপয়) মক্কাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে। আর মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে (কতিপয়) কুফাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নিকৃষ্টতম বন্দারূপে চিহ্নিত হবে।২

১। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিবাহ।
২। তালখীসুল হাবীর খঃ৩ পৃঃ ১৮৭

এ হলো প্রবৃত্তিতাড়িত সুযোগসন্ধানী মানুষের হাল। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, ব্যক্তিতাকলীদের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করলে যাদের আমরা ধর্মপ্রাণ বলি তাদেরও প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের সমূহ আশংকা থেকে যাবে। কেননা নফসের কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের প্ররোচনা এতই সুক্ষ্ম ও ভয়ংকর যে, মানুষের অবচেতন মনও তার নাগালের বাইরে নয়।

এ বিষয়ে আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী (রঃ) অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। অতঃপর আল্লামা ইবনুল হোমামের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন–

وَالغَالِبُ انَّ مِثْلَ هٰذِهٖ الإلْتِزَامَاتِ لِكَفِّ النَّاسِ عَنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ

সম্ভবতঃ সুযোগসন্ধানী মানুষের সহজিয়া মনোবৃত্তিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

আল্লামা আবু ইসহাক শাতেবী (রঃ) তাঁর স্বভাবসুলভ যুক্তিনির্ভর ভাষায় মুক্ততাকলীদের অপকারিতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরার পর এমন কিছু লোকের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করেছেন যারা মুক্ততাকলীদের ছিদ্রপথে প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করতে গিয়ে কোরআন ও সুন্নাহর পবিত্রতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে বসেছে। তিনি আরো লিখেছেন–মালেকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মাযারী (রঃ) এর উপর একবার মালেকী মাযহাবের একটি গায়রে মশহুর (অসমর্থিত ও দুর্বল) ক্বওল (মত) অনুযায়ী ফতোয়া প্রদানের জন্য সরকারী চাপ এসেছিলো কিন্তু আল্লামা মাযারী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করলেন–

وَلَسْتُ مِمَّنْ يَّحْمِلُ النَّاسَ عَلٰى غَيْرِ الْمَعْرُوْفِ الْمَشْهُوْرِ مِنْ مَذَاهِبِ مَالِكٍ وَاَصْحَابِهٖ لانَّ الوَرَعَ قَلَّ، بَلْ كَادَ يَعْدِمُ وَالتَّحَفُّظَ عَلَى الدِّيَانَاتِ كَذٰلِكَ، وَكَثُرَتِ الشَّهَوَاتُ وَكَثُرَ مَنْ يَّدَّعِى الْعِلْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتْوٰى فِيْهِ فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ بَابٌ فِىْ مُخَالَفَةِ الْمَذَاهِبِ لاتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وَهَتَكُوْا حِجَابَ هَيْبَةِ الْمَذَاهِبِ وَهٰذَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِىْ لَا خَفَاءَ بِهَا-

ইমাম মালেক ও তাঁর শিষ্যগণের গায়রে মশহুর ক্বওলের উপর আমল করার জন্য মানুষকে আমি কিছুতেই উৎসাহ যোগাতে পারি না। কেননা এমনিতেই তাক্ওয়া ও দ্বীনদারীর অনুভূতি লোপ পেতে বসেছে এবং মানুষের পাশববৃত্তি চাংগা হয়ে উঠেছে। সেইসাথে ইলমের এমন সব দাবীদার গজিয়েছে, ফতোয়া দিতে গিয়ে যারা আল্লাহ– রাসূলের কোন ভয় করে না। তাদের জন্য মালেকী মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণের দুয়ার একবার খুলে দেয়া হলে সংশোধনের কোন চেষ্টাই আর কাজে আসবে না। (মানুষ ও তার প্রবৃত্তির মাঝে) মাযহাবের যে আড়াল এখনও বিদ্যমান রয়েছে তা খান খান হয়ে যাবে। আর এটা যে হবে চরমতম ফেতনা তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।১

১। ইমাম শাতেবী কৃত আল মুওয়াফাকাত, খঃ৪ পৃঃ১৪৬–৪৭ কিতাবুল ইজতিহাদ আত্তারফুল আওয়াল। মাসআলা–৩ ফসল–৫

অতঃপর আল্লামা শাতেবীর মন্তব্য হচ্ছে–

فَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَتَجَزْ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِمَامَتِهِ، الْفَتْوَى بِغَيْرِ مَشْهُوْرِ الْمَذْهَبِ، وَلَا بِغَيْرِ مَا يُعْرَفُ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ مَصْلَحِيَّةٍ ضَرُوْرِيَّةٍ، إِذْ قَلَّ الْوَرَعُ وَالدِّيَانَةُ مِنْ كَثِيْرٍ مِمَّنْ يَنْتَصِبُ لِبَثِّ الْعِلْمِ وَالْفَتْوَى، كَمَا تَقَدَّمَ تَمْثِيْلُهُ فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ هٰذَا الْبَابُ لَانْحَلَّتْ عُرَى الْمَذْهَبِ بَلْ جَمِيْعُ الْمَذَاهِبِ ـ

দেখুন; সর্বজনমান্য ইমাম হয়েও আল্লামা মাযারী মালেকী মাযহাবের একটি গায়রে মশহুর ক্বওলের উপর ফতোয়া প্রদানের দাবী কেমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করেছেন। প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে তার এ সিদ্ধান্ত ছিলো খুবই যুক্তিযুক্ত। কেননা (সাধারণ লোকের কথা বাদ দিয়ে খোদ) আলিম সমাজের মাঝেও তাকওয়া ও আমানতদারী আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিছু কিছু উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখও করেছি। সুতরাং এই দায়িত্বজ্ঞানহীনদের জন্য সুযোগ সন্ধানের অর্গল একবার খুলে দেয়া হলে অনিবার্যভাবে মালেকী মাযহাব সহ সকল মাযহাবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।১

১। ইমাম শাতেবী কৃত আল মুওয়াফাকাত, খঃ৪ পৃঃ১৪৬–৪৭ কিতাবুল ইজতিহাদ

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন ব্যক্তিতাকলীদের নিরংকুশ প্রসারের কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রসংগে লিখেছেন–

وَوَقَفَ التَّقْلِيْدُ فِى الْاَمْصَارِ عِنْدَ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَدَرَسَ الْمُقَلِّدُوْنَ لِمَنْ سِوَاهُمْ وَسَدَّ النَّاسُ بَابَ الْخِلَافِ وَطُرُقَهُ لَمَّا كَثُرَ تَشَعُّبُ الْاِصْطِلَاحَاتِ فِى الْعُلُوْمِ وَلَمَّا عَاقَ عَنِ الْوُصُوْلِ اِلٰى رُتْبَةِ الْاِجْتِهَادِ وَلَمَّا خُشِىَ مِنْ اِسْنَادِ ذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ وَمَنْ لَا يُوْثَقُ بِرَأْيِهِ وَلَا بِدِيْنِهِ فَصَرَّحُوْا بِالْعَجْزِ وَالْاِعْوَازِ وَرَدُّوْا النَّاسَ اِلٰى تَقْلِيْدِ هٰؤُلَاءِ كُلٌّ مَنِ اخْتَصَّ بِهِ مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ وَحَظَرُوْا اَنْ يُتَدَاوَلَ تَقْلِيْدُهُمْ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّلَاعُبِ

অন্যান্য ইমামের মুকাল্লিদগণের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বর্তমানে তাকলীদ চার ইমামের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর আলিমগণ চার ইমামের সাথে ভিন্নমত পোষণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কেননা প্রথমতঃ ইলমের সকল শাখায় পারিভাষিক জটিলতা ও ব্যাপকতাসহ বিভিন্ন কারণে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন দুরূহ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদের ধারালো অস্ত্র এমন সব অযোগ্য লোকদের দখলে চলে যাওয়ার আশংকা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো যাদের ইলম ও ধার্মিকতার উপর কোন অবস্থাতেই আস্থা রাখা সম্ভব নয়। উপরোক্ত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলিমগণ ইজতিহাদের জটিল অংগণে নিজেদের দীনতা ও অপারগতার অকপট স্বীকৃতি দিয়ে সর্বসাধারণকে চার ইমামের যে কোন একজনের তাকলীদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে বার বার ইমাম বদলের স্বাধীনতার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যাতে (শরীয়ত নিয়ে) মানুষ ছিনিমিনি খেলার সযোগ না পায়।১

১। আল মুকাদ্দিমা, পৃঃ৪৪৮

মোটকথা; রাসূলের সান্নিধ্য ও নৈকট্যের কল্যাণে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের পুণ্যযুগে পবিত্রতা ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া ও ইখলাসের অপ্রতিহত প্রভাব ছিলো সমাজ ও জীবনের সর্বত্র। প্রবৃত্তির উপর ঈমান ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ ছিলো সুদৃঢ়। আল্লাহর ভয় ও পরকাল চিন্তা ছিলো প্রবল। ফলে তাদের পক্ষে শরীয়ত ও আহকামের ক্ষেত্রে নফ্সের পায়রবীর কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। এক কথায়; দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে তাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অন্তরায় ছিলো না। তাই তখন উভয় প্রকার তাকলীদেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রচলন ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে খালদুন বর্ণিত আশংকা প্রকট হয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিতে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় আলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে মুক্ততাকলীদের অনুমোদন রহিত করে ব্যক্তিতাকলীদকেই বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ ওয়ারিসে নবী হিসাবে তাঁরা তখন এ মহা প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হত তা আমাদের পক্ষে আজ আন্দাজ করাও বুঝি সম্ভব নয়। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) তাই লিখেছেন।

وَاعْلَمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا فِى الْمِائَةِ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ غَيْرَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ وَبَعْدَ الْمِائَتَيْنِ ظَهَرَ فِيْهِمُ التَّمَذْهُبُ لِلْمُجْتَهِدِيْنَ بِاَعْيَانِهِمْ وَقَلَّ مَنْ كَانَ لَا يَعْتَمِدُ عَلٰى مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ بِعَيْنِهِ وَكَانَ هٰذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ

"প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের একক তাকলীদের সাধারণ প্রচলন ছিলো না। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর থেকেই মূলতঃ এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের ধারা শুরু হয়। ব্যক্তিতাকলীদের তুলনায় মুক্ততাকলীদের অনুসারী সংখ্যায় তখন খুবই কম ছিলো; সে যুগে এটাই ছিলোওয়াজিব।১

কোন কোন বন্ধু এই বলে প্রশ্ন তুলেছেন যে, ছাহাবা তাবেয়ী যুগের ঐচ্ছিক বিষয় পরবর্তী কালে এসে ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হতে পারে কি

১। আল ইন্সাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ৫৭-৫৯

করে? শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) অনেক আগেই কিন্তু এ ধরনের স্থূল আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দিয়ে গেছেন। তাঁর ভাষায়–

قُلْتُ الوَاجِبُ الاَصْلِيُّ هُوَاَن يَكُوْنَ فِى الاُمَّةِ مَنْ يَّعْرِفُ الاَحْكَامَ الفَرْعِيَّةَ مِن اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ، اَجْمَعَ عَلٰى ذٰلِكَ اَهْلُ الحَقِّ ومُقَدَّمَةُ الوَاجِبِ وَاجِبَةٌ، فَاِذَا كَانَ لِلْوَاجِبِ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَجَبَ تَحْصِيْلُ طَرِيْقٍ مِنْ تِلْكَ الطُّرُقِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ، وَاِذَاتَعَيَّنَ لَه طَرِيْقٌ وَاحِدٌ وَجَبَ ذٰلِكَ الطَّرِيْقُ بِخُصُوصِه.. . وَكَانَ السَّلَفُ لَايَكْتُبُوْنَ الحَدِيْثَ وَاجِبَةٌ، لِاَنَّ رِوَايَةَ الحَدِيْثِ لَاسَبِيْلَ لَهَا اليَوْمَ اِلَّامَعْرِفَةُ هٰذِهِ الكُتُبِ وَكَانَ السَّلَفُ لَايَشْتَغِلُوْنَ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَكَانَ لِسَانُهُمْ عَرَبِيًّا لَايَحْتَاجُوْنَ اِلٰى هٰذِهِ الفُنُوْنِ، ثُمَّ صَارَ يَوْمَنَا هٰذَا مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَاجِبَةً لِبُعْدِ العَهْدِ عَنِ العَرَبِ الاَوَّلِ، وَشَوَاهِدُ مَانَحْنُ فِيْهِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، وَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِى اَنْ يُقَاسَ وُجُوبُ التَّقْلِيْدِ لِاِمَامٍ بِعَيْنِه فَاِنَّه قَدْ يَكُوْنُ وَاجِبًا وَقَدْ لَايَكُوْنُ وَاجِبًا.

"এ প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য হলো, আহলে হক আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক যুগেই উম্মাহর এমন কতক লোকের উপস্থিতি একান্ত জরুরী যারা দলীল ও উৎস সমেত যাবতীয় মাসায়েলের আলিম হবেন (যাতে সাধারণ লোকের পক্ষে মাসায়েল জেনে আমল করা সম্ভব হয়।) আর এও এক স্বীকৃত সত্য যে, ওয়াজিব বিষয়ের পূর্ব শর্তটিও ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোন ওয়াজিব বিষয় পালনের পথ ও পন্থা একাধিক হলে যে কোন একটি গ্রহণ করাই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে একটি মাত্র পন্থা হলে সুনির্দিষ্টভাবে সেটাই ওয়াজিব হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সকল (পূর্বসূরীগণ) হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না, অথচ আমাদের সময়ে তা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা সংকলন গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া ছাড়া হাদীস

বর্ণনার অন্য কোন উপায় এখন নেই। তদ্রূপ মাতৃভাষা আরবী হওয়ার সুবাদে তাদেরকে ভাষা ও ব্যাকরণ শিখতে হয়নি। অথচ আমাদের সময়ে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। কেননা আদী আরবদের সাথে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। মোটকথা; (সময়ের ব্যবধানে ঐচ্ছিক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার) হাজারো নজির রয়েছে। ব্যক্তিতাকলীদ বা এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের বিষয়টিও একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। এটাও সময়ের ব্যবধানে ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক হতে পারে।১

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে কিছুদূর পর শাহ সাহেব আরো লিখেছেন–

فَاِذَا كَانَ اِنْسَانٌ جَاهِلٌ فِىْ بِلَادِ الْهِنْدِ وَمَاوَرَاءَ النَّهْرِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالِمٌ شَافِعِىٌّ وَلَا مَالِكِىٌّ وَلَا حَنْبَلِىٌّ وَلَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ هٰذِهِ الْمَذَاهِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُّقَلِّدَ لِمَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهٖ لِاَنَّهٗ حِيْنَئِذٍ يَخْلَعُ مِنْ عُنُقِهٖ رِبْقَةَ الشَّرِيْعَةِ وَيَبْقٰى سُدًى مُهْمَلًا، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ فِى الْحَرَمَيْنِ

"সুতরাং ভারত কিংবা এশিয়া মাইনরের সাধারণ উম্মী লোকের জন্য যদি সেখানে অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ বা ফিকাহ গ্রন্থ না থাকে– ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর তাকলীদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা হানাফী মাযহাব বর্জন করার অর্থ হবে শরীয়তের গণ্ডিচ্যুত হয়ে ধ্বংসের স্রোতে ভেসে যাওয়া। পক্ষান্তরে হারামাইন শরীফে অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ ও ফিকাহ গ্রন্থ বিদ্যমান থাকার কারণে যে কোন এক মাযহাবের তাকলীদ করার অবকাশ থাকবে।২

মুক্ততাকলীদের স্থানে ব্যক্তিতাকলীদকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে পরবর্তী আলিমগণ যে বিরাট সম্ভাব্য ফিৎনার মূলোৎপাটন করেছেন সে সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেবের মন্তব্য হলো–

১। । আল ইনসাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ৫৭–৫৯
২। আল ইনসাফ, পৃঃ ৬৯–৭১

وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّمَذْهَبُ لِلْمُجْتَهِدِيْنَ سِرٌّ أَلْهَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْعُلَمَاءَ وَجَمَعَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُوْنَ أَوْلَا يَشْعُرُوْنَ

"মূলতঃ এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের বাধ্যতামূলক নির্দেশটি খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আলিমগণের অন্তরে ইলহাম (ঐশী উপলব্ধি)রূপে অবতীর্ণ। ফলে সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে সকলেই অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন।"

অন্যত্র শাহ সাহেব আরো লিখেছেন–

إِنَّ هٰذِهِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الْمُدَوَّنَةَ الْمُحَرَّرَةَ قَدْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَوْمَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهَا عَلٰى جَوَازِ تَقْلِيْدِهَا إِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا وَفِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ مَالَا يَخْفٰى، لَاسِيَّمَا فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الَّتِيْ قَصُرَتْ فِيْهَا الْهِمَمُ جِدًّا، وَأُشْرِبَتِ النُّفُوْسُ الْهَوٰى، وَأُعْجِبَ كُلُّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ

"গোটা উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমানে মাযহাব চতুষ্টয়ের (যে কোন একটির একক) তাকলীদই শুধু বৈধ হবে। কেননা মানুষের মনোবলে যেমন ভাটা পড়েছে তেমনি প্রবৃত্তির গোলামী হৃদয়ের পরতে পরতে শিকড় গেড়ে বসেছে। আর (অহংবোধ এমন প্রবল যে, যুক্তির বদলে) নিজস্ব মতামতই এখন মুখ্য।"১

শাহ সাহেবের মতে অবশ্য প্রথম তিন শতকে ব্যক্তিতাকলীদ তথা এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের প্রচলন ছিলো না। পরবর্তী আলিমগণই উম্মাহর জন্য তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। তবে আমরা কিন্তু ব্যক্তিতাকলীদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান কর্তৃক কোরআন সংগ্রহ–সংকলন ঘটনার মধ্যে। হাফেজ ইবনে জরীর ও তার অনুগামীদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের খেলাফতকাল পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াতের

১ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, খঃ১ পৃঃ১৫৪

ক্ষেত্রে সাত আঞ্চলিক ভাষার যে কোনটি অনুসরণের অনুমতি ছিলো। ফলে সবাই পছন্দ মতো যে কোন গোত্রীয় ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতো। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এক বৈপ্লবিক ঘোষণার মাধ্যমে কুরাইশ বাদে আর ছয়টি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট অনুলিপিগুলো জ্বালিয়ে ফেলারও নির্দেশ জারি করেছিলেন। কেননা তিনি তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কোরআন তেলাওয়াতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে উম্মাহ এক ভয়াবহ ফেতনায় জড়িয়ে পড়বে। এ প্রসংগে আল্লামা ইবনে জারীর লিখেছেন–

فَكَذٰلِكَ الْأُمَّةُ أُمِرَتْ بِحِفْظِ الْقُرْاٰنِ وَقِرَاءَتِه، وَخُيِّرَتْ فِىْ قِرَاءَتِه بِاَىِّ الْاَحْرُفِ السَّبْعَةِ شَاءَتْ قَرَأَتْ، لِعَلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ اَوْجَبَتْ عَلَيْهَا الثَّبَاتَ عَلٰى حَرْفٍ وَاحِدٍ... قِرَاءَتُه بِحَرْفٍ وَاحِدٍ وَرَفْضَ الْقِرَاءَةِ بِالْاَحْرُفِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ

উম্মাহকে কোরআনের তিলাওয়াত ও হিফাজত তথা পঠন ও সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তবে পঠনের ক্ষেত্রে সাত আঞ্চলিক ভাষার অনুমতি ছিলো। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু কল্যাণকর দিক বিবেচনা করে উম্মাহ (সর্বসম্মতিক্রমে) ছয়টি আঞ্চলিক ভাষা বর্জন করে একটি মাত্র ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।১

এখন প্রশ্ন হলো; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্য যুগে যে কাজের অনুমোদন ও বৈধতা ছিলো পরবর্তীকালে কোন ভিত্তিতে তা প্রত্যাহার করা হলো? এ প্রশ্নে আল্লামা ইবনে জারীরের উত্তর এই যে, সাত আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত উম্মাহর জন্য বৈধ ছিলো। ফরজ বা বাধ্যতামূলক ছিলো না। তাই দ্বীন ও শরীয়তের হেফাজতের স্বার্থে অভিন্ন ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা মাত্র দ্বিধাহীনচিত্তে উম্মাহ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলো এবং

১। তাফসীরে ইবনে জরীর, খঃ১ পৃঃ১৯

كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِعْلِ مَافَعَلُوا ، إِذْ كَانَ الَّذِىْ فَعَلُوا مِنْ ذٰلِكَ كَانَ هُوَ النَّظَرُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، فَكَانَ الْقِيَامُ بِفِعْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِهِمْ أَوْلَىٰ مِنْ فِعْلِ مَالَوْ فَعَلُوهُ كَانُوا إِلَى الْجِنَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ ذٰلِكَ

ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর কল্যাণের জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ ছিলো অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কিঞ্চিত শিথিলতা প্রদর্শন কল্যাণের পরিবর্তে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাই ছিলো অধিক।

এ হলো হযরত উসমান কর্তৃক কোরআন সংগ্রহ–সংকলন সম্পর্কে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর মতামত। অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্নমতও রয়েছে। এ মতের পুরোধা হচ্ছেন ইমাম মালেক, আল্লামা ইবনুল জযারী, আল্লামা ইবনে কোতায়বা ও ইমাম আবুল ফজল রাজি প্রমুখ। তাঁদের মতে সাত আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের ধারা সাত ক্বেরাতের মাধ্যমে আজো অব্যাহত রয়েছে।১

১। আরবের প্রধান গোত্র ছিলো সাতটি। কোরাইশ, হুকীফ, তাঈ, হওয়াযেন, আহলে ইয়ামেন, হোযায়েল ও বনী তামীম। এই সাত গোত্রের মাঝে ভাষাগত পার্থক্য ছিলো বেশ লক্ষণীয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে স্ব স্ব গোত্রীয় ভাষায় কোরআন তিলাওয়াতের সাময়িক অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা আরবরা ছিলো উম্মী জাতি। লেখা পড়ার সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলো না। তাই তাদের সম্মিলিত ও সাধারণ কোন ভাষাও ছিলো না। এমতাবস্থায় কোরাইশের বিশুদ্ধ ভাষায় তিলাওয়াতের বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিলে বিষয়টি বেশ জটিল ও কষ্টকর হতো। হযরত উসমান (রাঃ) পর্যন্ত এ অনুমতি অব্যাহত ছিলো। ইতিমধ্যে পঠন পার্থক্যকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু গোলযোগের সূত্রপাত হতে লাগলো। ফলে উসমান (রাঃ) মাথাচাড়া দিয়ে উঠা সেই ফেৎনা গোড়াতেই নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য ছ'টি আঞ্চলিক ভাষা বর্জন করে কোরাইশী ভাষাকেই বাধ্যতামূলক করে দেন। অবশ্য সাত কেরাতের মাধ্যমে সাতটি আঞ্চলিক ভাষার তারতম্য এখনও কিঞ্চিত বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা; যে প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াতের সাময়িক অনুমতি দিয়েছিলেন তখন তা ফুরিয় গিয়েছিলো। তদুপরি এমন সব ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো, অংকুরেই যার মূলোৎপাটন ছিলো জরুরী। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) সেজন্য উপরোক্ত বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান (রাঃ) অভিন্ন পঠন পদ্ধতির সাথে সাথে অভিন্ন লিখন পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে কোরআনুল করীমের ক্ষেত্রে যে কোন লিখন–রীতি অনুসরণের অনুমতি ছিলো এমন কি সূরার বিন্যাসের ক্ষেত্রেও কোন বাধ্য বাধকতা ছিলো না। এমতাবস্থায় উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানই প্রথম কুরআনুল করীমের একক বিন্যাস ও অভিন্ন লিখন রীতি প্রবর্তন করে উম্মাহর জন্য তা বাধ্যতামূলক করেছেন। এমনকি অন্য সকল অনুলিপি জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশও তিনি জারি করেন।

মোটকথা; তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এর আলোচ্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হচ্ছে ব্যক্তিতাকলীদেরই এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা তাঁর পূর্বে পসন্দ মাফিক সাত আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন পঠন এবং অবাধ বিন্যাস ও লিখন পদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি ছিলো। কিন্তু তিনি দ্বীন ও শরীয়তের হেফাজতের স্বার্থে উম্মাহর জন্য অভিন্ন ভাষা বিন্যাস ও লিখন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করে দেন। তাকলীদের ক্ষেত্রে উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ তৃতীয় খলীফার এ আদর্শই অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ ছাহাবা তাবেয়ী যুগে ব্যক্তিতাকলীদ বাধ্যতামূলক ছিলো না সত্য; কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীন ও শরীয়তের হেফাজতের স্বার্থে মুক্তভাকলীদের অনুমতি রহিত করে ব্যক্তিতাকলীদকেই উম্মাহর জন্য তাঁরা বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং নবী–ওয়ারিসগণের সর্বসম্মত এ বৈপ্লবিক পদক্ষেপকে 'বেদ'আত' বলা আমাদের মতে এক নতুন বেদ'আত ছাড়া আর কিছু নয়।

চার মাযহাব কেন?

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আশা করি আমরা যাবতীয় প্রশ্ন ও দ্বিধা সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিতাকলীদের স্বরূপ ও অপরিহার্যতা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পেরেছি। অবশ্য সর্বশেষ যে প্রশ্নটি এখানে উথাপিত হতে পারে তা এই যে, ব্যক্তিতাকলীদের ক্ষেত্রে যে কোন এক মুজতাহিদের তাকলীদই যখন যথেষ্ট তখন তা চার মাযহাবে সীমিতকরণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ফিকাহ ও ইজতিহাদের অংগনে চার ইমামের মত বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী আরো বহু ইমাম ও মুজতাহিদেরই তো জন্ম হয়েছে। যেমন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়ে,

ইমাম বুখারী, ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শাবরামাহ ও হাসান বিন সাহেল প্রমুখ।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক অনিবার্য কারণবশতঃ চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ সম্ভব নয়। কেননা চার ইমামের মাযহাব যেমন সুবিন্যস্ত গ্রন্থবদ্ধ ও সংরক্ষিত আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তেমনটি অন্য কোন ইমামের বেলায় ঘটেনি। তদ্রূপ সবযুগে সব দেশে চার মাযহাবের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ আলিম বিদ্যমান আছেন। পক্ষান্তরে অন্য কোন মাযহাবের তেমন একজনও আলিম বর্তমান নেই। ফলে সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অনিবার্য কারণ না ঘটলে চার ইমামের মত অন্য ইমামদেরও তাকলীদ করা যেতো স্বচ্ছন্দে।

হাফেজ যাহাবীর বরাত দিয়ে আল্লামা আবদে রউফ মুনাবী লিখেছেন।

وَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نَعْتَقِدَ اَنَّ الائِمَّةَ الاَرْبَعَةَ والسفيانَيْنِ وَالاوزاعى وَدَاؤُدَ الظاهِرِىَّ وَاِسْحَاقَ ابْنَ رَاهُوَيْهِ وَسَائِرَ الأئِمَّةِ على هُدًى وَعَلى غَيْرِ المُجْتَهِدِ اَنْ يُقَلِّدَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا ... لكن لا يَجُوْزُ تَقْلِيْد الصَّحَابَة وكَذَا التَّابِعِيْنَ كَمَا قَالَه امَامُ الحَرَمَيْنِ من كل من لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُهُ فَيَمْتَنِعُ تَقْلِيْدُ غَيْرِ الاَرْبَعَةِ فِى القَضَاءِ وَالافْتَاءِ لِاَنَّ المَذَاهِبَ الاَرْبَعَةَ اِنْتَشَرَتْ وَتَحَرَّرَتْ حَتى ظَهَرَ تَقْيِيْدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيْصُ عَامِها بِخِلافِ غَيْرِهِمْ لِاِنْقِرَاضِ اَتْبَاعِهِمْ، وَقَدْ نَقَلَ الاِمَامُ الرَازِىُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ اِجْمَاعَ المُحَقِّقِيْنَ على مَنْعِ العَوَامِ مِن تَقْلِيْدِ اَعْيَانِ الصَّحَابَةِ وَاَكَابِرِهِمْ ـ

আমাদের আকীদা হবে এই যে, চার ইমাম সহ সকল ইমাম ও মুজতাহিদই 'আহলে হক' এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইজতিহাদের যোগ্যতা বঞ্চিতদের উচিত, যে কোন এক মাযহাবের তাকলীদে আত্মনিয়োগ করা। তবে ইমামুল হারামাইনের কথা মতে ছাহাবা, তাবেয়ীগণসহ এমন কোন

মুজতাহিদের তাকলীদ বৈধ নয় যাদের মাযহাব পূর্ণাংগ ও সুবিন্যস্ত আকারে আমাদের কাছে নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয় যে, বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বর্তমানে চার মাযহাবই শুধু মূলনীতিমালাসহ সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ আকারে ইসলামী জাহানের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত আজ ইসলামী জাহানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে গবেষক আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ইমাম রাজি বলেছেন, সাধারণ লোককে অবশ্যই বিশিষ্ট ছাহাবীগণের (সরাসরি) তাকলীদ থেকে বিরত থাকতে হবে।১

১: ফায়জুল কাদীর, শরহু জামেয়ীস সাগীর, খঃ১ পৃঃ ২১০

একই প্রসংগে আল্লামা নববী (রঃ) এর বক্তব্য–

وَلَيْسَ لَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُمْ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَإِنْ كَانُوْا أَعْلَمَ وَأَعْلَى دَرَجَةً
مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَرَّغُوْا لِتَدْوِيْنِ الْعِلْمِ وَضَبْطِ أُصُوْلِهِ
وَفُرُوْعِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَذْهَبٌ مُهَذَّبٌ مُحَرَّرٌ مُقَرَّرٌ، إِنَّمَا
قَامَ بِذٰلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ النَّاحِلِيْنَ لِمَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِيْنَ الْقَائِمِيْنَ بِتَمْهِيْدِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ قَبْلَ وُقُوْعِهَا
النَّاهِضِيْنَ بِإِيْضَاحِ أُصُوْلِهَا وَفُرُوْعِهَا كَمَالِكٍ رح وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ رح

ছাহাবা ও কল্যাণ যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (সরাসরি) তাকলীদ করা বৈধ নয়। কেননা ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত হলেও ফিকাহশাস্ত্রের সংকলন এবং মূলনীতি ও ধারা সুবিন্যস্তকরণের বড় একটা অবকাশ তাঁরা পাননি। এ জন্যই তাঁদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাব নেই। এ মহা দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের

ইমাম মুজতাহিদগণই আঞ্জাম দিয়েছেন। (নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে) তারা ছাহাবা তাবেয়ীগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন। এবং (কোরআন সুন্নাহর আলোকে) মূলনীতি ও ধারা–উপধারা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য) ঘটনাবলী সম্পর্কে ফতোয়া পেশ করেছেন, সেই স্বনামধন্য ইমামগণের অন্যতম হলেন ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ)

সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা বিবেচনা করে এ প্রসংগে আমরা আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) এর মতামতই শুধু তুলে ধরবো। কেননা তাকলীদ বিরোধী বন্ধুদের বিচারেও এ দুজনের ইলম ও তাকওয়া প্রশ্নাতীত।

ফাতাওয়া কোবরা গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রঃ) লিখেছেন–

وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْقٌ فِي الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ، فَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ هٰؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ فِي زَمَانِهِمْ، وَتَقْلِيْدُ كُلٍّ مِنْهُمْ كَتَقْلِيْدِ الْآخَرِ لَا يَقُوْلُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هٰذَا دُوْنَ هٰذَا، وَلٰكِنْ مَنْ مَنَعَ مِنْ تَقْلِيْدِ أَحَدِ هٰؤُلَاءِ فِي زَمَانِنَا، فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ (احدهما) اعْتِقَادُهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ وَتَقْلِيْدُ الْمَيِّتِ فِيْهِ خِلَافٌ مَشْهُوْرٌ، فَمَنْ مَنَعَهُ قَالَ هٰؤُلَاءِ مَوْتٰى، وَمَنْ سَوَّغَهُ قَالَ لَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْأَحْيَاءِ مَنْ يَعْرِفُ قَوْلَ الْمَيِّتِ (وَالثَّانِي) أَنْ يَقُوْلَ الْإِجْمَاعُ الْيَوْمَ قَدِ انْعَقَدَ عَلٰى خِلَافِ هٰذَا الْقَوْلِ... وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَوْلُ الَّذِيْ يَقُوْلُ بِهِ هٰؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ أَوْ غَيْرُهُمْ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبَاقِيَةِ مَذَاهِبُهُمْ فَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُ مُؤَيَّدٌ بِمُوَافَقَةِ هٰؤُلَاءِ وَيَعْتَضِدُ بِهِ

কোরআন সুন্নাহর বিচারে ইমাম মুজতাহিদগণের মাঝে ইমাম মালেক, লাইস বিন সা'আদ, ইমাম আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরী এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সময়ের ইমাম ছিলেন। সুতরাং তাকলীদের ক্ষেত্রে এদের মাঝে তারতম্য করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। অবশ্য দু'টি অনিবার্য কারণে বর্তমানে কতিপয় মুজতাহিদের তাকলীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ (নিষেধকারীদের মতে) তাদের মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী কোন আলিম বিদ্যমান নেই। আর মৃত ব্যক্তির তাকলীদের বৈধতা সম্পর্কে জোরালো মতবিরোধ রয়েছে। এক পক্ষের মতে কোন অবস্থাতেই তা বৈধ নয়। অন্য পক্ষের মতে, মৃত মুজতাহিদের মাযহাববিশেষজ্ঞ আলিম বর্তমান থাকার শর্তে তা বৈধ। আর চার ইমামই শুধু এ শর্তের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ (নিষেধকারীগণ বলে থাকেন যে,) বিলুপ্তির শিকার মাযহাবগুলোর প্রতিকূলে ইজমা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে এ ধরনের ইমাম ও মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত জীবন্ত মাযহাবের অধিকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হলে তা অবশ্যই সমর্থিত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে।১

১। খঃ২ পৃঃ ৪৪৬

অন্যদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ عقد الجيد এর একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন

بَابُ تَاكِيْدِ الْاَخْذِ بِهٰذِهٖ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَالتَّشْدِيْدِ فِىْ تَرْكِهَا وَالْخُرُوْجِ عَنْهَا -

(চার মাযহাবের অপরিহার্যতা এবং তা লংঘন করার কঠিন পরিণতি প্রসংগ)

আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতেই শাহ সাহেব লিখেছেন-

اِعْلَمْ اَنَّ فِى الْاَخْذِ بِهٰذِهٖ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ مَصْلَحَةً عَظِيْمَةً وَفِى الْاِعْرَاضِ عَنْهَا كُلِّهَا مَفْسَدَةٌ كَبِيْرَةٌ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذٰلِكَ بِوُجُوْهٍ

চার মাযহাবে তাকলীদ সীমিতকরণের মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তেমনি তা বর্জন ও লংঘনের মাঝে রয়েছে সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা সে কথা আলোচনা করবো।

অতঃপর শাহ সাহেব যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন আমরা তার সারাংশ পেশ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–اتبعوا السواد الاعظم। গরিষ্ঠ অংশের অনুসারী হও। বলাবাহুল্য যে, অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির কারণে এখন চার মাযহাবের অনুসরণই গরিষ্ঠ অংশের অনুসরণ এবং তা লংঘনের অর্থ হলো গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ। এ ছাড়া যে কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেয়া হলে ওলামায়ে সূ তথা ধর্মব্যবসায়ী আলিমরা নিজেদের ফতোয়াকেও কোন না কোন মুজতাহিদের নামে চালিয়ে দেয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের বেলায় সে আশংকা নেই। কেননা এখানে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের স্বতন্ত্র জামাত গবেষণা ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন সিদ্ধান্তেরই ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।

তাকলীদের স্তর তারতম্য

উপরের আলোচনায় আশা করি আমরা চার মাযহাবে তাকলীদ সীমিতকরণের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এবার আমরা শ্রেণী–তারতম্যের ভিত্তিতে তাকলীদের শ্রেণী–তারতম্য প্রসংগে আলোচনায় অগ্রসর হবো। এ আলোচনা এ জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকলীদের শ্রেণী–তারতম্যের সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থতাই তাকলীদবিরোধী বন্ধুদের অধিকাংশ অভিযোগ–সমালোচনার উৎস।

সর্বসাধারণের তাকলীদঃ

তাকলীদের প্রথম স্তর হলো সাধারণ মানুষের তাকলীদ। এই সাধারণ শ্রেণীটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

এক–আরবী ভাষাজ্ঞান বঞ্চিত এবং কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ। (এরা হয় নিরক্ষর অশিক্ষিত কিংবা অন্যান্য বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষিত)

দুই–আরবী ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হলেও নিয়মতান্ত্রিক ও প্রথামাফিক উপায়ে এরা হাদীস তাফসীর ও ফিকাহ সহ শরীয়তসংশ্লিষ্ট যাবতীয় ইলম অর্জন করেনি।

তিন–হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনদধারী, তবে উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফেকাহ তথা মূলনীতিশাস্ত্রে এদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নেই।

তাকলীদের ক্ষেত্রে এরা সকলেই অভিন্ন সাধারণ শ্রেণী ভুক্ত। এদের জন্য নির্ভেজাল তাকলীদের কোন বিকল্প নেই। মুজতাহিদের পদাংক অনুসরণই হলো এদের জন্য শরীয়তের পথ ধরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র উপায়। কেননা কোরআন সুন্নাহর মূল উৎস থেকে সরাসরি আহকাম ও বিধান আহরণের জন্য কখনো প্রয়োজন হবে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে দ্ব্যর্থতা দূরীকরণের, কখনো প্রয়োজন হবে দৃশ্যত বিরোধপূর্ণ আয়াত বা হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের। কখনো বা প্রয়োজন হবে দুইয়ের মাঝে অগ্রাধিকার নির্ধারণের। আর সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে এ শুধু অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়ও বটে। আল্লামা খতীব বোগদাদী তাই লিখেছেন–

اما مَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِّىُّ الَّذِى لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الاحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَجُوزُ لَهُ اَنْ يقلدَ عَالِمًا وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ ..... وَلِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الاجْتِهَادِ فَكَانَ فَرْضُهُ التقليدَ كَتَقْلِيدِ الاَعْمَى فِى القِبْلَةِ فَانَّهُ لَمَّا لَمْ يكُنْ مَعَهُ اٰلَةُ الاجْتِهَادِ فِى القِبْلَةِ كَانَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ البَصِيرِ فِيهَا۔

শরীয়তী আহকাম ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এমন সাধারণ ব্যক্তির জন্যই তাকলীদ অপরিহার্য। (অতঃপর কোরআন সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ পেশ করে তিনি বলেন) ইজতিহাদী যোগ্যতার অভাবের কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে এরা মুজতাহিদের তাকলীদ করে যাবে। ঠিক যেমন, ক্বিবলা

নির্ধারণের যোগ্যতার অভাবে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির তাকলীদ করে থাকে। মূলতঃ এদের জন্য এটাই শরীয়তের নির্দেশ।১

বলাবাহুল্য যে, কোরআন সুন্নাহর জটিল তত্ত্বালোচনায় লিপ্ত হওয়া কিংবা দুই মুজতাহিদের মতামতের ধার ও ভার পরীক্ষা করে দেখা এই শ্রেণীর সাধারণ মুকাল্লিদের কর্ম নয়। এদের কর্তব্য শুধু মুজতাহিদ নির্বাচনপূর্বক পূর্ণ আস্থার সাথে সব বিষয়ে তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করে যাওয়া। এমনকি তার স্থূল দৃষ্টিতে মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত হাদীস বিশেষের পরিপন্থী মনে হলেও চোখ বুজে তাকে তা মেনে নিতে হবে। কেননা আয়াত ও হাদীসের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের পর্যাপ্ত যোগ্যতা তার নেই। অবশ্য হাদীসটি সম্পর্কে তার আক্বিদা হবে এই যে, সম্ভবতঃ এর যথার্থ মর্ম আমি অনুধাবন করতে পারিনি কিংবা মুজতাহিদের দৃষ্টি পথে তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোরআন সুন্নাহর অন্য কোন মজবুত দলিল রয়েছে এবং সে আলোকে আলোচ্য হাদীসের গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা তাঁর কাছে নিশ্চয় রয়েছে।

মুজতাহিদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে হাদীসের ব্যাখ্যা খোঁজার এ পরামর্শ অনেকের কাছে 'অদ্ভূত' মনে হলেও বাস্তব সত্য এই যে, সাধারণ শ্রেণীর মুকাল্লিদের এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। কেননা ইজতিহাদের মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও মাসায়েল আহরণের ক্ষেত্রটি এমন জটিল ও ঝুকিবহুল যে, সারা জীবনের নিরবচ্ছিন্ন ও একাগ্র সাধনার পরও সবার পক্ষে তাতে পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, (দৃশ্যতঃ) একটি হাদীস যে বিষয়বস্তু প্রমাণ করছে ঠিক তার বিপরীত কোন বিষয়বস্তু প্রমাণ করছে অন্য একটি আয়াত বা হাদীস। এমতাবস্থায় সাধারণ মুকাল্লিদকে হাদীস দেখা মাত্র আমল শুরু করার অনুমতি প্রদানের ফল বরবাদী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ সম্পর্কে আমার বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

এক গ্রাজুয়েট বন্ধুর কথাই বলি। তাকলীদ অস্বীকারকারী অতি উৎসাহী দলে তিনি ছিলেন পয়লা কাতারের একজন। বিশেষতঃ হাদীসশাস্ত্রের উপর

১। আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ, পৃঃ ৬৮

ছিলো তাঁর 'বাড়তি' ঝোঁক। ভাবসাব, যেন হাদীস কোরআনের উর্বর জমি সবটা ইতিমধ্যেই তিনি চষে ফেলেছেন। বেশ গর্বের সাথে তাই বলে বেড়াতেন; আবু হানিফার কোন সিদ্ধান্ত হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে হাদীসকেই আমি নির্দ্বিধায় অগ্রাধিকার দিবো। এক মজলিসে আমার উপস্থিতিতেই বন্ধুপ্রবর ফতোয়া দিয়ে বসলেন বাতকর্মে দুর্গন্ধ কিংবা শব্দ অনুভূত না হলে অজু নষ্ট হবে না। আমার অবশ্য বুঝতে বকি ছিলো না; বেচারার এ বিভ্রান্তির উৎস কোথায়। কিন্তু মুশকিল হলো, কোন কথাই তিনি কানে তুলতে রাজি নন। তার এক কথা; তিরমিযি শরীফে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। সুতরাং কোন ইমামের ফতোয়ার কারণে হাদীস তরক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক সুযোগে আমি কথিত হাদীসের মর্ম এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর ফতোয়ার তাৎপর্য তার সামনে তুলে ধরলাম তখন তার বোধোদয় হলো এবং অনুতপ্ত স্বরে তিনি বললেন—আল্লাহ মাফ করুন, আমার এত দিনের নামাজের কি হবে! এ লজ্জাজনক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কতবারই তো বিনা অজুতে আমি নামাজ পড়েছি। আসলে তিরমিযি শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি ছিলো তার বিভ্রান্তির কারণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ

(বাতকর্মে) দুর্গন্ধ কিংবা শব্দ অনুভূত হলেই কেবল অজু ওয়াজিব হয়।

সেই সাথে তিরমিযি শরীফের এ হাদীসটিও সম্ভবতঃ তার মনে পড়েছে।

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيْحًا بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ

মসজিদে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি দুই নিতম্বের ফাঁকে বায়ু অনুভব করে তাহলে শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন মসজিদ থেকে না বেরোয়।১

১। খঃ১ পৃঃ ৩১ বাবু মা জাআফিল ওয়াজু মিনাররিবহি

দৃশ্যতঃ হাদীস দু'টির অর্থ তাই যা বন্ধুপ্রবর বুঝেছিলেন। অথচ ফকীহ ও মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ ছিলো সন্দেহগ্রস্ত লোকদের প্রতি, যাদের মনে অযথাই অজু ভংগের খুঁতখুঁতি দেখা দেয়। অর্থাৎ, সন্দেহগ্রস্ত লোকেরা যেন শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ ইত্যাদি আলামতের মাধ্যমে নিশ্চিত না হয়ে শুধু মনের খুঁতখুঁতির কারণে মসজিদ থেকে বেরিয়ে না আসে। আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা–সূত্রে আরো সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْلَمْ يُحْدِثْ فَاشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْيَجِدَ رِيْحًا

সালাতরত অবস্থায় তোমাদের কারো যদি গুহ্যদ্বারে কম্পন অনুভূত হওয়ার কারণে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহ হয় তাহলে শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন সালাত ভংগ না করে।১ খোদ আবু দাউদ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের মন্তব্য আছে যে, এ কথা নবীজী সন্দেহগ্রস্ত জনৈক ছাহাবীকে বলেছিলেন।

১। খঃ১ পৃঃ ৪৬

এবার আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, হাদীসের বিভিন্ন সূত্রের সমন্বয় সাধন এবং শব্দের সঠিক অর্থ নির্ধারণের মাধ্যমে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত হতে হলে ইলমে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কতখানি ব্যাপ্তি প্রয়োজন। হাদীসের দু'একটি কিতাবে নজর বুলিয়ে কিংবা নিছক অনুবাদ গ্রন্থের উপর ভরসা করে মুজতাহিদ হতে গেলে পদে পদে এ ধরনের দুঃখজনক বিচ্যুতির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। দেখুন! তিরমিযি শরীফে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قَالَ فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رض مَا أَرَادَ بِذٰلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا تَحْرَجَ أُمَّتُهُ۔

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সন্ত্রাস বা অতিবর্ষণ জনিত পরিস্থিতি ছাড়াই যোহর আসর এবং মাগরিব এশা একত্রে আদায় করেছেন। ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো; কি উদ্দেশ্যে তিনি এমন করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, উম্মতকে তিনি সংকটে ফেলতে চাননি।১

১। খঃ১ পৃঃ ৪৬

এ হাদীসের উপর ভর করে (বিনা ওজরে) যোহর–আসর এবং মাগরিব–এশার সময় একত্রে আদায় করার বৈধতা বেশ স্বাচ্ছন্দের সাথে দাবী করা যেতে পারে। অথচ আহলে হাদীস সহ চার ইমামের সকলেই বিনা ওজরে এ ধরনের একত্রীকরণের বৈধতা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, নবীজী আসলে দুই ওয়াক্তের সংযোগ স্থলে দুই নামাজ আদায় করেছিলেন; সুতরাং এটা الجمع الصورى। বা 'কৃত্রিম' ও 'দৃশ্যতঃ' একত্রীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে নমুনাস্বরূপ শুধু দু'টি হাদীস পেশ করা হলো; ইজতিহাদের পিচ্ছিল পথে কিন্তু এ ধরনের অসংখ্য হাদীসের মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে। আর কোরআন সুন্নাহর সুগভীর ইলম ও ইজতিহাদী প্রজ্ঞা ছাড়া সেগুলোর নির্ভুল সমাধান দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই সাধারণ শ্রেণীকে সরাসরি কোরআন সুন্নাহর অধ্যয়নের পিচ্ছিল ও ঝুকিবহুল পথে পা না বাড়িয়ে তাকলীদের নিরাপদ ও সমতল পথে চলার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ও ফকীহগণ।

আগেই আমরা বলে এসেছি যে, পরস্পর বিরোধী দলিলসমৃদ্ধ আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদের অপরিহার্যতা। কেননা সে ক্ষেত্রে দুই ইমামের মতপার্থক্যের অর্থ এই যে, উভয়ের সমর্থনেই কোরআন সুন্নাহর দলিল রয়েছে। সুতরাং তুলনামূলক পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার প্রদানের যোগ্যতা যাদের নেই

তাদের একমাত্র কর্তব্য হলো দুই ইমামের যে কোন একজনের নিরাপদ ছত্রচ্ছায়া গ্রহণের মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করে যাওয়া। মনে করুন, হানাফী মাযহাব গ্রহণের পর ইমাম আবু হানিফার প্রতিকূল এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর অনুকূল একটি হাদীস আপনি পেলেন। কিন্তু শুধু এ অজুহাতে মাযহাব বর্জনের অধিকার আপনাকে দেয়া হবে না। কেননা এটা তো আগে থেকেই জানা ছিলো যে, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর অনুকূলেও কোন না কোন দলিল অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং "ইমাম আবু হানিফার (রঃ) সিদ্ধান্ত হাদীস পরিপন্থী"– চট করে এ ধরনের ফায়সালা না করে আপনাকে বরং ধরে নিতে হবে যে, আরো মজবুত কোন দলিলের ভিত্তিতেই আমার ইমাম এ হাদীস পাশ কেটে গেছেন। কিংবা তাঁর কাছে এর গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা রয়েছে।

আবারো শুনুন, যে শ্রেণীর মুকাল্লিদের কথা আমরা আলোচনা করছি তাদের যেহেতু ভিন্নমুখী দুই দলিলের তুলনামূলক শক্তি ও মান নির্ণয়ের যোগ্যতা নেই সেহেতু তাদের একমাত্র কর্তব্য হলো স্বীয় ইমামের তাকলীদের উপর অবিচল থেকে এ কথা মনে করা যে, হাদীসের যথার্থ মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্র নিশ্চয় আমি নির্ধারণ করতে পারিনি।

বলুন তো; আইনের কোন জটিল ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে আপনি কি সরাসরি আইনের মোটা মোটা কেতাব খুলে বসে যাবেন? না যোগ্য ও বিজ্ঞ আইনবিদের শরণাপন্ন হয়ে তার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ অনুসরণ করে যাবেন। হাঁ! খুব সংগত কারণেই দ্বিতীয় পথটা আপনি বেছে নিবেন। এমনকি আইন গ্রন্থের কোন ধারা উপধারার সাথে আইনবিদ প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কোন গরমিল আপনার চোখে ধরা পড়লেও আপনার বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা এ বিষয়ে নাক গলাতে অবশ্যই বারণ করবে এবং আইনবিদ প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চোখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য করবে। কেননা উক্ত আইনবিদের পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সততার উপর পূর্ণ আস্থা আছে বলেই না আপনি তার শরণাপন্ন হয়েছেন। আর আইনের কেতাব দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া তো সবার কর্ম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি যদি আইনবিদকে উপেক্ষা করে নিজের বিদ্যা জাহির করতে যান তাহলে বিশ্বাস করুন, একজন ভালো চক্ষু বিশেষজ্ঞ হলেও আদালতে আপনাকে এর চরম মাশুল দিতে হবে।

প্রশ্ন হলো; মানবীয় আইনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভংগি হলে কোরআন সুন্নাহর অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণের বেলায় আপনার দৃষ্টিভংগি কি হবে? নিজেই ডুব দিয়ে মরতে যাবেন না দক্ষ ডুবুরীর সাহায্য চাইবেন?

মোটকথা; সাধারণ শ্রেণীর মুকাল্লিদকে নিজস্ব বুদ্ধিতে কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য আলিম ও মুফতীর শরণাপন্ন হতে হবে। উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ও ফকীহগণের মতে এটাই হবে তার জন্য কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করার নিরাপদ ও নির্ভুল পথ। তারা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, মুফতী সাহেব ভুল ফতোয়া দিলে সে দায়দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন। ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী মুকাল্লিদ নয়। পক্ষান্তরে মুকাল্লিদ সরাসরি কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করতে গিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হলে তাকেই গোনাহগার হতে হবে। কেননা নিজে নাক না গলিয়ে আলিম ও মুফতীর শরণাপন্ন হওয়াই ছিলো তার কর্তব্য।

যেমন, কাউকে দিয়ে রক্তমোক্ষণ করালে শরীয়তের দৃষ্টিতে রোজা নষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় কোন মুফতী সাহেব ভুল সিদ্ধান্তবশতঃ রোজা ভংগ হওয়ার ফতোয়া দিলেন আর রোজাদারও বাকি সময়টুকু অভুক্ত থাকা অনর্থক মনে করে আহার গ্রহণ করলো। তাহলে রোজাদারের উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ বর্ণনা প্রসংগে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন।

لِاَنَّ الفَتوٰى دَلِيلٌ شَرعِىٌّ فِى حَقِّه

কেননা সাধারণ শ্রেণীর জন্য ফতোয়াই হলো চূড়ান্ত শরীয়তী দলিল।

পক্ষান্তরে রোযাদার যদি আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস–

اَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوْمُ ۔

রক্তমোক্ষণকারী ও কৃত ব্যক্তির রোযা ভেংগে গেছে৷ দেখে নিজস্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই যথারীতি আহার গ্রহণ শুরু করে তাহলে ইমাম আবু ইয়ূসু[illegible]) এর মতে তার উপর কাফ্ফারাসহ কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবহেতু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং আলিম ও মুফতীর

ইকতিদা করাই ছিলো তার কর্তব্য অথচ সে তা করেনি।২

১। সনদ বা সূত্রগত দিক থেকে হাদীসটি বিশুদ্ধ হলেও বুখারী শরীফের এক হাদীস মতে আল্লাহর রাসূল নিজেই রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। হাদীসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে আলিমগণ বলেছেন যে, রাসূলের আমল দ্বারা প্রথম হাদীসের নির্দেশ মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে।

২। হেদায়া, খঃ১ পৃঃ২২৬ বাবু মা ইয়ুজিবুল কাযা ওয়াল কাফ্ফারাহ

এ পর্যন্ত আলোচনার ফলাফল হলো।

১। তাকলীদের প্রথম স্তর সাধারণ শ্রেণীর মুকাল্লিদের জন্য, যারা নিরক্ষর, অশিক্ষিত কিংবা অন্য বিষয়ে সনদধারী ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহর 'প্রয়োজনীয়' ইলম থেকে বঞ্চিত।

২। এই শ্রেণীর মুকাল্লিদকে অবিচলভাবে মুজতাহিদের তাকলীদ করে যেতে হবে। এমনকি মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত দৃশ্যতঃ আয়াত বা হাদীসের পরিপন্থী মনে হলেও।

৩। এ ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, কথিত আয়াত বা হাদীসের সঠিক মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্র আমি বুঝতে পারিনি। মুজতাহিদের কাছে এর যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোরআন সুন্নাহর কোন দলিল নিশ্চয় রয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করার এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই এবং এ পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতির অর্থই হলো ধ্বংসের চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া।

তাকলীদের দ্বিতীয় স্তর

তাকলীদের দ্বিতীয় স্তর হলো মুতাবাহ্হীর ও 'প্রজ্ঞাবান' আলিমের তাকলীদ; যিনি ইজতিহাদের মর্যাদায় উন্নীত না হলেও বিশেষজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে কোরআন–সুন্নাহসংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রীয় জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করেছেন এবং পঠন–পাঠন, লিখন ও গবেষণা কর্মে দীর্ঘকাল নিয়োজিত

থেকে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন। সেই সাথে মহান পূর্বসূরীগণের ইজতিহাদ পদ্ধতি ও রচনা শৈলীর সাথে অন্তরংগ পরিচয়ের কারণে তাদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) এর ভাষায় এই শ্রেণীর লোকেরা হলেন মুতাবাহ্হির ফিল মাযহাব বা মাযহাব বিশেষজ্ঞ আলিম।

فَصْلٌ فِي الْمُتَبَحِّرِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْحَافِظُ لِكُتُبِ مَذْهَبِهِ ..... مِنْ شَرْطِهِ اَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحَ الْفَهْمِ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَاَسَالِيْبِ الْكَلَامِ وَمَرَاتِبِ التَّرْجِيْحِ مُتَفَطِّنًا لِمَعَانِىْ كَلَامِهِمْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ غَالِبًا تَقْيِيْدُ مَا يَكُوْنُ مُطْلَقًا فِى الظَّاهِرِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُقَيَّدُ وَاِطْلَاقُ مَا يَكُوْنُ مُقَيَّدًا فِى الظَّاهِرِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُطْلَقُ

মুতাবাহ্হির ফিল মাযহাব বা মাযহাব বিশেষজ্ঞ তাকেই বলা হবে) যিনি মাযহাবী (প্রামাণ্য) গ্রন্থ সমূহের "উপস্থিত" জ্ঞানের অধিকারী। তাকে অবশ্যই আরবী ভাষাজ্ঞান সমপন্ন, বাকশিল্পী ও স্বচ্ছবোধের অধিকারী হতে হবে। সেইসাথে (ইমামের বিভিন্ন কওলের মাঝে সমন্বয় ও) অগ্রাধিকার সম্পর্কেও সম্যক অবগত হতে হবে। অনেক সময় ফকীহগণের বিভিন্ন বক্তব্য দৃশ্যতঃ মুতলাক বা 'শর্তমুক্ত' হলেও কার্যতঃ তা শর্ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আবার কখনো তা দৃশ্যতঃ শর্তনিয়ন্ত্রিত হলেও কার্যতঃ মুতলাক বা শর্তমুক্ত হয়ে থাকে। এ ব্যাপারেও তাকে পূর্ণ সচেতন হতে হবে। ১

এই শ্রেনীর ব্যক্তিবর্গ মুজতাহিদ পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণে মুকাল্লিদরূপেই পরিচিত হবেন। তবে সাধারণ মুকাল্লিদের তুলনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন–

১। আহকাম ও মাসায়েলের পাশাপাশি দলিল ও উৎস সম্পর্কেও তাঁদের মৌলিক জ্ঞান থাকবে।

২। স্ব–স্ব মাযহাবের মুফ্তীর মর্যাদা তাঁরা লাভ করবেন এবং কোন বিষয়ে

Contents

ইমামের একাধিক ক্বওল ও সিদ্ধান্ত থাকলে যুগের দাবী ও সময়ের চাহিদা মুতাবেক যে কোন একটি বেছে নিয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন। সর্বোপরি মাযহাব নির্ধারিত উসূল ও মূল নীতিমালার নিয়ন্ত্রণে থেকে নতুন ও উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করার অধিকারও তাঁদের থাকবে। ২

৩। 'শর্তসাপেক্ষে' স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে স্ব-মাযহাবের অন্য ইমামের সিদ্ধান্ত মুতাবেক ফতোয়া দেয়ার অধিকারও তাঁরা সংরক্ষণ করেন। ফতোয়া বিষয়ক নির্দেশিকা গ্রন্থ সমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।৩

ইমামের কোন ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হাদীসের সরাসরি পরিপন্থী মনে হলে সেই সংকটমুহূর্তে 'মুতাবাহ্হির আলিমের' করণীয় সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন।

إِذَا وَجَدَ الْمُتَبَحِّرُ فِي الْمَذْهَبِ حَدِيثًا صَحِيحًا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَدِيثِ وَيَتْرُكَ مَذْهَبَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ؟ فِي هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ بَحْثٌ طَوِيلٌ وَأَطَالَ فِيهَا صَاحِبُ خَزَانَةِ الرِّوَايَاتِ نَقْلًا عَنْ دَسْتُورِ الْمَسَاكِينِ ، فَلْنُورِدْ كَلَامَهُ مِنْ ذٰلِكَ بِعَيْنِهِ

১। ইকদুল জায়িদ ঃ পৃষ্ঠা- ৫১

২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন; শরহে উকুদে রসমুল মুফ্তী ইবনে আবেদীন কৃত এবং উসূলে ফতোয়ার অন্যান্য গ্রন্থ।

৩। উসূলে ফতোয়া বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থসহ দেখুন; রদ্দুল মুহতার খণ্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ১৯০

"মুতাবাহ্হির" আলিম আপন মাযহাবের প্রতিকূল কোন হাদীসের সন্ধান পেলে তিনি কি সে বিষয়ে মাযহাব বর্জন করে হাদীসের উপর আমল করতে পারেন? এ ব্যাপারে বেশ কথা আছে। خزانة الروايات গ্রন্থকার دستور المساكين গ্রন্থের বরাত দিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে তা হুবহু তুলে ধরা হচ্ছে।

অতঃপর আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে শাহ সাহেব যা লিখেছেন তার সার সংক্ষেপ এই –

"উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামার মতে এ ক্ষেত্রেও তাঁকে ইমামের অনুগত থাকতে হবে। কেননা এমনও হতে পারে যে, ইমামের অবগতিতে মযবুত কোন দলিল ছিলো যা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। মুতাবাহ্হির বা বিশেষজ্ঞ হলেও ইজতিহাদের যোগ্যতায় তো তিনি উত্তীর্ণ নন। তবে অধিকাংশ উলামার অভিমত এই যে, দলিল প্রমাণের সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দিক পর্যালোচনা করার পর একজন মুতাবাহ্হির ফিল মাযহাব বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জন করতে পারেন। তবে নিম্ন বর্ণিত শর্তগুলো অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। মুতাবাহ্হির আলিমের নির্ধারিত মাপকাঠিতে অবশ্যই তাকে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে হবে।

২। আলোচ্য হাদীস সকল মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হতে হবে। কেননা এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুজতাহিদগণের মাঝে মতানৈক্য থাকলে এটা সুনিশ্চত যে, বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে অনুত্তীর্ণ ধরে নিয়েই ইমাম ও মুজতাহিদ হাদীসটি পাশ কেটে গেছেন। এমতাবস্থায় মুজতাহিদের পক্ষে মাযহাব বর্জন করা বৈধ হতে পারে না।

৩। উক্ত হাদীসের প্রতিকূলে কোন আয়াত বা হাদীস নেই, এ সম্পর্কেও তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে।

৪। হাদীসটি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট হতে হবে। কেননা দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ। আর অমুজতাহিদের কর্তব্য হলো মুজতাহিদ নির্ধারিত অর্থ অনুসরণ। অন্যান্য অর্থ ও সম্ভাবনাকে প্রধান্য দেওয়ার কোন অধিকার অমুজতাহিদের নেই।

৫। সর্বশেষ শর্ত হলো, আলোচ্য হাদীসকে ভিত্তি করে 'মুতাবাহ্হির' যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাতে চার ইমামের যে কোন একজনের সমর্থন থাকতে হবে। কেননা চার মাযহাবের গণ্ডীলংঘন মূলতঃ মহাসর্বনাশের পূর্বসংকেত মাত্র।১

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত সাপেক্ষে মুতাবাহ্হির ও বিশেষজ্ঞ আলিম স্বীয় ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জনের অনুমতি পাবেন। এখানে আমরা উম্মাহর কতিপয় বিশিষ্ট উলামার মতামত তুলে ধরছি।

১। আল ইকতিসাদ ফিল ইজতিহাদ, ইকদুল জাইয়িদ

শায়খুল ইসলাম আল্লামা নববী (রহঃ) লিখেছেন।

قَالَ الشَّيخُ اَبُو عمرو فَمَنْ وَجَدَ مِنَ الشَافِعيَةِ حَدِيثا يخالفُ مَذهَبَه نَظَرَ اِن كَمُلَتْ اَلاتُ الاِجْتِهَادِ فِيهِ مُطْلَقًا، اَوْفِى ذٰلِكَ البَابِ اَوِ المَسْئَلَةِ كَانَ لَهُ الاستِقلَالُ بِالعَمَلِ به، وَاِنْ لم يكمُل وَشَقَّ عَلَيهِ مُخَالفَةَ الحَدِيث بَعدَ اَنْ بَحَثَ فَلَمْ يجدْ لِمخَالفَتِه عَنْهُ جَوَابًا شَافِيًا فَلَهُ العَمَلُ بِه اِن كَان عَمَلُ بِهِ اِمَامٌ مُستَقِلٌ غيرُ الشَافِعِيِّ وَيكُونَ هٰذا عُذرًا لَهُ فِى تَركِ مذهَبِ اِمَامه هُنا، وَهٰذا الَّذِى قَالَهُ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ

শায়খ আবু আমর ইবনে আলাহ বলেন, শাফেয়ী মাযহাবের কোন মুকাল্লিদ মাযহাবের প্রতিকূল হাদীসের সন্ধান পেলে দেখতে হবে; সামগ্রিক ইজতিহাদের কিংবা সেই বিশেষ মাসআলার ক্ষেত্রে আংশিক ইজতিহাদের যোগ্যতা তার রয়েছে কিনা। থাকলে তিনি স্বতন্ত্রভাবে সে হাদীসের উপর আমল করতে পারেন। যদি তেমন যোগ্যতা না থাকে এবং যথেষ্ট চেষ্টা অনুসন্ধান সত্ত্বেও সন্তোষজনক কোন সমাধান খুঁজে না পান। অথচ হাদীসটি পাশ কেটে যেতেও তাঁর বিবেকে বাঁধে, তাহলে দেখতে হবে অন্য কোন মুজতাহিদ এর উপর আমল করেছেন কি না। ইতিবাচক অবস্থায় তিনিও তা করতে পারেন। মাযহাব তরক করার কারণ হিসাবে এটা গ্রহণযোগ্য। (আল্লামা নববীর মতে) শায়খ আবু আমরের এ অভিমত বেশ যুক্তিনির্ভর ও আমলযোগ্য। ১

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ)ও উপরোক্ত মত সমর্থন করে লিখেছেন–

وَالمختار هٰهنا هُوَ قول ثالث وَهُوَ ما اختاره ابن الصلاح وَ تبعه النووى وَصحّحه الخ

এ প্রসংগে আবু আমর ইবনে সালাহ অনুসৃত এবং ইমাম নববী সমর্থিত পন্থাই অধিক উত্তম। ২

১। আল ইখতিলাফ ফিল ইজতিহাদ, ইকদুল জায়িদ।
২। ইকদুল জাইয়িদ পৃষ্ঠা ৫৭

এখানে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নটি এসে পড়ে তা হলো, ইজতিহাদের 'বিভাজন ' সম্ভব কিনা? অর্থাৎ সামগ্রিক ইজতিহাদের যোগ্যতায় উত্তীর্ণ না হয়েও বিশেষ কোন মাসআলায় আংশিক ইজতিহাদের অধিকার আছে কি না? ফিকাহশাস্ত্রের কয়েকজন উসূল ও মূলনীতি বিশারদ নেতিবাচক উত্তর দিলেও অধিকাংশের দ্ব্যর্থহীন অভিমত এই যে, বহু শাখাবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ইসলামী ফিকাহর যে কোন একটি শাখায় বিশেষ প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে আংশিক ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ইজতিহাদের বিভাজনও একটি স্বভাবসিদ্ধ ও স্বীকৃত সত্য।

আল্লামা তাজুদ্দীন সাবকী ও আল্লামা মহল্লী (রহঃ) লিখেছেন-

(وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تجزى الاجتهادِ) بِاَنْ تَحْصُل لِبَعْضِ النَّاسِ قُوَّةُ الاجتهادِ فى بَعْضِ الابوابِ كالفرائِضِ بِاَنْ يَّعلَمَ اَدِلَّتَه بِاِسْتِقْرَاءٍ مِنْهُ اَوْ مِنْ مُجْتَهِدٍ كامِلٍ وَيَنْظُرُ فِيْهَا

বিশুদ্ধ মত এই যে, ইজতিহাদের বিভাজন সম্ভব। যেমন ধরুণ; স্ব-উদ্যেগে কিংবা পূর্ণাংগ মুজতাহিদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কেউ ইলমুল ফারায়েজ বা অন্য কোন শাখার (কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক) দলিল প্রমাণগুলোর যথার্থ জ্ঞান অর্জন করলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি উক্ত ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচারশক্তি (তথা ইজতিহাদ) প্রয়োগের অধিকার লাভ করবেন।

اصول فخرالاسلام بزدوى এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা 'আব্দুল আজীজ বুখারী লিখেছেন–

وَلَيْسَ الاجْتِهَادُ عِندَ العَامَّةِ مَنْصِبًا لَايَتَجَزَّأُ، بَلْ يَجُوْزُ اَنْ يَفُوْزَ العَالِمُ بِمَنْصِبِ الاِجْتِهَادِ فِيْ بَعْضِ الاَحْكَامِ دُوْنَ بَعْضٍ ـ

অধিকাংশ উলামার মতে ইজতিহাদ অবিভাজ্য নয়। বরং একজন আলিম ফিকাহর কোন এক শাখায় ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করে অন্যান্য শাখায় তা অর্জনে ব্যর্থও হতে পারেন।১

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।২

আল্লামা তাফ্তাযানী লিখেছেন–

ثُمَّ هٰذِهٖ الشَّرائِطُ اِنَّمَا هِىَ فِىْ حَقِّ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِىْ يُفْتِىْ فِىْ جَمِيْعِ الاَحْكَامِ. وَاما الْمُجْتَهِدُ فِىْ حُكْمٍ دُوْنَ حُكْمٍ فعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذٰلِكَ الْحُكْمِ

১। কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১১৩৭ বাবু মারেফাতে আহওয়ালিল মুজতাহিদীন।
২। আল মুসতাস্ফা খণ্ড ২

উপরোল্লেখিত শর্তগুলো পূর্ণাংগ মুজতাহিদের বেলায় কেবল প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে খণ্ডিত ইজতিহাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট।১

হযরত আল্লামা আমীর আলী (রহঃ) লিখেছেন।

قَوْلُهٗ وَاما الْمُجْتَهِدُ فِىْ حكم الخ فَلَابُدَّ لَهٗ من الاطِّلَاعِ عَلىٰ اُصُوْلِ مُقَلَّدِهٖ لِاَنَّ اسْتِنْبَاطَهٗ عَلىٰ حَسَبِها ، فَالحكم الجَدِيْدُ اجْتِهادٌ فِىْ الحُكْمِ والدَّلِيْلُ الجَدِيْدُ للحكم المَرْوِىِّ تَخْرِيْجٌ ـ

(আংশিক ইজতিহাদের জন্য) স্বীয় ইমামের অনুসৃত মুলনীতিমালা সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিতি জরুরী। কেননা উক্ত মূলনীতিমালার আলোকেই তাকে ইসস্তিম্বাত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (উসূলে ফিকাহর পরিভাষায় যিনি পূর্ণাংগ মুজতাহিদ তাঁর অনুসৃত মূলনীতিমালার আলোকে) নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম হলো ইজতিহাদ ফিল হুকুম। পক্ষান্তরে মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে নতুন দলিল পরিবেশনের নাম তাখরীজ।২

আল্লামা ইবনে হোমামও অভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, আংশিক মুজতাহিদ এমন ক্ষেত্রগুলোতেই শুধু পূর্ণাংগ মুজতাহিদের তাকলীদ করতে বাধ্য, যে ক্ষেত্রগুলোতে তার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই।৩

ইবনে নাজীমও অভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন।৪

১। তালবীহ খঃ ২ পৃঃ ১১৮ ।
২। তাওশীহ 'আলা তালবীহ, বাবুল ইজতিহাদ। পৃঃ ২০৪
৩। তাওসীরুত্তাহরীর লি আমীর বাদশাহ্ আল বুখারী খঃ ৪ পৃঃ ২৪৬
৪। ফতহুল গেফার বিশারহেল মানার খঃ ৩ পৃঃ ৩৭

তবে আল্লামা ইবনে আমির আলহাজ (রহঃ) আল্লামা যামলেকানী (রহঃ) এর বরাত দিয়ে সংশোধনীসহ স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। তাঁর মতে এ প্রসংগে শেষ কথা এই যে, ইজতিহাদের মৌলিক শর্তগুলো নিঃসন্দেহে অবিভাজ্য। যথা ইসতিম্বাত তথা সিদ্ধান্ত আহরণের যোগ্যতা, বাগধারা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দলিল গ্রহণ ও বর্জনের মূলনীতি সম্পর্কে অবগতি ইত্যাদি। আংশিক মুজতাহিদের বেলায়ও এ গুলি জরুরী। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মাসআলার দলিল সমূহের মাঝে তুলনামুলক বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা খণ্ডিত ও বিভাজ্য হতে পারে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা থাকবে আবার কোন ক্ষেত্রে হয়ত থাকবে না।১

১।আত্তাকরীর ইবনে আসীর আলহাজ কৃত খঃ ৩ পৃঃ ২৯৪

মোটকথা, উসূল তথা মূলনীতি বিশারদ আলিমগণের দ্ব্যর্থহীন অভিমত এই যে, একজন মুতাবাহ্হির ও বিশেষজ্ঞ আলিম অন্তত কোন এক বিষয়ে ইজতিহাদি যোগ্যতা অর্জনের পর (সামগ্রিক ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও) একথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, আমার ইমাম সাহেবের অমুক সিদ্ধান্ত অমুক বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জন করে হাদীস মুতাবেক আমল করাই তার কর্তব্য।

'স্বভাব ফকীহ' হযরত আল্লামা রশীদ আহ্মাদ গংগোহী (রহঃ) লিখেছেন–

এ ব্যাপারে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই যে, ইমামের সিদ্ধান্ত কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী প্রমাণিত হলে তা অবশ্য বর্জনীয়। তবে প্রশ্ন হলো, সাধারণ লোকের পক্ষে এ ধরনের সুক্ষ্ম বিচার ও অনুসন্ধান পরিচালনা কি করে সম্ভব?

এ বিষয়ে সর্বোত্তম পর্যালোচনা পেশ করেছেন উপমহাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সর্ববিদ্যা বিশারদ আলিম হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এবং আস্থা ও নির্ভরতার সাথে বলা চলে যে, এটাই এ প্রসংগের 'শেষ কথা'। তাই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদানের ঝুকি নিয়েও আমরা এখানে তাঁর সে সারগর্ভ বক্তব্য আগাগোড়া তুলে ধরছি। তিনি বলেন–

ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব, স্বচ্ছ বোধ দূরদৃষ্টির অধিকারী কোন আলিম কিংবা কোন সাধারণ লোক (মোত্তাকী পরহেজগার আলিমের মারফতে) যদি বুঝতে পারেন যে, আলোচ্য মাসআলায় (গৃহীত দৃষ্টান্তের তুলনায়) বিপরীত দিকটাই অধিক যুক্তিপুষ্ট। কিন্তু তাতে অনৈক্য ও গোলযোগের আশংকা আছে। তাহলে দেখতে হবে; শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তটির উপর আমল করার ন্যূনতম অবকাশ আছে কি না। থাকলে উম্মাহকে বিভেদ ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত যুক্তি–দুর্বল দিকের উপর আমল করাই উত্তম। নীচের হাদীসগুলো থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনা পাচ্ছি।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল একবার আমাকে ইরশাদ করলেন, তুমি হয়ত জান না যে, তোমার কওম (কোরাইশ) কাবাঘর পুনঃনির্মাণ কালে (হযরত) ইবরাহীমের মূল বুনিয়াদ থেকে কিছু অংশ (অর্থ

সল্পতার কারণে) বাদ দিয়েছিল। আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহলে মূল বুনিয়াদ অনুযায়ী নির্মাণ করুন না! তিনি ইরশাদ করলেন, কোরাইশ (এর উল্লেখযোগ্য অংশ) নও মুসলিম না হলে তাই করতাম। এখন করতে গেলে অযথা কথা উঠবে যে, মুহাম্মদ কাবাঘর ভেঙ্গে ফেলছে। তাই এ কাজে এখন হাত দিচ্ছি না।”

দেখুন; মূল ইবরাহীমী বুনিয়াদের উপর কাবাঘরের নবনির্মাণের আমলটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকারযোগ্য ছিলো। তবে অপর দিকটিরও (অর্থাৎ পূর্বাবস্থা বহাল রাখারও) বৈধতা ছিলো। কিন্তু ফেতনা ও বিভ্রান্তির আশংকায় আল্লাহর রসূল অপর দিকটাই বেছে নিলেন।

তদ্রূপ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি সফরে চার রাকাত ফরজ পড়লেন। তাকে বলা হলো; হযরত উসমান সফরে কসর পড়েননি বলে আপনি আপত্তি তুলেছিলেন। অথচ আজ নিজেই দেখি চার রাকাত পড়ছেন। হযরত ইবনে মাসউদ তাদের বুঝিয়ে বললেন। দেখো; এখানে এর বিপরীত করাটা ফেতনার কারণ হতো।

এ বর্ণনা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, বিপরীত দিকের উপর আমল করার অবকাশ থাকলে ফেতনা ও অনৈক্য রোধের উদ্দেশ্যে তাই করা উত্তম। কেননা “সফরে কসর পড়তে হবে এই ছিলো হযরত ইবনে মাসউদের মূল সিদ্ধান্ত। তবে তাঁর মতে যুক্তিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপরীত দিকটিরও (অর্থাৎ চার রাকাত পড়ারও) অবকাশ ছিলো। আর তাই তিনি ফেতনার আশংকায় কসরের পরিবর্তে চার রাকাতই পড়লেন।

পক্ষান্তরে বিপরীত দিকের উপর আমল করার কোন অবকাশ না থাকলে (যেমন এতে ওয়াজিব তরক হয় কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয়, তদুপরি এর অনুকূলে কেয়াস ছাড়া অন্য কোন দলিল নেই। অথচ অপর দিকে রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ও বিশুদ্ধ হাদীস) নির্দ্বিধায় হাদীসের উপর আমল করাই ওয়াজিব হবে। কোনক্রমেই ইমামের গৃহীত সিদ্ধান্তের তাকলীদ বৈধ হবে না। কেননা দ্বীনের মূল উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ। আর কোরআন সুন্নাহর উপর সঠিক ও নির্ভুল আমলের পথ সুগম করাই হলো তাকলীদের উদ্দেশ্য। এই মূল উদ্দেশ্য যেখানে পণ্ড হবে সেখানে তাকলীদ নামের অন্ধ অনুকরণে অবিচল থাকা

গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের সর্বনাশা তাকলীদ সম্পর্কেই কঠোর নিন্দা বর্ষিত হয়েছে আল্লাহ পাকের কালামে, রসূলের হাদীসে এবং আলিমগণের বিভিন্ন বক্তব্যে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, তাকলীদ বর্জন করা সত্ত্বেও মুজতাহিদ সম্পর্কে অশালীন উক্তি বা আপত্তিকর ধারণা পোষণ করার অধিকার নেই কারো। কেননা এমন হতে পারে যে, হাদীসটি তাঁর কাছে দুর্বল সনদে পৌঁছেছিলো। কিংবা আদৌ পৌঁছেনি অথবা এর যুক্তিসংগত কোন ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিলো। সুতরাং তিনি হাদীস উপেক্ষা করেছেন এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। অনুরূপভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে কটাক্ষ করতে যাওয়াও চরম ধৃষ্টতা। কেননা বিশিষ্ট ছাহাবাগণও অনেক হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না।১ তাই বলে কি তাঁদের জ্ঞান ও মর্যাদার পূর্ণতায় কোন আঁচড় এসেছে?

১। এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সে যুগে হাদীস এত সহজলভ্য ছিলো না। সূত্রগত বিচার বিশ্লেষণের দুরূহতা ছাড়াও একেকটি হাদীসের জন্য হাজার মাইলও সফর করতে হতো তাদেরকে এবং তা বিমানে চড়ে নয়।

তদ্রূপ কোরআন সুন্নাহর নির্ভেজাল আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে সরল-অবিচল বিশ্বাসে এখনো যারা ইমামের তাকলীদ করে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কেও বদধারণা পোষণ করা যাবে না। কেননা তাদের অন্তরে তো এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল যে, ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্ত কোরআন সুন্নাহ থেকেই আহরিত। এমতাবস্থায় ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্তই তার জন্য চূড়ান্ত শরীয়তী দলিলের মর্যাদাপূর্ণ।

অনুরূপভাবে মুকাল্লিদের পক্ষেও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে তাকলীদ বর্জনকারীকে গালমন্দ করা উচিত হবে না। কেননা এ ধরনের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতা গোড়া থেকেই চলে এসেছে। ওলামায়ে কেরামের মতে এ ধরনের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সকলকে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, আমার সিদ্ধান্তই খুব সম্ভব নির্ভুল। তবে ভুলেরও সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত খুব সম্ভব ত্রুটিপূর্ণ, তবে নির্ভুলও হতে পারে। সুতরাং এ নিয়ে

বাড়াবাড়ি করে পরস্পরকে গোমরাহ, ফাসেক, বেদাতী, অহাবী ইত্যাদি বলা এবং গীবত ও দোষচর্চার মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানো চরম গর্হিত অপরাধ।

তবে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে যারা একমত নয় এবং মহান পূর্বসূরীগণের প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল নয় তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীও নয়। কেননা পুণ্যাত্মা ছাহাবাগণের সুমহান আদর্শ অনুসরণকারীরাই শুধু আহলে সুন্নাত নামের পরিচয় দেয়ার অধিকারী। আর ছাহাবা চরিত্রের সাথে এ ধরনের আচরণের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সুতরাং এরা আহলে সুন্নাতের অনুসারী নয় বরং আহলে বেদাত তথা শয়তানী চক্রের অনুগামী। সেইসাথে তাকলীদের নামে কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান লংঘনেও যারা কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের পরিণতিও অভিন্ন। তাই 'বাজার চলতি' বিতর্কে না জড়িয়ে উভয় শ্রেণী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলাই উত্তম।১

বস্তুতঃ এ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনায় হাকীমুল উম্মত যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল পথের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তরিকভাবে তা অনুসৃত হলে উম্মাহর হাজারো ফিতনা, অনৈক্য ও কোন্দল এই মুহূর্তে মুছে যেতে পারে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়।

১। আল ইকতিসাদ ফিত্তাকলীদে ওয়াল ইজতিহাদ, পৃঃ ৪২-৪৫

এ পর্যন্ত যে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করে এসেছি তাতে প্রমাণিত হলো যে, বিশেষ কোন মাসআলায় একজন মুতাবাহহির আলিম দ্ব্যর্থহীন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে আপন ইমামের মাযহাব ও সিদ্ধান্ত বর্জন করতে পারেন। অবশ্য এই আংশিক ইখতিলাফ ও মতভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তিনি উক্ত ইমামের মুকাল্লিদরূপেই গণ্য হবেন। তাই আমরা দেখি; ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মুকাল্লিদ হয়েও শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহগণ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামের মাযহাব মুতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আঙ্গুরজাত মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকদ্রব্য স্বল্প পরিমাণে সেবন করা যেতে পারে। কিন্তু (যুগ ও পরিবেশ বিচারে) হানাফী ফকীহগণ এ ব্যাপারে 'জমহুরের' সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। তদ্রূপ মুযারাবাত বা

বর্গা পদ্ধতিকে ইমাম আবু হানিফা অবৈধ বলে মত প্রকাশ করলেও হানাফী ফকীহগণ বৈধতার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এ দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য হানাফী ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) ফতোয়া বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া এমন হাজারো দৃষ্টান্ত আমরা পেশ করতে পারি যেখানে একজন দু'জন হানাফী ফকীহ বিচ্ছিন্নভাবে ইমাম সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

তবে মনে রাখতে হবে যে, এ পথ অত্যন্ত ঝুকিবহুল ও বিপদসংকুল পথ। পদে পদে এখানে বিচ্যুতি ও স্খলনের সম্ভাবনা। সুতরাং এ পথে চলতে হলে চাই পূর্ণ সংযম ও সতর্কতা। চাই ইলম ও তাকওয়ার সার্বক্ষণিক প্রহরা। শর্ত ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ মুতাবাহহির আলিমের জন্যই শুধু এ ঝুকিবহুল পথে অগ্রসর হওয়ার সতর্ক অনুমতি রয়েছে। অন্যদের জন্য এটা হবে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও সর্বনাশা পদক্ষেপ।

তাকলীদের তৃতীয় স্তর

তাকলীদের তৃতয়ি স্তর হলো মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ। যিনি নীতি ও মূলনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ মুজতাহিদের অনুগত থেকে সে আলোকে কোরআন সুন্নাহ ও ছাহাবা চরিত থেকে সরাসরি আহকাম ও বিধান আহরণে সক্ষম। অর্থাৎ খুঁটিনাটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত সত্ত্বেও 'মূলনীতির' প্রেক্ষিতে তিনি পূর্ণাংগ মুজতাহিদের মুকাল্লিদ বিবেচিত হবেন। এ স্তরে রয়েছেন হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ), শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম মুযনী ও আবু সাওর। মালেকী মাযহাবের ইমাম সাহনূন ও ইবনুল কাসেম এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবরাহীম আল হারবী ও আবু বকর আল আসরাম প্রমুখ।

মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের পরিচয় প্রসংগে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) লিখেছেন–

الثَّانِيَةُ طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَذْهَبِ كَأَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ
وَسَائِرِ اَصْحَابِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الْقَادِرِيْنَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْاَحْكَامِ

৭ —

عَنِ الادلّة المذكورة على حسب القواعد التى قررها استاذهم، فانّهم وان خالفوه فى بعض الاحكام الفروع ولكنّهم يقلّدونه فى قواعد الاصول۔

ফকীহগণের দ্বিতীয় স্তর হলো মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের স্তর। এ স্তরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদসহ হযরত ইমাম আবু হানিফার অন্যান্য শিষ্য। তাঁরা তাঁদের উস্তাদ (আবু হানিফা) কর্তৃক প্রণীত মূলনীতিমালার আলোকে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে আহকাম আহরণে সক্ষম। খুঁটিনাটি মাসআলায় ইখতিলাফ সত্ত্বেও উসূল ও মূলনীতিতে তাঁরা আপন ইমামের মুকাল্লিদ।

তাকলীদের চতুর্থ স্তর

তাকলীদের চতুর্থ ও সর্বোচ্চ স্তর হলো 'মুজতাহিদে মুতলক' বা পূর্ণাংগ মুজতাহিদের তাকলীদ। যিনি কোরআন সুন্নাহর আলোকে উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করে আহকাম ও মাসায়েল আহরণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী। এ স্তরে রয়েছেন হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ প্রমুখ। মূলনীতি প্রণয়ন ও আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে এঁরা স্বতন্ত্র ও পূর্ণাংগ মুজতাহিদের মর্যাদাধিকারী হলেও এক পর্যায়ে তাদেরকেও তাকলীদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেলে নিজেদের বিচার, প্রজ্ঞা ও কিয়াসের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তারা ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের তাকলীদ করেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যদি ছাহাবী বা তাবেয়ীর কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কতকটা অনোন্যপায় হয়েই তাঁরা নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন। 'তিন কল্যাণ' যুগে এ ধরনের তাকলীদের ভুরি ভুরি নযীর খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথম নযীরঃ

এ দৃষ্টিভংগীর প্রথম পথিকৃত হলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। বিচারপতি সোরায়হের নামে লেখা এক চিঠিতে ঠিক এ নির্দেশই দিয়েছিলেন তিনি। হযরত ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন–

عَنْ شُرَيْحٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضـ كَتَبَ اِلَيْهِ: اِنْ جَاءَكَ شَىْءٌ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَاقْضِ بِهٖ، وَلَا يَلْتَفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ فَاِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا فَاِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهٖ فَاِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ اَحَدٌ قبلك فاخْتَرْ اَىَّ الْاَمْرَيْنِ شِئْتَ، اِنْ شِئْتَ اَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ ولا أرى التأخر اِلَّا خَيْرًا لَكَ ـ

(سنن الدارمی ج ۱/ ص ـ ۵۵)

হযরত সোরায়হ হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁকে পত্রযোগে এ নির্দেশ পাঠালেন– তোমার সামনে পেশকৃত সমস্যার কোন সমাধান যদি কিতাবুল্লায় পেয়ে যাও তাহলে সেভাবেই ফয়সালা করবে। কারো ব্যক্তিগত মতামতের কোন তোয়াক্কা করবে না। কিতাবুল্লায় সমাধান খুঁজে না পেলে সুন্নাহ মুতাবেক ফয়সালা করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে পূর্ববর্তীগণের 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' খুঁজে দেখো এবং সে মুতাবেক ফয়সালা করো। কখনো যদি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হও যার সমাধান কিতাবুল্লায় নেই, সুন্নাতে রাসূলেও নেই এবং পূর্ববর্তী কোন ফকীহও সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পেশ করে যাননি তাহলে তুমি যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করতে পারো। নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত দিতে পারো কিংবা ইচ্ছে করলে সরেও দাঁড়াতে পারো। আমি অবশ্য সরে দাঁড়ানোটাই তোমার জন্য নিরাপদ মনে করি।

হযরত সোরায়হ ছিলেন মুজতাহিদে মুতলাকের মর্যাদাসম্পন্ন একজন দূরদর্শী বিচারপতি। তা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগের পূর্বে পূর্ববর্তী ফকীহগণের সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করে দেখার নি–

দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও এ ধরনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় নযীরঃ

সুনানে দারেমী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াযিদ কর্তৃক বর্ণিত আছে–

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض إِذَا سُئِلَ عَنِ الأمرِ فكانَ فِي القُرآنِ أَخْبَرَ بِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي القرآنِ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بكرٍ وَعُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ

(سنن الدارمي - ج- ١/ص- ٥٥)

হযরত ইবনে আব্বাসকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কিতাবুল্লাহ্ থেকে ফয়সালা দিতেন। সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে সুন্নাহ থেকে ফয়সালা দিতেন। সেখানেও সমাধান খুঁজে না পেলে হযরত আবু বকর কিংবা হযরত ওমর (রাঃ)এর সিদ্ধান্ত মুতাবেক ফয়সালা দিতেন। সর্বশেষে ইজতিহাদ প্রয়োগ করতেন।

দেখুন; পূর্ণাংগ মুজতাহিদের শীর্ষমর্যাদায় আসীন হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইবনে আব্বাস নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগের পরিবর্তে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর তাকলীদ করার চেষ্টা করতেন।

তৃতীয় নযীরঃ

সুনানে দারেমীর আরেকটি রেওয়ায়েত শুনুন–

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رض يَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَخْبِرْنِي أَنتَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِن هٰذَا؟ أَخْبَرْتُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رض وَيَسْأَلُنِي عَنْ رَأْيِي، وَدِينِي عِنْدِي آثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، وَاللهِ لَأَنْ أَتَغَنَّى أُغْنِيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْبِرَكَ بِرَأْيِي (سنن الدارمي - ج- ١/ ص- ٤٥)

জনৈক ব্যক্তি একবার ইমাম শা'বীকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদের অভিমত এই। লোকটি বললো, আপনি নিজের মতামত বলুন। ইমাম শা'বী (উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে) বললেন, কাণ্ড দেখো; আমি একে শোনাচ্ছি ইবনে মাসউদের সিদ্ধান্ত আর সে কিনা জানতে চাচ্ছে আমার মতামত। আমার ইমাম আমার কাছে এর চে' অনেক প্রিয়। আল্লাহর কসম! ইবনে মাসউদের মুকাবেলায় নিজের মত জাহির করার চেয়ে পথে পথে গানগেয়ে বেড়ানোই আমি পছন্দ করবো।

চতুর্থ নযীরঃ

এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত ইমাম মুজাহিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন–

أَئِمَّةً نَقْتَدِى بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِى بِنَا مَنْ بَعْدَنَا

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি মুত্তাকীদের ইমাম ও নেতা নির্বাচিত করুন, অর্থাৎ আমরা পূবর্তীদের অনুগামী হবো আর পরবর্তীরা আমাদের অনুগামীহবে।১

ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার হযরত সুদ্দী (রঃ) এর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।

لَيْسَ الْمُرَادُ اَن نَؤم النَّاسَ وَاِنَّمَا اَرَادُوا اجْعَلْنَا اَئِمَّةً لَهُمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يَقْتَدُوْنَ بِنَا فِيْهِ ـ (فتح البارى للحافظ ابن حجر ج ـ ١٣/ ص٢١٠

এটা নিছক নামাজের ইমামতি নয় বরং আয়াতের অর্থ হলো; আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতার মর্যাদা দান করুন যেন হালাল হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে তারা আমাদের ইকতিদা করে।

মোটকথা; ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ হযরত ইমাম শা'বী (রঃ) যেমন পূর্ণাংগ মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের পরিবর্তে ইবনে মাসউদের তাকলীদকে অধিক নিরাপদ ও কল্যাণপ্রদ মনে করতেন তেমনি হযরত

মুজাহিদের মত বিশাল ব্যক্তিত্বও পূর্ববর্তীদের অনুগমন ও ইকতিদা পসন্দ করতেন।

১। কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ

তাকলীদবিরোধীদের অভিযোগ ও জবাব

তাকলীদের আহকাম ও হাকীকত সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হলো তা অনুসন্ধিৎসু ও নিরপেক্ষ পাঠকের জন্য তাকলীদ সম্পর্কিত সকল অভিযোগ–আপত্তি ও দ্বিধা–সংশয় নিরসনে যথেষ্ট; এ কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। তবু এখানে খুব সংক্ষেপে আমরা তাকলীদবিরোধী বন্ধুদের মুখে ও কলমে বহুল আলোচিত অভিযোগগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব পেশ করার চেষ্টা করবো।

প্রথম অভিযোগঃ পূর্বপুরুষের তাকলীদ

তাকলীদের বিরুদ্ধে সবচে' গুরুতর অভিযোগ এই যে, তাকলীদ মূলতঃ পূর্বপুরুষের অনুগমন, অথচ আল কোরআন এটাকে শিরকসুলভ আচরণ বলে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেছে–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

যখন তদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মেনে চলো, তখন তারা বলে কি! আমরা তো সে পথেই চলবো যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষদের চলতে দেখেছি। আচ্ছা, তাদের পূর্বপুরুষরা যদি গোমরাহ হয়ে থাকে তবুও?

কিন্তু বিদগ্ধ পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, এ স্থূল অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব পিছনের আলাচনায় একাধিকবার আমরা দিয়ে এসেছি। এখানে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য আয়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো দীনের বুনিয়াদী আকীদা ও বিশ্বাস। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হলে, সত্যের সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে

মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় বলতো; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আকীদা ও বিশ্বাসেই আমরা অবিচল থাকবো। সুতরাং মুশরিক সম্প্রদায়ের বুনিয়াদী আকীদাবিষয়ক তাকলীদের নিন্দাবাদই হলো আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। অথচ উসূলে ফেকাহর সকল প্রামাণ্যগ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, আকীদা ও বিশ্বাসের বেলায় তাকলীদের কোন অবকাশ নেই। ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই। বস্তুত আকীদা ও বিশ্বাস তাকলীদ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র নয়। বরং احكام ظنيـــة তথা অস্পষ্ট দলিল ভিত্তিক আহকামই হচ্ছে তাকলীদ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র। কেননা এ ধরনের আহকাম সুনির্দিষ্ট মূলনীতিমালার আলোকে ইজতিহাদ প্রয়োগ ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আবার ইজতিহাদ করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

মোটকথা; যে তাকলীদের বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে নিন্দা ও ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে, তাকলীদপন্থী আলিমগণের মতেও তা ঘৃণিত ও নিন্দিত। এ জন্যই 'আকীদায় তাকলীদ নেই' বক্তব্যের সমর্থনে আল্লামা খতীব বোগদাদী (রঃ) আলোচ্য আয়াতকেই যুক্তি হিসাবে পেশ করেছেন।১

সর্বোপরি যে কারণে 'পূর্বপুরুষের' তাকলীদ ঘৃণিত ও নিন্দিত, আমাদের ইসলামী তাকলীদে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কেননা মক্কার মুশরিকরা তাওহীদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে পূর্বপুরুষের অনুগমনের ঘোষণা দিয়েছিলো। তদুপরি পূর্বপুরুষরা নিজেরাই ছিলো আকল ও হিদায়াত বঞ্চিত।

১। আল ফিকহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খঃ২ পৃঃ ২২

পক্ষান্তরে ইসলামী তাকলীদ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান লংঘন করে পূর্বপুরুষের অন্ধ আনুগত্যের নাম নয়। বরং কোরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যাদানকারী হিসাবে মুজতাহিদের নির্দেশিত পথে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলারই নাম তাকলীদ। আর এ কথা বলার দুঃসাহস কি আপনার আছে যে, আমাদের মহান পূর্বসূরী ইমাম ও মুজতাহিদগণ আকল ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিলেন? বস্তুতঃ মুশরিক সম্প্রদায়ের আকীদা বিষয়ক অন্ধতাকলীদের সাথে শরীয়ত স্বীকৃত আলোচ্য তাকলীদের তুলনা করতে যাওয়া আমাদের মতে বিবেকের মর্মান্তিক অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় অভিযোগঃ পোপ–পাদ্রীদের তাকলীদ

ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় পোপ–পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রভুমর্যদা দিয়ে রেখেছিলো। হালাল–হারাম ও বৈধাবৈধ নির্ধারণেল একচ্ছত্র ক্ষমতাও ছিলো তাদেরই হাতে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই 'জাতীয় গোমরাহী' সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

আল্লাহকে বাদ দিয়ে ধর্ম–পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদেরই তারা 'রব' এর মর্যাদায় বসিয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই গোমরাহীর সাথেও আলোচ্য ইসলামী তাকলীদের মিল খুঁজে পেয়েছেন আমার কতিপয় সম্মানিত বন্ধু।

কিন্তু আগেই আমরা বলে এসেছি যে, তাকলীদের ভিত্তি মুজতাহিদ কর্তৃক আইন প্রণয়ণ নয়। বরং কোরআন সুন্নায় বিদ্যমান আইনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদান। অর্থাৎ মুজতাহিদ তার ইজতিহাদী প্রজ্ঞার সাহায্যে কোরআন সুন্নাহর জটিল ও প্রচ্ছন্ন আহকাম ও বিধানগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর ইজতিহাদী প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের বিধানরূপেই সেগুলো মেনে চলেন। সুতরাং মুজতাহিদ স্বতন্ত্র আনুগত্যের দাবীদার নন। বরং কোরআন সুন্নাহর দুর্গম পথের আনাড়ী পথিকদের জন্য মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা খাদেম মাত্র। ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মত কঠোর তাওহীদবাদী ব্যক্তিও লিখেছেন।

اِنَّمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ طَاعَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَهٰؤُلَاءِ اُولُو الْاَمْرِ
الَّذِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ بِطَاعَتِهِمْ... اِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعًا لِطَاعَةِ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ لَا اسْتِقْلَالًا ،

আল্লাহ ও রাসূলের নিরংকুশ আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য্য। তবে "উলিল আমরের" প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশও আল্লাহ দিয়েছেন। সুতরাং সেটা

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যেরই ছায়া মাত্র। এর স্বতন্ত্র ও পৃথক অস্তিত্ব নেই।১

অন্যত্র তিনি আরো বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

فطاعة الله ورسوله وتحليل ما احل الله ورسوله وتحريم
ما حرمه الله ورسوله وايجاب ما اوجبه الله ورسوله واجب على
جميع الثقلين الانس والجن واجب على كل احد فى كل حال
سرا وعلانية لكن لما كان من الاحكام ما لا يعرفه كثير من الناس
رجع الناس فى ذلك الى من يعلمهم ذلك لانه اعلم بما قال الرسول
واعلم بمراده ، فائمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وادلة
بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب
اجتهادهم واستطاعتهم وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم
ما ليس عند الاخر

১। ফাতাওয়া ইবনে তায়ামিয়া খঃ ২ পৃঃ ৪৬১

আল্লাহ ও রাসূলের নিরংকুশ আনুগত্য তথা হারাম-হালাল ও করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলাই হলো জ্বীন-ইনসানের সার্বক্ষণিক কর্তব্য। তবে সকলের পক্ষে তো জটিল আহকাম সমূহ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান বাতলে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞ আলিমের। কেননা রাসূলের বাণী ও বক্তব্যের সঠিক মর্ম তাঁরাই অধিক জানেন। বস্তুতঃ ইমামগণ হলেন নবী ও উম্মাহর মাঝে মিলন সূত্র বা পথপ্রদর্শক। ইজতিহাদের মাধ্যমে হাদীসের বাণী ও মর্ম এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাসম্ভব নির্ধারণ করে মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়াই হলো তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বস্তুতঃ কোন কোন আলিমকে আল্লাহ পাক এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন যা লাভ করার সৌভাগ্য অন্যদের হয় না।১

১। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া খঃ ২ পৃঃ ২৩৯

এখন আমরা আমাদের পিছনের আলোচনাকে এভাবে ধারাবদ্ধ করতে পারি।

১। দ্বীনের মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাকলীদ বা ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই।

২। অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত এবং মজবুত ধারাবাহিকতাপুষ্ট শরীয়তী বিধান সমূহের বেলায়ও কারো তাকলীদ বৈধ নয়।

৩। যে সকল আহকামের উৎস ও বুনিয়াদ হলো কোরআন সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট দলিল (এবং সেগুলোর বিপরীতে অন্য কোন দলিল নেই) সে সকল ক্ষেত্রেও কোন ইমামের তাকলীদের প্রয়োজন নেই।

৪। তাকলীদের উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থটি নির্ধারণ কিংবা ভিন্নমূখী দুই দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে ইমামের আল্লাহপ্রদত্ত ইজতিহাদী প্রজ্ঞার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করা।

৫। মুকাল্লিদকে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন মুজতাহিদ ভুল ও বিচ্যুতির উর্ধে নন। বরং তাদের প্রতিটি ইজতিহাদেই ভুলের সম্ভাবনা আছে।

৬। একজন মুতাবাহহির আলিমের দৃষ্টিতে মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত যদি সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী মনে হয় (এবং মুজতাহিদের অনুকূলে কোন দলিলও তার (চোখে না পড়ে) তাহলে পূর্ববর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুজতাহিদকে পাশকেটে বাধ্যতামূলকভাবে হাদীসের উপরই তাকে আমল করতে হবে। এই সহজ–সরল ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাটাও যদি শিরিক–দোষে দোষী মনে হয় তাহলে দুনিয়ার কোন কাজটাকে আর শিরিকমুক্ত বলা যাবে শুনি!

বলাবাহুল্য যে, তাকলীদবিরোধী বন্ধুরাও কার্যতঃ বিভিন্ন পর্যায়ে তাকলীদের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কেননা জন্মসূত্রে যেমন মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে সকলের পক্ষে আলিম হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং অনিবার্য কারণেই সাধারণ শ্রেণীর গায়রে

মুকাল্লিদকে কোন না কোন আহলে হাদীস আলিমের ফতোয়ার উপর নির্ভর করে চলতে হবে। যে নামই দেয়া হোক এটা আসলে তাকলীদ ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুরূপভাবে নিয়মিত কোরআন সুন্নাহর ইলম অর্জন করে যারা আলিম নাম ধারণ করেছেন তাদের সকলের জীবনে কি কোরআন সুন্নাহর মহাসমূদ্র মন্থন করে সকল মাসআলার সিদ্ধান্ত আহরণ করার অবকাশ থাকে? না এমনটি সম্ভব? তাদেরকেও তো পূর্ববর্তী ফকীহগণের কিতাব ও ফতোয়া গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়। পার্থক্য শুধু এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থরাজির পরিবর্তে তাঁরা আল্লামা ইবনে তায়মিয়া, ইবনে হাযম, ইবনুল কায়্যিম, কাজী শাওকানী প্রমুখের পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্তমালার উপর নির্ভর করে থাকেন।

এমনকি কেউ যদি নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করে কোরআন সুন্নাহর মূল উৎস থেকে আহকাম আহরণ করতে চান, তাহলে তাকলীদ নামের "আপদ" থেকে তারও নিস্তার নেই। কেননা সনদ ও সূত্রবিদ্যা বিশারদগণের দুয়ারে হাজিরা দেয়া ছাড়া হাদীসের দুর্বলতা কিংবা বিশুদ্ধতা নিরূপণের কোন বিকল্প উপায় নেই। সুতরাং তাকলীদবিরোধী বন্ধুরাও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন এবং তাদেরকেও সে উত্তরই দিতে হবে যে উত্তর ইতিপূর্বে আমরা দিয়ে এসেছি।

বস্তুতঃ বৈচিত্রপূর্ণ মানব জীবনের কোন শাখাই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের তাকলীদমুক্ত নয়। সুতরাং 'নিষিদ্ধ ফলের' মত তাকলীদ বর্জনের অর্থ হবে, দ্বীন-দুনিয়ার সকল কর্ম-কাণ্ড এক মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয়া।

আদী বিন হাতিমের হাদীসঃ

তাকলীদের বিরুদ্ধে হযরত আদী বিন হাতিমের হাদীসটিও বেশ আত্মতৃপ্তির সাথে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হযরত আদী বিন হাতিম বলেন-

عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ
عُنُقِىْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِىُّ ! اطْرَحْ عَنْكَ هٰذَا الْوَثَنَ

وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ : اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا اَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوا وَاِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ (رواه الترمذى)

একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। আমার কাঁধে সোনার ক্রস ঝুলছিলো। তা দেখে তিনি বললেন, আদী! এ মূর্তিটা ছুড়ে ফেলো। এরপর তিনি সূরাতুল বারাতের আয়াত তিলাওয়াত করলেন। "আল্লাহর পরিবর্তে ধর্ম–পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের তারা 'রব' এর মর্যাদায় বসিয়েছিলো। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, এরা অবশ্য ওদের পুজা করতো না। তবে ওরা (নিজেদের মর্জিমত) হারাম হালাল নির্ধারণ করে দিতো। আর এরা নির্বিবাদে তা মেনে নিতো।

কিন্তু ইতিপূর্বের আলোচনা থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইমাম ও মুজতাহিদগণের তাকলীদের সাথে আলোচ্য হাদীসের দূরতম সম্পর্কও নেই। সুতরাং পূর্বের অভিযোগ দুটির জবাব এখানেও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ আহলে কিতাবীদের আকীদা মতে পোপ ও ধর্মযাজকরাই ছিলো আইন প্রণয়ন তথা হালাল–হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। ভুল–ক্রটির বহু দূরে ছিলো তাদের অবস্থান। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বিজ্ঞ নিবন্ধকার পোপের ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রসংগে লিখেছেন।

সামগ্রিকভাবে গির্জা যে আইনগত ক্ষমতা (AURHORITY) এবং পবিত্রতা (INFALL IBILITY) র অধিকারী, আকীদাগত বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসাবে পোপ নিজেই সেগুলোর অধিকারী। সুতরাং আন্ত–গির্জা পরিষদের সকল অধিকার–এখতিয়ার আইন প্রণেতা হিসাবে পোপ এককভাবেই ভোগ করে থাকেন। অর্থাৎ দুটি মৌলিক অধিকার পোপের পদমর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অংগ। প্রথমতঃ আকীদা ও মৌলবিশ্বাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি মানবীয় ক্রটিমুক্ত ও পবিত্র। দ্বিতীয়তঃ গোটা খৃষ্টান জগতের উপর সর্ববিষয়ে তিনি নিরংকুশ আইনগত ক্ষমতার অধিকারী।১

একই বিশ্বকোষের অন্যত্র আছে

"রোমান ক্যাথলিক চার্চ পোপের যে পবিত্রতা (INFALL IBILITY) দাবী করে, তার মর্মার্থ এই যে, গোটা খৃষ্টানজগতের উদ্দেশ্যে পোপ যখন নীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কিত কোন ফরমান জারী করেন তখন তিনি ভুল ও বিচ্যুতির উর্ধে অবস্থান করেন।২

১। খঃ ১৮ পৃঃ ২২২-২৩ পোপ।
২। খঃ ১২ পৃঃ ৩১৮ (INFLL IBILITY)

এবার বুকে হাত রেখে বলুন দেখি; গির্জাপ্রদত্ত পোপের ঐশীক্ষমতা এবং মুজতাহিদের শরীয়ত অনুমদিত তাকলীদের মাঝে চোখে পড়ার মত কোন তফাত কি নেই?

ব্রিটানিকা নিবন্ধকারের বক্তব্য মতে-

১। পোপ হলেন খৃষ্টান জগতের নিরংকুশ ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে আলোচনার শুরুতে তাকলীদের পরিচয় পর্বে আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, মুজতাহিদ কোন প্রকার স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী নন।

২। আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পোপের ক্ষমতা অবাধ অথচ আমাদের বক্তব্য মতে আকীদা ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে তাকলীদের কোন অস্তিত্বই নেই।

৩। খৃষ্টধর্মে পোপ আইন প্রণয়নের ঐশী মর্যাদা ভোগ করেন। পক্ষান্তরে মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো কোরআন সুন্নায় বিদ্যমান আইন ও বিধানের ব্যাখ্যা পরিবেশন।

৪। খৃষ্টধর্মে পোপের অবস্থান হলো সকল মানবীয় ভুলত্রুটির উর্ধে। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস মতে মুজতাহিদের প্রতিটি ইজতিহাদে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে।

৫। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত বর্জনের অবকাশ থাকলেও পোপের কোন ধর্মীয় নির্দেশ অগ্রাহ্য করার অধিকার গোটা খৃষ্টানজগতের নেই। উভয় তাকলীদের এ পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য সত্ত্বেও যদি কেউ আদী বিন হাতিমের হাদীস পুঁজি করে পানি ঘোলাতে চান তাহলে আল্লাহর

কাছে তার হিদায়াত প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু নেই। অবশ্য কোন অন্ধমুকাল্লিদ যদি খৃষ্টানদের মতো মুজতাহিদকেও পোপের মতো ঐশীমর্যাদা দিয়ে বসে তাহলে নিঃসন্দেহে সে উক্ত হাদীসের লক্ষবস্তু হবে।

হযরত ইবনে মাসউদের নির্দেশঃ

তাকলীদবিরোধী বন্ধুদের আরেকটি প্রিয় দলিল হ'লো হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ নির্দেশ–

لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دِينَهُ إِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ

দ্বীনের ব্যাপারে কেউ কারো এমন অন্ধতাকলীদ যেন না করে যে, প্রথমজন ঈমান এনেছে বলে দ্বিতীয়জন ঈমান আনবে এবং প্রথমজন কুফরী করেছে বলে দ্বিতীয়জন কুফরী করবে।

কিন্তু আমরা জানতে চাই; এ ধরনের অন্ধতাকলীদকে বৈধ বলে–টা কে? ঈমান–আকীদার ক্ষেত্রে তাকলীদের অবৈধতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ উম্মাহর সকল সদস্যই তো অভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু তাতে ইজতিহাদনির্ভর আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে তাকলীদের অবৈধতা প্রমাণিত হলো কিভাবে? এ সম্পর্কে খোদ ইবনে মাসউদের উপদেশই না হয় শুনুন।

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانُوا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ... فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلٰى أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدٰى الْمُسْتَقِيمِ

কেউ যদি কারো অনুসরণ করতে চায় তাহলে বিগতদের তরীকাই তার অনুসরণ করা উচিত। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনার সম্ভাবনামুক্ত নয়। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা। হৃদয়ের পবিত্রতায়, ইলমের গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তাঁরা ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠজামাত। আল্লাহ পাক তাদেরকে আপন নবীর সংগ লাভ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

করে নাও এবং তাদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করো। কেননা তারাই হলেন সিরাতুল মুস্তাকীমের কাফেলা।১

১। মিশকাত, বাবুল ই'তিসামে বিল-কিতাবে ওয়াস্-সুন্নাহ

মুজতাহিদগণের উক্তি

অনেক বন্ধু আবার খোদ মুজতাহিদগণের বিভিন্ন উক্তিকেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, মুজতাহিদগণ

"আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণ করো না।" কিংবা আমাদের কোন সিদ্ধান্ত হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে তা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে হাদীসকেই আকড়ে ধরবে।

কিন্তু ইনসাফ ও বাস্তবতার বিচারে এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মুজতাহিদগণের এ ধরনের উক্তি তাদের জন্য নয় যারা ইজতিহাদের ন্যূনতম যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত। বরং ইজতিহাদ ও বিচার বিশ্লেষণের সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্নদের লক্ষ্য করেই মুজতাহিদগণ এ কথা বলেছেন। তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন–

إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسئلة واحدة وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا أو أنه ليس بمنسوخ إما بأن يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسئلة أو بأن يرى جما غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلي

"এ ধরনের উক্তি তাদের জন্যই শুধু প্রযোজ্য যারা একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী। রাসূলের আদেশ-নিষেধ

সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত এবং এ সম্পর্কেও অবগত যে, রাসূলের অমুক আদেশ বা নিষেধ রহিত হয়ে যায়নি। (এ অবগতি তারা অর্জন করেছে) হয় সংশ্লিষ্ট হাদীস ও পক্ষ বিপক্ষের যাবতীয় বক্তব্য বিচার পর্যালোচনা করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে উক্ত হাদীস মুতাবেক আমল করতে দেখে। অন্য দিকে হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইমামের কাছে কিয়াস ছাড়া কোন দলিল নেই। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তরক করার অর্থ, গুপ্ত কপটতা কিংবা নিরেট মুর্খতা।১

আসলে বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, তা যুক্তি–প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না। কেননা মুজতাহিদগণের মতে তাকলীদ অবৈধ হলে মানুষকে তারা হাজার হাজার ফতোয়া জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে গেছেন কোন যুক্তিতে? আরো মজার ব্যাপার এই যে, প্রায় সকল মুজতাহিদই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাধারণ লোকের জন্য তাকলীদের অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন।

হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কেফায়ার ভাষায়–

وَاِذَا كَانَ الْمُفْتِىْ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ فَعَلَى الْعَامِّىْ تَقْلِيْدُهٗ وَاِنْ كَانَ الْمُفْتِىْ اَخْطَأَ فِىْ ذٰلِكَ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِغَيْرِهٖ، هٰكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَابْنُ رُسْتَمَ عَنْ مُحَمَّدٍ رح وَبَشِيْرُ بْنُ الْوَلِيْدِ رح عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ-

ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন মুফতী সাহেব সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করলেও লোকের জন্য তার তাকলীদ করা অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই। ইমাম হাসান ইবনে রোস্তম ও বশীর বিন অলীদ যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদের এ বক্তব্য রেওয়ায়েত করেছেন।২

১। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ খঃ ১ পৃঃ ১৫৫
২। কিফায়া, কিতাবুস সাওম।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর এ মন্তব্য তো আগেও আমরা উদ্ধৃত করেছি যে, হাদীস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে সাধারণ লোকের কর্তব্য হলো ফকীহগণের তাকলীদ করে যাওয়া।১

আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার মতে–

وَيَأْمُرُ الْعَامِّيَّ بِأَنْ يَسْتَفْتِيَ اِسْحٰقَ وَاَبَا عُبَيْدٍ وَاَبَا ثَوْرٍ وَاَبَا مُصْعَبٍ وَيَنْهٰى الْعُلَمَاءَ مِنْ اَصْحَابِهِ كَاَبِيْ دَاوٗدَ وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ وَاِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيِّ وَاَبِيْ بَكْرٍ الْاَثْرَمِ وَاَبِيْ زُرْعَةَ وَاَبِيْ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِ هٰؤُلَاءِ اَنْ يُقَلِّدُوْا اَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْاَصْلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) সাধারণ লোকদেরকে ইসহাক, আবু উবায়দ, আবু সাওর ও আবু মুসআব প্রমুখ ইমামের তাকলীদ করার নির্দেশ দিতেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু দাউদ উসমান বিন সাঈদ, ইবরাহীম আল হারবী, আবু বকর আল–আসরম, আবু যুর'আ, আবু হাতেম সিজিস্তানী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্রদেরকে কারো তাকলীদের ব্যাপারে নিষেধ করে বলতেন–তোমাদের জন্য শরীয়তের মূল উৎস তথা কোরআন সুন্নাহ আকড়ে ধরাই ওয়াজিব।২

১। হেদায়া, খঃ ১ পৃঃ ২২৩
২ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, খঃ২ পৃঃ ২৪

এ বর্ণনা পরিষ্কার প্রমাণ করছে যে, তাকলীদের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের নিষেধবাণী ছিলো তাঁদের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের প্রতি। কেননা হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একেক জন ইমাম। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের কঠোর নির্দেশ ছিলো নির্ভেজাল তাকলীদের। বস্তুতঃ কতিপয় স্থূলদর্শী মুতাজেলী ছাড়া ইসলামী উম্মাহর নেতৃস্থানীয় সকলেই তাকলীদের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে গেছেন।

আল্লামা সাইফুদ্দীন সামুদী (রঃ) লিখেছেন-

العَامِيّ وَمَنْ لَيْسَ لَهٗ اَهْلِيَّةُ الاِجْتِهَادِ وَاِنْ كَانَ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُـوْمِ المُعْتَبَرَةِ فِى الاِجْتِهَادِ يَلْزَمُه اتباعُ قَوْلِ المُجْتَهِدِ وَالاَخْذِ بِفَتْوَاهُ عِنْدَ المُحَقِّقِيْنَ مِنَ الاُصُولِيّيْنَ وَمَنَعَ مِن ذٰلِكَ بَعْضُ مُعْتَزِلَـةِ البَغْدَادِيِّيْنَ

(ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কতিপয় ইলম অর্জন করা সত্ত্বেও) সামগ্রিক ইজতিহাদী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত আলিমগণের কর্তব্য হলো নিষ্ঠার সাথে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া অনুসরণ করে যাওয়া। অথচ বাগদাদ কেন্দ্রিক গুটি কতেক মুতাজেলী ভিন্ন মত পোষণ করেছে।১

১। ইহকামুল আহকাম, খঃ৪ পৃঃ ১৯৭

আল্লামা খতীব বোগদাদী লিখেছেন-

وَحُكِىَ عَنْ بَعْضِ المعتزلةِ انه قَالَ لايَجُوزُ للعامى العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم ... وهذا غلط لانه لاسبيل للعامِىّ الوقوف على ذلك اِلاَّ بعد ان يَتَفقَّهَ سِنين كَثيرةً ويُخالِطَ الفُقهاءَ المُدةَ الطويلةَ ويتحقّق طُرقَ القياسِ وَيعلم مايُصححه وَيفسِدُه وما يَجبُ تَقدِيمُه على غَيرِهٖ من الادِلَّه وفى تَكليفِ العامَّةِ بذلك تكليفُ مَالاَيُطيقونه ولاَسَبيلَ لهم اِليـه -

কতিপয় মুতাজেলীর মতে সাধারণ লোকের পক্ষেও দলিল না জেনে কোন আলিমের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া মেনে নেয়া বৈধ নয়। এটা ভুল। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সম্ভব হওয়ার একমাত্র উপায় হলো বছরের পর বছর বিজ্ঞ ফকীহগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইলমে ফিকাহ অধ্যয়ন করা। কিয়াসসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিপক্কতা অর্জন করা, বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত কিয়াস নির্ধারণের যোগ্যতা

ভি করা এবং দুই দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার প্রদানের প্রজ্ঞা অর্জন করা। বলাবাহুল্য যে, সাধারণ লোককে এ কাজে লাগানোর মানে হলো সাধ্যসাধনে বাধ্য করা।১

অবশ্য ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অপর মুজতাহিদের তাকলীদ করার অবকাশ আছে কি না সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা খতীব বোগদাদী বলেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরীর মতে এর অবকাশ আছে।২ এবং আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার ভাষ্যমতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সুফিয়ানের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।৩ অবশ্য ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বিন হাম্বলের মতে তা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফার মতে একজন মুজতাহিদ অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরের মুজতাহিদের তাকলীদ করতে পারেন। উসূলে ফিকাহর অধিকাংশ গ্রন্থে এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।৪

১। আল ফকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খঃ২ পৃঃ ৬৯
২। ঐ
৩। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, খঃ২ পৃঃ ২৪
৪। আত্তালী কাতুস্-সানিয়্যাহ আলা তারজিহিল হানাফিয়্যাহ, পৃঃ ৯৬

মোটকথা, মুজতাহিদ কর্তৃক মুজতাহিদের তাকলীদ সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও অমুজতাহিদের তাকলীদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সকল ইমাম জোরালো ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

মুজতাহিদের পরিচয়ঃ

আলোচনার গোড়াতে আমরা বলে এসেছি যে, মুক্ততাকলীদ ও ব্যক্তিতাকলীদ- উভয়ের সারকথা হলো; কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম আহরণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যার নেই, সে নির্ভরযোগ্য আলিমের ফতোয়া মোতাবেক আমল করবে।

কতিপয় বন্ধু জানতে চেয়েছেন যে, জাহিল ও সাধারণ লোকের পক্ষে কারো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার বিচার করা কিভাবে সম্ভব?

আর এটা বিচার করার ক্ষমতা যার আছে সে অন্য কারো তাকলীদই বা করতে যাবে কোন দুঃখে?১

বন্ধুদের অবগতির জন্য এখানে আমরা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি তুলে ধরা জরুরী মনে করি।

فَإِنْ قِيلَ ... العامِيُّ يحكُم بِالوَهْمِ ويغتَرُّ بالظَّواهِرِ ورُبَّما يُقَدِّمُ المفضولَ على الفاضِلِ، فان جَازَ أَنْ يحكُم بِغيرِ بَصيرةٍ فَلْيَنظُرْ فى نَفْسِ المَسْئلةِ وليحكم بمايظنه، فلمعرفة مراتب الفضل ادلة غامضة ليس دركها من شأن العوام؟ وهذا سؤال واقع، ولكنا نقول من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كامتعديا مقصرا ضامنا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرًا فان كان فى البلد طبيبان فاختلفا فى الدواء فخالف الافضل عد مقصرا ويعلم فضل الطبيبين بتواتر الاخبار وباذعان المفضول له وبتقديمه بامارات تفيد غلبة الظن فكذلك فى حق العلماء، يعلم الافضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلوم، والعامى اهل له فلا ينبغى ان يخالف الظن بالتشهى، فهذا هو الاصح عندنا والاليق بالمعنى الكلى فى ضبط الخلق وبلجام التقوى والتكليف۔

১। মুক্তবুদ্ধির ডাক (উর্দু)

"যদি প্রশ্ন উঠে যে, সাধারণ মানুষের ফায়সালা যেহেতু ধারণানির্ভর সেহেতু বাহ্যিকতায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেক সময় সে অযোগ্যকে যোগ্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে। তবু যদি সে মুজতাহিদ নির্বাচনের অধিকার পেতে পারে তাহলে মূল বিষয়ে সরাসরি বিচারক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাকে দেয়া হবে না কেন? কেননা কারো ইলম ও প্রজ্ঞার মান অনুধাবনের জন্য যে সূক্ষ্ম দলিল প্রমাণের

প্রয়োজন তা বুঝতে পারা তো সাধারণ লোকের কর্ম নয়। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তবে আমাদের জবাব এই যে, চিকিৎসক না হয়েও অসুস্থ সন্তানের দেহে ঔষধ প্রয়োগ করলে নিঃসন্দেহে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হলে কোন অবস্থাতেই তাকে দায়ী করা হবে না। তবে শহরে দুজন চিকিৎসক থাকলে এবং ব্যবস্থাপত্রে মতদ্বৈততা দেখা দিলে তাকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসক না হয়েও একজন সাধারণ লোক যেভাবে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বেছে নেয় ঠিক সেভাবেই তাকলীদের ক্ষেত্রে তাকে শ্রেষ্ঠ আলিম বেছে নিতে হবে। চিকিৎসকের শ্রেষ্টত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভের উপায় হলো লোকমুখে সুখ্যাতি, এবং সাধারণ চিকিৎসকগণের শ্রদ্ধা ও অন্যান্য সূত্র। অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠ আলিমের ধারণা সে লাভ করবে লোকসুখ্যাতিসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে। এ জন্য ইলমের গভীরতা পরিমাপ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর এতটুকু ফায়সালা করার যোগ্যতা সাধারণ লোকের রয়েছে। সুতরাং কারো ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা লাভের পর প্রবৃত্তিবশতঃ তার তাকলীদ বর্জন করা কিছুতেই বৈধ নয়। আমাদের মতে আল্লাহর বান্দাদের শরীয়তের অনুগত রাখার এটাই সহজ ও নিরাপদ পন্থা।১

১। আল-মুস্তাসফা, খঃ২ পৃঃ ১২৬

তাকলীদ দোষের নয়

ইতিপুর্বে আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, ছাহাবাগণের মাঝেও তাকলীদের আমল বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ অমুজতাহিদ ছাহাবীগণ মুজতাহিদ ছাহাবার কাছ থেকে মাসায়েল জেনে নিয়ে সে মুতাবেক আমল করতেন। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে কেউ কেউ বলেছেন- তাকলীদ মূলতঃ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৈন্যই প্রমাণ করে। সুতরাং ছাহাবাগণের পুণ্যযুগে তাকলীদ বিদ্যমান ছিলো, দাবী করার অর্থ হলো, তাদের একাংশের মর্যাদা খাটো করে দেখা। প্রকৃতপক্ষে সকল ছাহাবা যেমন সমান সত্যাশ্রয়ী ছিলেন তেমনি ছিলেন সমান ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান।

আমাদের মতে কথাগুলো ভাবাবেগের সুন্দরতম প্রকাশ হলেও

বাস্তবনির্ভর নয় মোটেই। বস্তুতঃ ফকীহ মুজতাহিদ না হওয়া যেমন দোষের নয় তেমনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার জন্য ফকীহ বা মুজতাহিদ হওয়াও জরুরী নয়। কেননা তাকওয়াই হলো আল-কোরআনে বর্ণিত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। ইলম ও ফিকাহ নয়। সুতরাং তাকওয়ার মাপকাঠিতে যিনি যত উর্ধে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তিনি তত উঁচুতে। আর এই মাপকাঠিতে নবী রাসূলের পর ছাহাবাগণই হলেন মানব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ জামা'আত। তাই বলে এমন অবাস্তব দাবী করা সংগত নয় যে, সকল ছাহাবা ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন, এর পিছনে কোরআন সুন্নাহর বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। আল কোরআনের ইরশাদ শুনুন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التوبة)

"প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি উপদল দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কেন বেরিয়ে পড়ে না। যাতে ফিরে এসে স্বগোত্রীয়দের তারা সতর্ক করতে পারে। এভাবে হয়ত সকলে (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) বেঁচে যাবে।"

দেখুন; একদল ছাহাবাকে জিহাদে এবং আরেক দলকে ইলম সাধনায় নিয়োজিত করে স্বয়ং আল্লাহ তাঁদেরকে ফকীহ এবং গায়রে ফকীহ এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছেন।

আল-কোরআনের আরেকটি ইরশাদ-

لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

"যদি বিষয়টি তারা রাসূল ও 'উলিল আমর'গণের১ সমীপে পেশ করতো, তাহলে তাদের মধ্যে যারা বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন তারা এর মর্ম উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হতো।

এখানে ছাহাবাগণের একাংশকে ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ঘোষণা করে প্রয়োজনকালে অন্যদেরকে তাদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন এভাবে–

نَظَّرَ اللّٰه عَبْدًا سَمِعَ مقالتي فَحَفِظَهَا ووعَاهَا واَدّاها فرب حامل فقه غَيْرِفقيه ، ورب حامل فقه الى من هواَفقه منه -

আল্লাহ সদা সজীব রাখুন সে বান্দাকে যে আমার বাণী শুনলো এবং সংরক্ষণ করলো অতঃপর অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিলো। কেননা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার কোন কোন বাহক নিজে প্রজ্ঞাবান নয়। পক্ষান্তরে অনেকে নিজের চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দেয়।২

১। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।
২। মাসনাদে আহমদ, তিরমিযি ও অন্যান্য, যায়েদ বিন সাবেত থেকে বর্ণিত।

সাহাবাগণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য হাদীসের প্রত্যক্ষ সম্বোধন। সুতরাং এ সত্য দিবালোকের মতই পরিস্ফুট হয়ে গেলো যে, রাসূলের বাণীবাহক ছাহাবাগণের সকলে ফকীহ নন এবং তাদের জন্য তা দোষের নয়। কেননা নবীজী প্রাণভরে তাদের দোয়া দিয়েছেন।

বস্তুতঃ স্ব–স্ব স্তরে সকল ছাহাবাই নবীজীর সান্নিধ্য সৌভাগ্যে স্নাত হয়েছিলেন। আত্মসংশোধনের সাথে সাথে ইলমে নবুওত অর্জনে তৎপর ছিলেন সকলে। তবে সেখানে হযরত আবু বকর ও ওমরের মত বিশাল ব্যক্তিত্ব যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন হযরত আকরা বিন জালি এবং হযরত সালমাহ বিন সখরাহ এর মত শুভ্রহৃদয় বেদুঈন ছাহাবীও। একথা সত্য যে, ঈমান, ইখলাস ও তাকওয়ার বিচারে এবং ছাহাবীত্বের মর্যাদার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালের স্বনামধন্য মুজতাহিদগণ একজন সাধারণ বেদুঈন ছাহাবীর পদধুলিরও সমতুল্য হতে পারেন না। কিন্তু এইসূত্র ধরে সকল ছাহাবাকে হযরত আবু বকর, ওমর ও ইবনে মাসউদের মত ফকীহ ও মুজতাহিদগণের কাতারে দাঁড় করাতে চাইলে সেটা হবে বাস্তবতা বিবর্জিত। তাই যদি হতো তাহলে আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের হিসাব মতে এক লাখ চব্বিশ হাজার ছাহাবার মধ্যে মাত্র একশ ত্রিশজনের মত ছাহাবীর ফতোয়া ও ইজতিহাদ আমাদের হাতে পৌঁছবে কেন?

আর ছাহাবীত্বের মর্যাদা ও মহিমা কি এতই ঠুনকো যে, দ্বীন ও শরীয়তের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে তাকলীদ করতে গেলেই তা খাটো হয়ে যাবে? নাকি এ ধারণা ছাহাবা মানসের সাথে কোন দিক থেকেই সংগতিপূর্ণ? নবীজীর নূরানী সুহবতের কল্যাণে এ ধরনের মানবীয় ক্ষুদ্রতা থেকে তারা তো এতই পবিত্র ছিলেন যে, স্নেহাস্পদ ফকীহ তাবেয়ীগণকেও মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হতো না। সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আলকামা ছিলেন হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদের ছাত্র। অথচ বহু ছাহাবী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন।

মোটকথা, ছাহাবাযুগের তাকলীদ সম্পর্কে যে সব উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা পেশ করেছি সেগুলো ছাহাবা মর্যাদার অজুহাত তুলে অস্বীকার করা চোখের সামনে হিমালয়কে অস্বীকার করার চেয়ে কম বোকামিপূর্ণ নয়।

আধুনিক সমস্যা ও তাকলীদ

তাকলীদের বিরুদ্ধে সবচে' জোরালো যুক্তি এই যে, তাকলীদের 'অভিশাপ' থেকে মুক্ত হতে না পারলে বর্তমানকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশির্বাদ থেকে মুসলিম উম্মাহ বঞ্চিত হবে এবং সমস্যাসংকুল আধুনিক জীবন অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কেননা সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে উদ্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন সমস্যা। আর সেগুলোর ইসলামী সমাধান হাজার বছর আগের মুজতাহিদগণের কেতাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা রকেট-রোবটের যুগে উটের যুগের ফিকাহ অচল।

এককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিস্ময়কর অবদান সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ কেন আজ এত পশ্চাদপদ। ন্যায়, সাম্য ও শান্তির পতাকা হাতে যারা জয় করে নিয়েছিলো আধা-বিশ্ব তারাই কেন আজ বিশ্ব শক্তিগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের শিকার। পূর্বপুরুষগণের তরবারীর আঁচড়ে চিহ্নিত ভৌগলিক সীমা রেখাটা পর্যন্ত কেন তারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারলো না? সে বড় মর্মান্তিক প্রসংগ। এ সকল নির্মম প্রশ্ন মুসলিম উম্মাহর দরদী হৃদয়গুলোর ক্ষত থেকে আজো রক্ত ঝরাচ্ছে। এর জবাব বড় তিক্ত। বড় নগ্ন। তাই সে প্রসংগ সযত্নে পাশকেটে বন্ধুদের আমরা শুধু এ সান্তনা দিতে চাই যে, তাকলীদ কখনো মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় নয়।

বরং তাকলীদের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব সকল সমস্যার, সকল যুগজিজ্ঞাসার কোরআন–সুন্নাহভিত্তিক নির্ভুল সমাধান। কেননা তাকলীদে শাখছীর তৃতীয় স্তরে আমরা বলে এসেছি যে, মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের জন্য ইজতিহাদ ফিল মাসায়েলের অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে মুজতাহিদের ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত অনুপস্থিত সেখানে তিনি মুজতাহিদ নির্ধারিত উসূল ও মূলনীতিমালার আলোকে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে সিদ্ধান্ত আহরণ করবেন। ইজতিহাদ ফিল মাসায়েলের এ কল্যাণধারা সর্বদা অব্যাহত ছিলো। আজো আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং তাকলীদে শাখছী আধুনিক সমস্যা ও যুগজিজ্ঞাসার জবাব দিতে ব্যর্থ, এ ধারণা নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত।

তদুপরি সময় ও পরিবেশের ধারায় মুজতাহিদের যে সকল ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে পরামর্শ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সে সম্পর্কে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মাযহাবী আলিমগণের সবসময়ই আছে। এমনকি প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অন্য মুজতাহিদের মাযহাব অনুসরণ করেও ফতোয়া দেয়া যেতে পারে। হানাফী মাযহাবে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। যেমন কোরআন শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে হানাফী ফিকাহবিদগণ বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেছেন। তদ্রূপ নিখোঁজ স্বামী, পুরুষত্বহীন স্বামী এবং অত্যাচারী স্বামীর অসহায় স্ত্রীদের রক্ষা করার মতো সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা হানাফী মাযহাবে ছিল না। পরবর্তীকালে এটা একটা সামাজিক সমস্যার রূপ নেয়ায় হানাফী মুফতীগণ মালেকী মাযহাবের আলোকে ফতোয়া প্রদান করেছেন। এ প্রসংগে হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) বিরচিত الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة একটি অনবদ্য কীর্তি।

উম্মাহর সত্যিকার কোন সামাজিক প্রয়োজন কিংবা জটিল সমস্যার মুখে আজো মুতাবাহ্হির আলিমগণ চার ইমামের যে কারো ইজতিহাদ মুতাবেক ফতোয়া প্রদান করতে পারেন। তবে পরিপূর্ণ সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত আংশিক গ্রহণ করা যাবে না। বরং সংশ্লিষ্ট মযহাবের বিশেষ আলিমগণের পেশকৃত ব্যাখ্যা ও শর্তাবলীও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের জটিল ও স্পর্শকাতর

সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগত গবেষণা ও সিদ্ধান্তের উপর ভরসা না করে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য। নচেৎ সমস্যার কাটা–ডালের গোড়া থেকে হাজার সমস্যার নতুন শাখাই শুধু গজিয়ে উঠবে।

মোটকথা, যুগের সকল বৈধদাবী এবং মুসলিম উম্মাহর সকল সামাজিক প্রয়োজন পূরণে তাকলীদে শাখছী কোন অন্তরায় নয়। বরং তাকলীদের সুশৃংখল নিয়ন্ত্রণে থেকেও উপরোক্ত পন্থায় সচ্ছন্দে যে কোন সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে।১ পক্ষান্তরে তাকলীদের এই মজবুত নিয়ন্ত্রণ একবার ভেংগে গেলে মুসলিম উম্মাহর সমাজজীবনের সর্বত্র অবক্ষয়ের এমন সর্বনাশা ধ্বস নেমে আসবে যা রোধ করার ক্ষমতা আসমানের ফেরেশতাদেরও নেই।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন।
(ক) রাদ্দুল মুহতার, খঃ ২ পৃঃ ৫৫৬, (খ) ফাতাওয়া আলমগীরী, কিতাবুল কাযা, বাবে ছামেন, খঃ৩ পৃঃ২৭৫ (গ) আল–হিলাতুন নাজিযাতু (ঘ) ফায়যুল কাদীর শরহে জামে সগীর, খঃ১ পৃঃ ২১০

হানাফী মাযহাবে হাদীসের স্থান

হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে বহুল আলোচিত একটি অভিযোগ এই যে, তাদের অনুকূল হাদীসগুলো নিতান্ত দুর্বল। এ ভিত্তিহীন অভিযোগ মূলতঃ অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার রুগ্ন ফসল। এর জবাবে আমরা শুধু হানাফী মাযহাবের নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ পড়ে দেখার অনুরোধ জানাতে পারি।

১। তাহাবী শরীফ ২। ফাতহুল কাদীর, ইবনে হুমাম কৃত ৩। নাসবুর রায়াহ, যায়লায়ী কৃত ৪। আল জাওহার, নাকী মারদীনী কৃত ৫। উমদাতুল কারী, আল্লামা আয়নী কৃত ৬। ফাতহুল মুলহিম, আল্লামা উসমানী কৃত ৭। বাযলুল মাজহুদ ৮। ইলাউস সুনান, আল্লামা যাফর আহমদ কৃত ৯। মা'আরেফুস সুনান, আল্লামা বিন্নোরী কৃত। ১০। ফায়জুলবারী শরহে সাহীহুল বুখারী।

তবে এখানে মৌলিকভাবে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

১। হাদীস বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হলো সনদ বা সূত্র। সুতরাং উসূলে হাদীসশাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতিমালার আলোকে কোন হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বুখারী বা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়নি, শুধু এই কারণে কোন হাদীস দুর্বল বা বর্জনীয় হতে পারে না। কেননা হাদীসশাস্ত্রের আরো অনেক বরেণ্য ইমাম হাদীস সংকলনের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের সংকলিত বহু হাদীস সনদ ও সূত্রগত বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারী, মুসলিমের চেয়ে উন্নতমানের প্রমাণিত হয়েছে। এ মৌলিক কথাটি হৃদয়ংগম হলে দেখবেন, হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে উথাপিত স্থুল ব্যক্তিদের অনেক অভিযোগেরই জবাব আপনি পেয়ে গেছেন।

২। ইমাম ও মুজতাহিদগণের মতানৈক্যের পিছনে বুনিয়াদী কারণ এই যে, বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই উসূল ও মূলনীতি আলাদা ও সতন্ত্র। মনে করুন, বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট বিপরীতমুখী দুটি হাদীস পাওয়া গেল; এমতাবস্থায় এক মুজতাহিদ সনদ ও সূত্রগত বিচারে বিশুদ্ধতম হাদীসটি গ্রহণ করে দ্বিতীয় হাদীসটি বিশুদ্ধ হলেও তা এড়িয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে অন্য মুজতাহিদ উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধানের জন্য এমন সংগতি পূর্ণ ব্যাখ্যা দিবেন যাতে বৈপরীত্ব দূর হয়ে উভয় হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব হয়। এ জন্য প্রয়োজন হলে বিশুদ্ধ হাদীসটিকে মূল ধরে বিশুদ্ধতম হাদীসটির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা নেই। আবার কোন কোন মুজতাহিদ হয়ত দেখতে চাইবেন ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের আমল কোন হাদীসের উপর ছিলো। সেটাকে মূল ধরে অন্য হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখার আশ্রয় নিবেন।

মোটকথা; যুক্তি প্রয়োগের এই স্বাতন্ত্র্যই ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে মতানৈক্যের কারণ। সুতরাং কোন ইমামের বিরুদ্ধেই বিশুদ্ধ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগ আরোপ করার কোন অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার উসূল ও মূলনীতি এই যে, বিপরীতমুখী হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয়বিধানের মাধ্যমে সবকটি হাদীসের উপরই যথাসম্ভব আমল করতে হবে। তার মতে সনদ ও সূত্রগত বিচারে কিঞ্চিত পিছিয়ে পড়া হাদীসও এড়িয়ে

যাওয়া উচিত নয়। এবং বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে বিরোধ না ঘটলে (সনদের বিচারে) দুর্বল হাদীসের উপরও অবশ্যই আমল করতে হবে। এমনকি তা কিয়াস ও যুক্তিবিরোধী (মনে) হলেও।

৩। হাদীসের দুর্বলতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের বিষয়টিও মূলতঃ ইজতিহাদনির্ভর। তাই দেখা যায়; এক ইমামের দৃষ্টিতে যে হাদীস বিশুদ্ধ বা উত্তম অন্য ইমামের দৃষ্টিতে সেটাই বিবেচিত হচ্ছে দুর্বল বা বর্জনীয় রূপে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফার বিচারে যে হাদীস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে সেটাই অন্য ইমামের দৃষ্টিতে দুর্বল প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নিজেই একজন উঁচু দরের মুজতাহিদ হওয়ার কারণে অন্য কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য নন।

৪। এমন হতে পারে যে, বিশুদ্ধসূত্রে একটি হাদীস পেয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সে মুতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার কারণে পরবর্তী ইমামগণ সেটা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় পরবর্তী বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার দায়দায়িত্ব কোন অবস্থাতেই ইমাম আবু হানিফার উপর বর্তায় না।

৫। এমনো হতে পারে যে, দুর্বল ও বিশুদ্ধ দু'টি সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হলো, এমতাবস্থায় যে মুহাদ্দিস শুধু দূর্বল সূত্রটির খোঁজ পাবেন তাঁর বিচারে হাদীসটি দুর্বল হলেও যার কাছে উভয় সূত্রের খোঁজ আছে তিনি কোন যুক্তিতে হাদীসটি এড়িয়ে যাবেন?

৬। কোন দুর্বল হাদীস বহু সনদে বর্ণিত হলে সবকটি সনদের সম্মিলিত শক্তির ফলে মুহাদ্দিসগণের বিচারে তা যয়ীফ থেকে উন্নীত হয়ে হাসান লি গায়রিহী (পার্শ্বকারণে উত্তম) এর অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের হাদীস যয়ীফ বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয় এবং তার উপর আমল করাটাও দোষণীয় নয়।

৭। কোন হাদীসকে যয়ীফ বলার অর্থ এই যে, সনদের (এক বা একাধিক) বর্ণনাকারী দুর্বল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দুর্বল বর্ণনাকারী ভুল হাদীসই কেবল রেওয়ায়েত করে থাকেন। বরং দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসের অনুকূলে মজবুত পার্শ্বসমর্থক পাওয়া গেলে সে হাদীস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন,

বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে কোন হাদীসকে যয়ীফ বা দুর্বল ঘোষণা করা হলো, অথচ দেখা গেল; ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সে হাদীসের উপর অব্যাহতভাবে আমল করে এসেছেন। তখন এই মজবুত পার্শ্বসমর্থনের কারণে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও এ ক্ষেত্রে কোন ভুল করেননি। বিশুদ্ধ হাদীসই তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। لاوصية لوارث হাদীসটি মুজতাহিদগণের বিচারে একারণেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের দুর্বল হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের মুকাবিলায় অগ্রাধিকারও দাবী করতে পারে। নবী-কন্যা হযরত যয়নবের ঘটনায় দেখুন, তাঁর স্বামী আবুল আছ প্রথমে অমুসলিম ছিলেন। পরে মুসলমান হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন মোহরানা নির্ধারণ করে তাঁদের বিবাহ নবায়ন করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে সাবেক বিবাহই বহাল রাখা হয়েছিল। প্রথম রেওয়ায়েতটি সনদের বিচারে যয়ীফ এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ। অথচ ইমাম তিরমিযীর মত শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসও ছাহাবা-তাবেয়ীগণের অব্যাহত আমলের যুক্তিতে প্রথম হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।১

ইমাম আবু হানিফাও যদি এ ধরনের মজবুত সমর্থনপুষ্ট যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন তাহলে দোষটা কোথায়?

৮। ইমাম আবু হানিফার নীতি ও অবস্থানের সঠিক উপলব্ধির অভাবে অপটু লোকেরা অনেক সময় এই বলে সমালোচনা জুড়ে দেন যে, ইমাম সাহেব হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। দু' একজন নামী দামী আলেমও এ দুঃখজনক ভুল করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সলফী (রঃ) ইমাম আবু হানিফার সমালোচনায় লিখেছেন-

---

১। তিরমিযি কিতাবুন্নিকাহ, এ উদাহরণ ইমাম তিরমিযির মতামতের ভিত্তিতে। হানাফীদের মতামত অবশ্য কিছুটা ভিন্ন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বেদুইন ছাহাবী নবীজীর সামনেই একবার সালাতে দাঁড়ালেন এবং তাড়াহুড়া করে রুকু সিজদা আদায় করলেন। আল্লাহর রাসূল তখন পর পর তিনবার তাকে সালাত দোহরানোর নির্দেশ দিয়ে

বললেন, قم وصل فانك لم تصلى তুমি আবার সালাত পড়ো তোমার সালাত হয়নি। (অঙ্গ সঞ্চালনই সার হয়েছে) কিন্তু তৃতীয় বারও তিনি তাড়াহুড়া করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল তাকে সালাত শিক্ষা দিলেন। হাদীসের আলোকে আহলে হাদীস ও শাফেয়ী মাযহাব মতে সালাতের রুকু সিজদায় ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা ফরজ। অন্যথায় সালাত শুদ্ধ হবে না। অথচ হানাফীরা নূন্যতম পরিমাণে রুকু–সিজদা আদায় হলেই সালাত শুদ্ধ বলে চালিয়ে দেয়।১

অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে যে, এখানে হানাফী মাযহাবের ভুল পরিবেশন হয়েছে। কেননা আলোচ্য হাদীসের আলোকেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাড়াহুড়াপূর্ণ সালাতকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব বলেছেন। সুতরাং একটি বিশুদ্ধ হাদীস তিনি উপেক্ষা করেছেন। এমন অপবাদ দেয়া কিছুতেই মার্জনীয় হতে পারে না।

আসল ব্যাপার এই যে, ইমাম আবু হনিফা (রঃ) এর মতে ফরজ ও ওয়াজিবের মাঝে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের মতে উভয় পরিভাষায় গুণগত কোন পার্থক্য নেই। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, নামাজের যে সকল আহ্কাম কোরআন কিংবা মুতাওয়াতির হাদীস (মজবুত ধারাবাহিকতাপুষ্ট হাদীস) দ্বারা সুপ্রমাণিত সেগুলোর ক্ষেত্রেই শুধু 'ফরজ' শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি আহকামগুলো ফরজের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে খবরে ওয়াহিদ২ দ্বারা প্রমাণিত আহকামগুলো ওয়াজিব নামে অভিহিত হবে। অবশ্য আমলের ক্ষেত্রে ফরজ ও ওয়াজিব উভয়ই সমমর্যাদার অধিকারী। সুতরাং যে কোন একটি তরক হলেই পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। তবে নীতিগত পার্থক্য এই যে, ফরজ তরককারীকে সালাত তরককারী বলা হবে। কিন্তু ওয়াজিব তরককারীকে সালাত তরককারী নয় বরং সালাতের একটি ওয়াজিব তরককারী বলা হবে। অর্থাৎ নামাজের ফরজ দায়িত্ব তো আদায় হয়ে যাবে। তবে বড় ধরনের খুঁত থেকে যাওয়ায় পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। বলাবাহুল্য যে, ইমাম আবু হানিফার এ বক্তব্য হাদীসের মূল ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাছাড় হাদীসের শেষাংশে এ বক্তব্যের প্রতি জোরালো সমর্থনও রয়েছে।

১। তাহরীকে আযাদীয়ে ফিক্র পৃঃ ৩২

২। যে সনদের প্রথম তিন স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা একাধিক নয়।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, উপস্থিত ছাহাবাগণের মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (صل فانك لم تصل) নির্দেশটি গুরুশাস্তি মনে হলো। কেননা সালাতে তাড়াহুড়াকারীকে সালাত তরককারী বলা হয়েছে। কিন্তু পরে উক্ত ছাহাবীকে সালাতের বিশুদ্ধ তরীকা শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদীলে আরকান[১] সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করলেন-

فَاذ فعلت ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ وَإِنْ انتقصت مِنْهُ شَيْئًا انتقصت مِنْ صَلَاتِكَ -

যদি তুমি এভাবে তোমার সালাত আদায় করো তাহলে তা পূর্ণাংগ হলো। পক্ষান্তরে এতে কিঞ্চিত পরিমাণ ত্রুটি হলে তোমার সালাতও সেই পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ হবে।

হাদীস বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত রিফা'আ বলেন, ছাহাবাগণের কাছে এটা পূর্ববর্তী নির্দেশের তুলনায় সহজ মনে হলো। কেননা (তাদীলে আরকানের) ত্রুটির কারণে সালাত ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা বাতিল গণ্য হয়নি। দেখুন; হাদীসের আগাগোড়া বক্তব্যের সাথে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর সিদ্ধান্তটি কি চম-ৎকার সংগতিপূর্ণ। এক দিকে তিনি হাদীসের প্রথমাংশ বিবেচনা করে তাদীলে আরকান তরক করার কারণে পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অন্যদিকে হাদীসের শেষাংশ বিবেচনা করে তিনি বলেছেন, তাদীল তরক করার কারণে সালাত ত্রুটিপূর্ণ হলেও তাকে সালাত তরককারী বলা যাবে না কিছুতেই। হাদীসের আলোকে এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও যদি হাদীসের বিরুদ্ধাচরণের অপবাদ শুনতে হয় তাহলে হয় এটা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দুর্ভাগ্য কিংবা অভিযোগকারীর জ্ঞানের দৈন্য।

উপরে আলোচিত মৌলিক কথাগুলো হৃদয়ংগম করে নিয়ে হানাফী মাযহাবের দলিলসমূহ পর্যালোচনা করা হলে দৃঢ় আস্থার সাথে আমরা বলতে পারি যে, যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি ও অভিযোগ-সন্দেহের নিরসন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ মুজতাহিদ হিসাবে ইমাম আবু হানিফার যে কোন ইজতিহাদের সাথে

১। রুকু সিজদার সকল আরকান ধীরে স্থিরতার সাথে আদায় করা।

ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার মুজতাহিদগণের অবশ্যই আছে। কিন্তু ঢালাওভাবে তাঁর সকল দলিল ও সিদ্ধান্ত দুর্বল বলে উড়িয়ে দেয়া কিংবা 'কিয়াস প্রেমিক' বলে চুটকি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ।

বিভিন্ন মাযহাবের বহু গবেষক আলিম ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইজতিহাদী প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও ভারসাম্যপূর্ণ বিচারশক্তির উদার প্রশংসা করেছেন। তাঁর সুউচ্চ মরতবার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখানে আমরা শাফেয়ী মাযহাবের সর্বজনমান্য আলেম এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের স্বীকৃত ইমাম হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (রঃ) মতামত তুলে ধরছি। নিজে হানাফী না হলেও ইমাম আবু হানিফার (রঃ) স্থূলদর্শী সমালোচকদের তিনিও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী বলে মনে করেন। এমনকি স্বরচিত "আল্ মিযানুল কোবরা" গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)এর পক্ষসমর্থনেই শুধু ব্যয় করেছেন। তাঁর ভাষায়–

"সকলকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আগামী অধ্যায়গুলোতে ইমাম আবু হানিফার পক্ষসমর্থনে আমি যা বলেছি তা নিছক অন্ধঅনুরাগ নয়। নয় কল্পনাশ্রয়ী সুধারণানির্ভর। অনেকে অবশ্য এমন করে থাকে। আমি বরং প্রামাণ্য সকল তথ্যপঞ্জী আগাগোড়া অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং সুক্ষ্ম বিচার–বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েই কলম হাতে তুলেছি। মুজতাহিদগণের মাঝে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবই সর্বপ্রথম সুসংঘবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছে। আহলে কাস্‌ফ১ অলিগণের মতে তাঁর মাযহাবের বিলুপ্তিও ঘটবে অন্যান্য মাযহাবের পরে। ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাবগুলোর দলিল সংগ্রহ ও গ্রন্থবদ্ধ করার সময় আমি ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গভীর মনোনিবেশ সহ যাচাই করে দেখেছি। এ কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই যে, তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের সকল সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার উৎস হলো কোরআন–সুন্নাহ কিংবা ছাহাবাগণের আমল। অতঃপর বহু সনদসূত্রে বর্ণিত কোন যয়ীফ হাদীস। সবশেষে তিনি উপরোক্ত দলিল সমূহের আলোকে বিশুদ্ধ কিয়াস প্রয়োগ করেন। এ ব্যাপারে যারা সরেজমিনে জ্ঞানলাভে আগ্রহী তাদের আমি আমার এ কিতাব পড়ে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি।

হাদীসের মোকাবেলায় কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানের অভিযোগ খণ্ডন করে আল্লামা শা'রানী লিখেছেন–

ইমাম সাহেবের প্রতি বিদ্বেষবশতঃই এ ধরনের অভিযোগ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত ধর্মবিমুখ লোকদের আমি কোরআনের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই; "হৃদয়, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কেও কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হবে।"

অতঃপর তিনি একটি চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

১। ঐশী প্রদত্ত অন্তর্জ্ঞান।

"হযরত সুফিয়ান সাওরী, মুকাতিল, ইবনে হাইয়ান, হাম্মাদ বিন সাল্‌মা ও হযরত জাফর সাদিক একবার ইমাম আবু হানিফার সাথে দেখা করে তাঁর বিরুদ্ধে কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানের অভিযোগ উথাপন করলেন। তদুত্তরে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) দৃঢ়তার সাথে বললেন; অথচ কোরআন সুন্নাহ তো বটেই এমনকি ছাহাবাগণের আমল ও ফতোয়ার পরে আমি কিয়াস প্রয়োগ করে থাকি। অতঃপর সকাল থেকে পুর্বাহ্ন পর্যন্ত তিনি তাদের সামনে নিজের ইজতিহাদ পদ্ধতি সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করলেন। অবশেষে বিমুগ্ধ ইমামগণ সলাজ অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন।

"সত্যি আপনি আলেমকূল শিরোমণি! অজ্ঞতাবশতঃ এযাবত আমরা যা বলেছি অনুগ্রহ করে তা ক্ষমা করবেন।"

অন্য এক অধ্যায়ে সুদীর্ঘ বিচার পর্যালোচনার মাধ্যমে আল্লামা শা'রানী প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর সতর্কতা ও সংযমনির্ভর। তিনি বলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি তাঁর মাযহাব পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তিনি চূড়ান্ত সতর্কতা, সংযম ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছেন।

এখানে শুধু নমুনা পেশ করা হলেও আসলে তাঁর গোটা আলোচনাটাই পড়ে দেখারমতো।১

১। দেখুন– আল–মিযানুল কোবরা, খঃ ১, পৃঃ ৭–১৩

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর বিরুদ্ধে আরেকটি হাস্যকর অভিযোগ এই যে, হাদীসশাস্ত্রে তিনি দুর্বল ছিলেন, এবং তার হাদীস সংগ্রহও ছিলো নগণ্য।

বলাবাহুল্য যে, বরাবরের মত এ অভিযোগের উৎসও হচ্ছে অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা। অন্যথায় সকল মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় গবেষক আলিমগণই ফিকাহশাস্ত্রের ন্যায় হাদীসশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শীর্ষমর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখানে আমরা বেছে বেছে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরবো।

১। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন–ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যু সংবাদ শুনে হযরত ইবনে জরীহ (রঃ) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন। আহ! ইলমের কি এক অফুরন্ত খনি আজ আমাদের হাতছাড়া হলো।১

ফিকাহ ও হাদীসশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা ইবনে জরীহ হলেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মাযহাবের প্রধানতম সংকলক।

২। মক্কী বিন ইবৃরাহীম (রঃ) হলেন হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বোখারী (রঃ) এর অন্যতম উস্তাদ। 'তিন বর্ণনাকারী' বিশিষ্ট সনদের হাদীসগুলোর অধিকাংশই ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এই মক্কী বিন ইব্রাহীম ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কৃতার্থ ছাত্রদের একজন। স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন–

"তিনি তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠতম আলিম ছিলেন।২

১। তাহযীবুত্তাহযীব খঃ১, পৃঃ ৪৫০। ২। তাহযীবের টীকা খঃ১, পৃঃ ৪৫১।

উল্লেখ্য, মুতাকাদ্দিমীন তথা প্রাচীনদের পরিভাষায় 'ইলম' মানেই হলো 'ইলমুল হাদীস'। সুতরাং উপরোক্ত স্বীকৃতিসমূহ 'ইলমুল হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩। সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের প্রথম ইমাম হযরত শো'বা বিন হাজ্জাজকে গোটা ইসলামী উম্মাহ শ্রদ্ধাভরে উপহার দিয়েছে 'আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদীস'র সম্মানজনক উপাধি। ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো–'আল্লাহর কসম! অতি উত্তম বোধ ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি।' ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হযরত শো'বা (রঃ) যে অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করেছিলেন তা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

"হায়! ইলমের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা আজ কুফায় নির্বাপিত হলো। ইমাম আবু হনিফার মতো ব্যক্তির দেখা এরা আর পাবে না।"১

৪। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আবু হানিফা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম।২

৫। সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন বলেছেন, আবু হানিফা আস্থাভাজন ছিলেন। পূর্ণ দায়িত্বের সাথেই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন।

তিনি আরো বলেছেন–"হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা আস্থাভাজন ছিলেন। এ ছাড়া ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন হযরত ইয়াহইয়া ইবেন দাউদ আল কাত্তানের এ স্বীকৃতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন– 'তার অধিকাংশ মতামত আমি অনুসরণ করেছি।"

১। আল–খায়রাতুল হিসান, ইবনে হাজার কৃত, পৃঃ ৩১। ২। তাহযীব, খঃ পৃঃ ৪৪৫
৩। তাযকিরাতুল হোফফায, যাহাবী কৃত, খঃ১ পৃঃ ১১০

আরেকবার হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনকে প্রশ্ন করা হলো– হাদীসশাস্ত্রে আবু হানিফা কি আস্থাভাজন ব্যক্তি? সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন সংশয় আঁচ করতে পেরে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন–হাঁ, অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন! অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন।১

১। مناقب الامام الاعظم للموفق ج/١ ص/١٩٢

বস্তুতঃ ইমাম সাহেবের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও শতমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সমসাময়িক ও পরবর্তি গবেষক আলিমগণের মতামত ও মন্তব্য বিস্তৃত আকারে তুলে ধরতে গেলে এক বৃহৎ সংকলনেরই প্রয়োজন হবে। এমনকি শুধু হাদীসশাস্ত্রে তার মহান অবদান প্রসংগে এ পর্যন্ত আরবী ও উর্দুতে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।১ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলছি– ইমাম সাহেব হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বৈপ্লবিক গ্রন্থ কিতাবুল আছার এমন এক সময় প্রণয়ন করেন যখন হাদীসশাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোরও২ অস্তিত্ব ছিলো না। প্রায় চল্লিশ হাজার সংগৃহীত হাদীস থেকে চয়ন করে এ গ্রন্থটি তিনি সংকলন করেন।৩ এ ছাড়া বিশিষ্ট মুহাদ্দীসগণ ইমাম সাহেবের নামে সতেরটি 'মুসনাদ' গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। কলেবরের দিক থেকে এর একটি সুনানে শাফেয়ীর চেয়ে ছোট নয়। ইমাম সাহেবের মুসনাদ সংকলকদের মধ্যে হাফেজ ইবনে আদ (রঃ) এর মতো সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সমালোচকও রয়েছেন। প্রথম দিকে ইমাম সাহেবের প্রতি তাঁর ধারণা খুব একটা প্রসন্ন ছিলো না। কিন্তু পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে অতীত আচরণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইমাম সাহেবের মুসনাদ সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

---

১ ইমাম আবু হানিফা আওর ইলমে হাদীস, কৃত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কন্দেলবী।

২। যথা مصنف ابن ابی شیبه ، مصنف عبد الرزاق موطا امام مالك ইত্যাদি।

৩। مناقب الامام الاعظم ج/١ ص/৭৫ ।

এ প্রসংগে অধিক বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা সুপ্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাছান খান (রঃ) এর বক্তব্য পরিবেশনের মাধ্যমে এ প্রসংগের সমাপ্তি টানতে চাই। নওয়াব সাহেবের ভাষায়–

"ইমাম আবু হানিফা (রঃ) একজন ধর্মনিষ্ঠ, ইবাদতগুজার ও নির্মোহ আলেম ছিলেন। আল্লাহভীতি ছিলো তাঁর বড় গুণ আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা ছিলো তাঁর প্রিয় আমল।"

ইমাম সাহেবের মহোত্তম চরিত্র ও গুণাবলীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করা পর তিনি লিখেছেন–

"তিনি ছিলেন অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী। আল্লামা খতীবে বোগদাদী (রঃ) তারীখে বোগদাদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অবশ্য সেই সাথে এমন দু'একটি আপত্তিজনক কথাও তিনি লিখেছেন যা না লিখলেই ভালো করতেন। কেননা তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ইমামের তাকওয়া ও ধার্মিকতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশই নেই। বস্তুতঃ আরবী ভাষায় দুর্বলতা ছাড়া তাঁর অন্য কোন দোষ ছিলো না।১

১। التاج المكلل ص/١٣٦ - ١٣٨।

দেখুন, আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে "আরবী ভাষায় দুর্বলতা"র কথা বললেও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বলতা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ মেনে নিতে কিছুতেই রাজি নন। তাঁর মতে এমনকি সেটা কলমের আঁচড়ে উল্লেখ করাও আপত্তিজনক। নওয়াব সাহেবের 'আত্তাজুল মুকাল্লাল' গ্রন্থটি মূলতঃ হাদীস বিশেষজ্ঞগণের জীবনী সংকলন। গ্রন্থের শুরুতেই সে সম্পর্কে আগাম ঘোষণা দিয়ে তিনি লিখেছেন "এ গ্রন্থে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ই শুধু আলোচনা করা হবে" সুতরাং বলাবাহুল্য যে, হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসাবেই ইমাম সাহেবকে তিনি তার গ্রন্থে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন।

বাকি রইল আরবী ভাষায় দুর্বলতার চমকপ্রদ অভিযোগ। ভাষা ও বর্ণনা ভংগির সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, খান সাহেব ইবনে খাল্লেকান থেকেই এটা নিয়েছেন। কিন্তু ইবনে খাল্লেকান কথিত অভিযোগের ভিত্তি উল্লেখ করলেও নওয়াব সাহেব তা এড়িয়ে গেছেন। আমরা তা এখানে তুলে ধরছি। ইবনে খাল্লেকানের মতে, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ আবু আমর ইবনুল আলা একবার ইমাম আবু হানিফার কাছে 'প্রায় ইচ্ছাকৃত' হত্যা সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব নিজস্ব ইজতিহাদ মুতাবেক ফতোয়া দিয়ে বললেন, এতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। আবু আমর আবার জিজ্ঞাসা করলেন– "ولوقتله بالمنجنيق" ইমাম সাহেব দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন– ولوضربه باباقبيس

শেষোক্ত বাক্যটিই হচ্ছে অভিযোগের উৎস। কেননা ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ولوضربه بابى قبيس বলাই সংগত ছিলো। ইমাম আবু হানিফার গোটা জীবন চষে এই একটি ঘটনাই অভিযোগকারীদের হাতে এসেছে এবং তাই সম্বল করে তারা আসমান মাথায় তুলে ছেড়েছে। আল্লাহর বান্দারা তখন এ কথাটুকু ভেবে দেখারও ফুরসত পায়নি যে, কোন কোন আরব গোত্র এ শব্দটা এভাবেই বলে থাকে। যেভাবে ইমাম সাহেব বলেছেন। কাযী ইবনে খাল্লেকান নিজেও অভিযোগ খণ্ডন করে লিখেছেন–

فم ، اب ، اخ ইত্যাদি শব্দগুলোকে কোন কোন আরব গোত্র সর্বদা الف সহযোগেই উচ্চারণ করে থাকে। ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সুতরাং সেটা অশুদ্ধ নয়। আরব কবির ভাষায়

فان اَبَاهَا وَابا اباها ۞ قَدْ بَلَغَا فى المَجْدِ غايَتَاهَا۔

(তার পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্যের শীর্ষ শিখরে)

দেখুন, আরব কবি "اباها" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন অথচ আরবী ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে ابيها হওয়াই সংগত ছিলো।

আল্লামা ইবনে খাল্লেকানের মতে "কুফাবাসীরা এভাবেই বলে থাকে, আর ইমাম আবু হানিফা তো কুফারই সন্তান।"১

সুতরাং এরূপ মনে করা কিছুতেই সংগত হবে না যে, ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে "আরবী ভাষায় দুর্বলতার অভিযোগ উত্থাপনকারীদের" আরবী ভাষাজ্ঞান প্রশ্নাতীত নয়।

১। وفيات الاعيان لابن خلكان ج/٢/ص ١٦٥ ۔

অন্ধতাকলীদ

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, তাকলীদ বর্জন করে শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়া যেমন জঘন্য অপরাধ তেমনি তাকলীদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করাও সমান নিন্দনীয় অপরাধ। সীমালংঘনের অর্থ–

১। ইমাম ও মুজতাহিদকে আইন প্রণয়ন ও আইন রহিতকরণের অধিকারী মনে করা কিংবা নবী রাসূলের মত তাদেরকেও মাসুম ও ভুল–বিচ্যুতির উর্ধে মনে করা।

২। কোন বিশুদ্ধ হাদীসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে, ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ, তাশাহুদের সময় শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা অনেক সহী হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। অথচ অনেক মুর্খ শুধু এই যুক্তিতে তা অস্বীকার করে থাকে যে, ইমাম আবু হানিফা এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেননি। বস্তুতঃ এ ধরনের অন্ধতাকলীদেরই নিন্দা করা হয়েছে কোরআন–সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে।

৩। ইমামের মাযহাবকে নির্ভুল প্রমাণিত করার জন্য হাদীসের এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা করা, যা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষেই স্বীকার করা সম্ভব নয়। অবশ্য এটা প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা–পদ্ধতির ব্যাপার । তাই একজন যদি হাদীসের কোন একটি ব্যাখ্যায় আশ্বস্ত হয় আর অন্যজন তা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন কারো পক্ষেই অন্যকে আক্রমণের ভাষায় কথা বলা সংগত নয়।

৪। একজন বিজ্ঞ আলেম (متبحر في المذهب) যখন ইমামের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্থীর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তা অমুক সহী হাদীসের পরিপন্থী এবং ইমামের উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আকড়ে ধরে রাসূলের হাদীসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধতাকলীদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে "বিজ্ঞ আলিমের তাকলীদ" অধ্যায়ে করা হয়েছে।

৫। তদ্রূপ এমন ধারণা পোষণ করাও অন্যায় যে, আমার ইমামের মাযহাবই অভ্রান্ত এবং অন্যান্য ইমামের মাযহাব অবশ্যই ভ্রান্ত। বরং এ ধারণা পোষণ করা উচিত যে, আমার ইমামের সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ সঠিক তবে ভুল হওয়া বিচিত্র নয় এবং অন্যান্য ইমাম সম্ভবতঃ ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। তবে হতে পারে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। বস্তুতঃ সকল মুজতাহিদই ইজতিহাদের নির্দিষ্ট সীমায় থেকে কোরআন সুন্নাহর সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের প্রতি এটাই ছিলো নির্দেশ। সে নির্দেশই পালন করেছেন সকলে। সুতরাং সকল মাযহাবই হকপন্থী। কোন ক্ষেত্রে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলেও আল্লাহর কাছে তিনি দায়িত্বমুক্ত। উপরন্তু সত্য লাভের মহৎ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ মুজতাহিদ স্বতন্ত্র পুরস্কার লাভ করবেন। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

৬। ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদগত মতপার্থক্যকে অতিরঞ্জন করে পেশ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা তাঁদের অধিকাংশ মতপার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তমবিষয়ক। জায়েজ–নাজায়েজ বা হালাল–হারাম বিষয়ক নয়। যেমন ধরুণ; রুকুর সময় হাত তোলা হবে কিনা। বুক বরাবর হাত বেঁধে দাঁড়ানো হবে না নাভি বরাবর। আমীন মৃদুস্বরে বলা হবে না উচ্চস্বরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় অবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন মুজতাহিদেরই দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য শুধু এই নিয়ে যে, এ' দুয়ের মধ্যে উত্তম কোনটি? সুতরাং ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মাহর মাঝে অনৈক্য ও অসম্প্রীতির বীজ বপন করা কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

৭। ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হারাম–হালাল বা জায়েজ–না জায়েজের পার্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে মনের অনৈক্যে রূপান্তরিত করা এবং সংঘাত সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়া কোন ইমামের মতেই বৈধ নয়। বস্তুতঃ ইমামগণের সকল মতপার্থক্যই ছিলো একাডেমিক বা তাত্ত্বিক পর্যায়ের, ব্যক্তি পর্যায়ের নয়। প্রত্যেক ইমাম অপরের ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে কেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের মাঝে কি অপূর্ব সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো আজ তা

ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদেরও পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের সে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুসরণ করা উচিত। এ প্রসংগে আল্লামা শাতেবী বড়ো মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। (দেখুন - الموافقات للشاطبي ج/٤/ص/٢٢٠)

শেষ আবেদন

এ পর্যন্ত আমরা তাকলীদ ও ইজতিহাদের হাকীকত ও তাৎপর্য–সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং আশা করি আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণায় আমরা আমাদের এ বিনীত প্রচেষ্টায় কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও সফলকাম হয়েছি। বিদায়ের মুহূর্তে বিনয়–নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে আরয করতে চাই যে, বিতর্কের মজলিস উত্তপ্ত করা কিংবা প্রতিপক্ষ রূপে কাউকে ঘায়েল করা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে উম্মতের গরিষ্ঠ অংশের (যারা চার ইমামের কারো না কারো মুকাল্লিদ) অবস্থান ও মতামত প্রমাণ ও তথ্যের নিরিখে তুলে ধরা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও যদি কলমের বিচ্যুতি ঘটে থাকে এবং তাতে কারো অনুভূতি সামান্যও আহত হয়ে থাকে তাহলে সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত এবং ক্ষমাসুন্দর প্রতি উত্তরের প্রত্যাশী।

আবারও বলছি; আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, প্রমাণ ও তথ্যের নিরিখে মুসলিম উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের অবস্থান ও মতামত তুলে ধরা এবং তাকলীদ সম্পর্কে বিদ্যমান ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করা।

এ আলোচনার পরও হয়ত মতপার্থক্য থেকে যাবে। তবে বিবেক ও শুভবুদ্ধির দুয়ারে এ প্রত্যাশা আমরা অবশ্যই করবো যে, দ্বীন ও শরীয়তের নিঃস্বার্থ সেবক, ইমাম ও মুজতাহিদগণের প্রতি বিভিন্ন প্রকারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা থেকে সবাই বিরত হবেন। সুপ্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি পরিবেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনার ইতি টানতে চাই। حلب المنفعت

"আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা এই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত (রাসূলুল্লাহ ও ছাহাবা প্রদর্শিত পথ অনুসরণকারী দল)–কেই শুধু আমি মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত বলে বিশ্বাস করি। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী কিংবা আহলে হাদীস কারো সম্পর্কেই মন্দ ধারণা পোষণ করি না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, উপরোক্ত ইমামগণের প্রত্যেকের মাযহাবেই দলিলসম্মত ও দলিলবিরুদ্ধ উভয় প্রকার মাসায়েল রয়েছে। তবে অধিকাংশের প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। কোন কোন হাদীসের উপর আমল করা থেকে ইমামগণ যে বিরত ছিলেন তারও কিছু যুক্তিসংগত কারণ ছিলো।

গ্রন্থে তা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী ইমামগণের বিরুদ্ধে সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগ উত্থাপন করা একান্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ বলে আমি মনে করি। অবশ্য কোন বিষয় কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা ইমামের সিদ্ধান্ত আকড়ে ধরে তাকলীদ অব্যাহত রাখেন তাদের আমি ভুলের শিকার মনে করি। তবে গোমরাহ মনে করি না; তাদের পিছনে নামাজ পড়তেও অস্বীকার করি না। কাফের বলাতো দূরের কথা।

শরীয়তের বিভিন্ন মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দেয়া স্বাভাবিক। এতে কাউকে কাফের মনে করার কারণ নেই। বেশীর চেয়ে বেশী বলা যেতে পারে যে, একপক্ষ ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। যদি তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে থাকেন এবং ভুল সিদ্ধান্তের মূলে যুক্তিনির্ভর কোন কারণ থেকে থাকে তবে আশা করা যায়, আল্লাহর দরবারে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গৃহীত হবে। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবজ্ঞা এর কারণ হয়ে থাকে তবে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। কিন্তু কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্পর্কে এমন বদধারণা করতে যাই কেন। বাইরের অবস্থা দৃষ্টে বিচার করাই আমাদের দায়িত্ব। মনের খবর তো শুধু আল্লাহই জানেন।

আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের আকুল প্রার্থনা; সিরাতুল মুস্তাকীমের কাফেলায় তিনি আমাদের শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে চিহ্নিত করার এবং মিথ্যাকে বর্জন করে সত্যের উপর অবিচল থাকার সৎ সাহস যেন আমরা দেখাতে পারি– আমিন।

দ্বিতীয় ভাগ

ফিকাহ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ

মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ

ভূমিকা

আল্লাহ পাকের ইবাদত ও আনুগত্যই হলো মুসলিম জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আর এই ইবাদত ও আনুগত্যের একমাত্র উপায় হলো কোরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (সিলসিলাতুল আহাদিস আস্‌সাহীহা, ৪ঃ ৩৬১, শব্দের সামান্য পার্থক্যে ইবনে মাজাহ্ ঃ৩১১০, আবু দাউদ (আল-মানাসেক)

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মৌলিক আকায়েদ (তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি) ও মৌলিক আহকাম (নামায, রোযা, ফরয হওয়া) ইত্যাদি যাবতীয় আলোচনা কোরআন ও হাদীসে সর্বসাধারণের বোধগম্য, সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে খুঁটিনাটি আহকাম ও বিধানগুলো বর্ণিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায়, যা চিন্তা ভাবনা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তদ্রূপ কালের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান কোরআন ও হাদীছে আলোচিত হয়নি। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সমাধান পেতে হলে কোরআন সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতিমালার আলোকে শরীয়ত নির্দেশিত পথে ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সকল আহকাম ও বিধান আহরিত হয়েছে তারই নাম হলো الفقـــه বা ফিকাহ শাস্ত্র।

যেহেতু মেধা, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণ সমপর্যায়ের ছিলেন না বরং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের মাঝে তারতম্য ছিলো। সেই সাথে তাদের মাঝে ইজতিহাদের প্রয়োগ ও পদ্ধতিগত পার্থক্যও বিদ্যমান ছিলো সেহেতু ফিকহী মাসায়েলের সমাধানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইজতিহাদে তাঁদের এই স্বাভাবিক মতান্তর কখনই সামান্যতম মনান্তরে পর্যবশিত হয়নি। বরং

তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। পরমত সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাহর উপর নিজেদের এবং উম্মতের আমল প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই ছিলো তাঁদের সকলের সমান উদ্দেশ্য।

তবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন ও হাদীসই যদি হয়ে থাকে ফিকাহ শাস্ত্রের অভিন্ন উৎস তাহলে মুজতাহিদ আলিমদের মতপার্থক্যের কারণ কি? কোরআন হাদীসের অভিন্ন উৎস থেকে অভিন্ন ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব নয়?

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুজতাহিদ ইমামদের কোন কোন মতামত বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীসেরও বিপরীত হয়ে যায়। এটা কেন? এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়ই বা কি?

এ প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয়। বিশেষতঃ ইসলামী জ্ঞান যাদের গভীর ও পরিপক্ক নয় এ প্রশ্ন যুগে যুগে তাদের বিব্রত করেছে। বিভ্রান্তও করেছে কম নয়। পাশ্চাত্যের সুযোগ-সন্ধানী অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এ প্রশ্নটাকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে বার বার। তবে আমাদের মহান পূর্বসুরী আলিমগণ এর সন্তোষজনক জবাব দিয়ে এসেছেন। এমন কি এ প্রসংগে মূল্যবান বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। ১

১। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লামা শা'রাণী রচিত আল-মীযানুল কুবরা কাশফুন নি'মাহ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রচিত রাফউল মালাম আ'নিল আইম্মাতিল আ'লাম। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) রচিত আল-ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ। ডক্টর মুস্তফা সাঈদ আল-খীন রচিত আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যাহ ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা, শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামাহ রচিত আসারুল হাদীস আল-শারীফ ফি ইখতিলাফিল আইম্মাহ। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) রচিত "ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ"। কাজী আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী রচিত "বিদায়াতুল মুজতাহিদ:। ডক্টর আবুল ফাতাহ রচিত দিরাসাত।

আলোচ্য প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়ার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ইমামদের ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ এ মতপার্থক্য নিন্দনীয় না প্রশংসনীয়? তৃতীয়তঃ এ মতপার্থক্য কি নব উদ্ভূত না ছাহাবা যুগ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে ধারাবাহিকভাবেই চলে এসেছে? চতুর্থতঃ ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইমামদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেমন ছিলো!

ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, কোরআন–হাদীসে বর্ণিত আকায়েদ ও আহকাম সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো সহজ–সরল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষেও একান্ত সহজসাধ্য। যেমন, তাওহীদ সম্পর্কে কোরআনের এরশাদ–

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়।" (সূরা বাকারাহঃ ১৬৩)

আহকাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

'তোমরা ছালাত কায়েম কর। যাকাত আদায় কর।' (সুরা বাকারাঃ ৪৩)

শিক্ষা বিষয়ে হাদীসের এরশাদ হলো–

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ

"অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

তদ্রূপ কিছু আহকাম এমন বিপুল সূত্র পরম্পরায় সুপ্রমাণিত যে, তাতে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। বলাবাহুল্য যে, এধরনের ক্ষেত্রগুলোতে ইমাম ও মুজতাহিদদের মাঝে কোন মতভিন্নতা নেই। বরং ভিন্নমত প্রকাশকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডী থেকেই বহির্ভূত বলে গণ্য

হবে। পক্ষান্তরে শরীয়তের অমৌলিক কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো চিন্তা ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ, কিংবা খবরে ওয়াহিদ তথা একটি মাত্র সূত্রে প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য যে, এ দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। তদুপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা শুধু উত্তম অনুত্তমের মতপার্থক্য। অর্থাৎ, কোন বিষয়ের দু'টি দিকই জায়েয, তবে কোন দিকটি উত্তম সে সম্পর্কেই শুধু মতপার্থক্য। হালাল হারাম বা জায়েয না জায়েয ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতপার্থক্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

মোটকথা, শরীয়তের মৌলিক, দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়গুলোতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআ'তের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। দ্ব্যর্থবোধক ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ অমৌলিক কতিপয় বিষয়ের মাঝে তাঁদের মতপার্থক্য সীমিত ছিল এবং সেটাও ছিল উত্তম অনুত্তমের মতপার্থক্য। হালাল হারাম বা জায়েয না জায়েযের নয়।

ফকীহদের এ মতপার্থক্য কি নিন্দনীয় বা অকল্যাণকর?

অকাট্য যুক্তির আলোকে ওলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ফকীহদের আলোচ্য মতপার্থক্য হচ্ছে উম্মতের রহমত ও কল্যাণের উৎস। আল্লামা কুরতবী (রঃ) ও আল্লামা সুয়ূতি এ প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। اختلاف امتي رحمة 'আমার উম্মতের ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।

الجامع الصغير গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুনাভী (রঃ) হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ফকীহদের ইজতিহাদ ভিত্তিক ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য মূলতঃ উম্মতকে প্রশস্ততা দান করেছে। বিভিন্ন মাযহাব যেন বিভিন্ন রাজপথ ও মহাসড়ক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবগুলি সহকারে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে একমাত্র মুজতাহিদ ইমামদের সাথে হক ও সত্যের সম্পৃক্তির কারণে উম্মতের জন্য সংকট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি না হয়। শরীয়তকে উদার সহজ করার জন্যই মানুষকে সাধ্যাতীত কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মোটকথা, মাযহাবের ইখতিলাফ হচ্ছে উম্মতের জন্য এক বিরাট নেয়ামত, অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ

থেকে ছাহাবা ও তাঁদের উত্তরসূরীগণ ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলো অভিন্নমুখী বিভিন্ন জনপথতুল্য। আর এই ইখতিলাফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, সুতরাং এভাবে তাঁর মু'জিযারই প্রকাশ ঘটেছে মাত্র। তবে আকায়েদ বিষয়ে ইজতিহাদের চেষ্টা নিঃসন্দেহে গোমরাহীরই নামান্তর। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথই হল অভ্রান্ত। আহকাম বিষয়ক ইখতিলাফের ক্ষেত্রেই শুধু আলোচ্য হাদীসের রহমত প্রযোজ্য।১

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মন্তব্য দেখুন,

'আমার বক্তব্যের বিপক্ষে (শরীয়তের) কোন দলীল তোমাদের হাতে আসলে সেটাই তোমরা গ্রহণ করবে।'

১। ফয়যুল কাদীর ১ঃ ২০৯ পৃষ্ঠা।

এ প্রসংগে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে শরীয়তের যে সকল মূলনীতি ও বিধান নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো সকল নবীর অভিন্ন 'দ্বীন' সমতুল্য। তা লংঘনের অধিকার নেই কারো। এগুলো যে গ্রহণ করবে সে নির্ভেজাল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরাই হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত।

পক্ষান্তরে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন নবীর নিজস্ব 'বচন ও কর্ম' সমতুল্য যা শরীয়তভুক্ত রূপে স্বীকৃত। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন, 'যারা আমাকে পাওয়ার সাধনা করবে তাদের আমি অনেক পথের দিশা দিব।'১

১। মাজমুউ' ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১৯ঃ ১১৭

একটু পরে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) আরো বলেন,

'ওলামা, মাশায়েখ ও শাসকগণ তাদের মাযহাব, কর্মপন্থা ও শাসননীতি

১০—

প্রবর্তনের দ্বারা যদি প্রবৃত্তির পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি শুধু কামনা করে থাকেন এবং সাধ্যমত পূর্ণাংগ ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রতিপালকের মিল্লাত তথা কোরআন ও সুন্নাহ আকড়ে ধরার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সেটা হবে বিভিন্ন নবীর বিভিন্ন শরীয়ত ও কর্মপন্থার সমতুল্য। কাজেই প্রত্যেক নবী যেমন নিজস্ব শরীয়ত ও পন্থানুযায়ী এক আল্লাহর ইবাদত করার দ্বারা ছাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন, তদ্রুপ মুজতাহিদ ইমামগণও আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ সত্ত্বেও ছাওয়াবের অধিকারী হবেন।১

১। মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৯ খঃ, ১২৬ পৃষ্ঠা।

এবার দেখা যাক; মতপার্থক্য দ্বারা কি ধরনের কল্যাণ উম্মত লাভ করেছে।

প্রথমতঃ যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আপন মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ ওলামায়ে কেরাম ও মুফতীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকার ক্ষেত্রে এই সহজতা লাভ করা সম্ভব হতো না।

যেমন, হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহের জন্য নব্বই বছর অপেক্ষা করার শর্ত রয়েছে, যার ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

এই সংকটাবস্থা দূর করার জন্য হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রঃ) মালেকী মাযহাব মুতাবেক মাত্র চার বছর সময় সীমার ফতোয়া দিয়েছেন।১ লক্ষ্য করুন, মতপার্থক্যের পরিবর্তে সকল ইমামের ইজতিহাদ যদি নব্বই বছর সময়সীমার সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, তাহলে মুসলিম নারীদের কি পরিমাণ দুর্গতি হতো? কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাই বলেছেনঃ

'আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মতপার্থক্যের মাধ্যমে উম্মতের অশেষ কল্যাণ করেছেন। কেননা, যে কোন সাহাবীর আমল অনুসরণের সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি অবশ্যই প্রশস্ততা অনুভব করবে এবং ভাববে যে, তার চেয়ে উত্তমজন এ আমলটি করে গেছেন।২

১। বাংলা বেহেশতী জেওর ও আল–হীলাতুন–নাজেযাহ ৫০–৫১ পৃষ্ঠা।
২। জামেউ বায়ানিল ইল্‌মঃ ২, ৮০

খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) বলেছেন,

'আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মাঝে মতভিন্নতা না হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা, তাঁদের অভিন্ন মত হলে (শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে) মানুষ সংকীর্ণ অবস্থায় নিপতিত হতো। যেহেতু তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ইমাম, সেহেতু তাঁদের যে কোন একজনের মত অনুসরণেরপ্রশস্তা রয়েছেপ্রত্যেকের জন্য।১

আল্লামা ইবনে কুদামাহ আল–আক্বায়েদে লিখেছেন

ইমামদের ইখতিলাফ রহমতস্বরূপ আর তাঁদের ঐক্যমত প্রমাণ স্বরূপ। অর্থাৎ, কোন বিষয়ে তাঁরা মতভিন্নতা পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে যে কোন একটি মত অনুসরণ করার। পক্ষান্তরে কোন বিষয়ে তাঁরা সর্বসম্মত হলে তার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই।

(দুই) শরীয়তে ইজতিহাদ ও চিন্তা–গবেষণার পথ খোলা থাকার বরকতেই ইসলামী ফিকাহ আজ এত প্রশস্ততা লাভ করেছে। আর ওলামায়ে কেরামও কোরআন ও হাদীসে ইজতিহাদ করার মাধ্যমে অশেষ ছাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ লাভ করেছেন।

(তিন) ইমামদের মতভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আমল তরকের ব্যাপারে উম্মত সংকিত ও সতর্ক হয়। অন্য দিকে চূড়ান্ত হতাশা থেকে উম্মত মুক্তি লাভ করে। যেমন, বিনা ওজরে নামায তরককারী সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে আহমদ ইবনে হাম্বাল, ইসহাক ইবনে রাহওয়ে ও ইবনে মুবারক প্রমুখ ইমাম কুফরির ফতোয়া দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাহাবা ও পরবর্তী ইমামদের মতে শরীয়তের কোন ফরযকে অস্বীকার না করে শুধু তরক করার কারণে মানুষ ফাসেক হয়, কাফের হয় না।২

এ মতভিন্নতার ফলে প্রথমোক্ত দলের অনুসারীদের মনে যেমন কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হয় (এ কারণেই বে–নামাযীকে কাফের বলা সত্ত্বেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো অথবা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন না করার কথা বলা হয়নি।) তেমনি দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীদের মনে শংকা ও সতর্কতা দেখা দেয়। কেননা, কোন বে–নামাযী যখন জানবে যে, কোন কোন ছাহাবী ও ইমামের ফতোয়া মতে সে কাফের বলে গণ্য তখন স্বভাবতঃই তার অন্তর কেঁপে উঠবে এবং সে তওবার মাধ্যমে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

১। জামেউ বায়ানিল ইল্‌মঃ ২, ৮০

২। ফাযায়েলে নামাযঃ ২৫ পৃষ্ঠা।

পক্ষান্তরে কোন একদিকে সকলের অভিন্ন মত হলে গোটা উম্মত হয়ত হতাশা কিংবা ঔদাসিন্যের শিকার হয়ে পড়তো।

(চার) মতভিন্নতা ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় ফতোয়া প্রদানের কারণ হয়। যেমন, মদখোর ও অন্যান্য কবীরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কবীরাহ গুনাহ হলেও শাফেয়ী ও মালেকী মতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ধরনের আরো বহু 'কল্যাণ ও রহমত'–এর কারণেই ইমামদের মতভিন্নতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং তা নিরসনের চিন্তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, মুসলিম জাহানের প্রথম মুজাদ্দিদ খলিফা উমার বিন আব্দুল আযীযকে অনুরোধ করা হল, ফকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন পথে ও অভিন্ন মতে একত্র করুন। জবাবে তিনি বললেন, ما يسرني انهم لم يختلفوا 'তাদের মতভিন্নতা না থাকাটা খুশির কারণ নয়।

শুধু তাই নয় বরং সকল প্রদেশে তিনি এই মর্মে ফরমান পাঠিয়ে দিলেন যে, স্থানীয় ফকীহ ও মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিলে তথাকার অধিবাসীরা সে আলোকেই আমল করবে।[১]

তদ্রূপ ইমাম মালেক (রঃ)কে খলীফা আল মনসুর একবার জানালেন, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আপনার সংকলিত মুআত্তার অনুলিপি সকল

প্রদেশে এই ফরমানসহ পাঠিয়ে দেব যে, এখন থেকে সকলকে এই কিতাব মতেই আমল করতে হবে।

১। সুনানে দারামী ১ খঃ, ১৫১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) খলীফাকে নিষেধ করে বললেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হাদীসের উপর মানুষের আমল শুরু হয়েছে। সুতরাং সকলকে নিজ নিজ পছন্দ করা মত ও রিওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করতে দিন।

আমীরুল মু'মিনীন বা মুসলিম উম্মাহর শাসক হিসাবে খলিফার আপাত সুন্দর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কি দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণ করে না যে, ইমামদের অভিন্ন মতের পরিবর্তে তাদের মতভিন্নতার মাঝেই রয়েছে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের স্বার্থে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) সাত তিলাওয়াতের পরিবর্তে একটি মাত্র তিলাওয়াত অনুযায়ী কোরআনের অনুলিপি তৈরী করে সকলের জন্য তা বাধ্যতামূলক করে অন্য সকল অনুলিপি পুড়ে ফেলেছিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণও তাতে সর্বসম্মত সমর্থন দিয়েছিলেন। এখন কথা হলো, ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অভিন্ন মত অনুসরণই যদি উম্মতের জন্য কল্যাণকর হত তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীন ফিকাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁরা তা করেননি; উপরন্তু পরবর্তী যুগে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ও ইমাম মালেক এ ধরনের চিন্তা পরিষ্কার ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

একটি সংশয়ের নিরসন

অনেকে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত সমূহের ভিত্তিতে ফকীহদের ইখতিলাফ ও মতভিন্নতাকে নিন্দনীয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"আর তারা ইখতিলাফ করতেই থাকবে তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়)। (আর আপনি তাদের এ ইখতিলাফের কারণে বিচলিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত পূর্ণ হবেই যে, আমি জিন ও ইনসান উভয়কে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করব।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ـ

"আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। আর মতানৈক্য করো না।"১

আরো ইরশাদ হয়েছে

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পরস্পর ইখতিলাফ করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি পৌঁছার পর, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।২

এর জবাবে আল্লামা কুরতুবী বলেন

১। আলে ইমরানঃ ১০৩
২। আলে ইমরানঃ ১০৫

আলোচ্য আয়াতে শরীয়তের অমৌলিক বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কেননা, মূলতঃ তা ইখতিলাফ নয়। (নিন্দনীয়) ইখতিলাফ তো হলো, যা একতা ও সম্প্রীতি অসম্ভব করে তোলে। মাসায়েল সংক্রান্ত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য, সেটা শরীয়তের বিভিন্ন বিধান ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাবাহুল্য যে, এধরনের মতপার্থক্য ছাহাবাযুগেও ছিল। উদ্ভূত সমস্যার

সমাধান করতে গিয়ে সাহাবাগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় ছিলো পূর্ণ মাত্রায়।১

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ইখতিলাফ দু' প্রকারঃ হারাম ও জায়েয। কোরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত কোন বিষয়ে ইখতিলাফ করা হারাম। পক্ষান্তরে চিন্তা ও উদ্ভাবনসাপেক্ষ বিষয়ে ইখতিলাফ শুধু বৈধই নয় স্বাভাবিকও বটে। আর এই প্রথমোক্ত ইখতিলাফকেই কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি কোরআনের আয়াতগুলো পেশ করে বলেন,

'ফকীহদের মতপার্থক্যপূর্ণ প্রায় সব বিষয়ই এমন, যার স্বপক্ষে কোরআন–সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন দলিল আমি পেয়েছি"।২

আল্লামা ইবনে কুদামাহকৃত আল্ মুগনীর ভূমিকায় মুহাম্মদ রাশীদ রেযা ইখতিলাফের বিপক্ষীয় প্রমাণাদি উল্লেখপূর্বক লিখেছেনঃ

১। কুরতুবী ৪ খঃ, ১৬৯ পৃঃ।
২। ইমাম শাফেয়ী রচিত আর রিসালাহ

'বোধ, বুদ্ধি ও মতামতের বিভিন্নতা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়।' আল্লাহ বলেন, 'আর এরা ইখতিলাফ করতেই থাকবে, তবে আপনার প্রতিপালক যাদের রহম করবেন (তারা নয়। তাদের ইখতিলাফের কারণে আপনি বিচলিত হবেন না। কেননা,) তিনি এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন।"

তাই ইসলাম (ইখতিলাফ মাত্রেরই নিন্দা না করে) শুধু বিভেদাত্মক ইখতিলাফের নিন্দা করেছে।

এই নীতি অনুসরণ করেই আমাদের পুর্বসুরী আকাবিরগণও মৌলবিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত প্রয়োগ করেননি; বরং সর্বসম্মতভাবে কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বাণী অবিচলভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সাধারণ আমল ও মুআমালাতের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা ইজতিহাদ–ইস্তিম্বাতের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর বাণী ছিল প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক।

বলাবাহুল্য যে, এই ইজতিহাদ ভিত্তিক মতভিন্নতার কারণে পরস্পরকে তাঁরা অভিযুক্ত করেননি। কেননা, যে বিষয়গুলোকে শরীয়ত প্রচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থবোধক রেখেছে সেগুলোতে ইজতিহাদ প্রয়োগ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিলো আল্লাহর নির্দেশ। সে নির্দেশই সকলে পালন করেছেন পূর্ণআন্তরিকতারসাথে।১

১। ফাওয়ায়েদু কিতাবিল মুগনী ওয়াশ্ শারহিল কাবীর (১২ পৃষ্ঠা)

এবং কোরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াসই ছিলো তাদের ইজতিহাদের বুনিয়াদ। বলাবাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ইজতিহাদের ফলাফল এসেছে বিভিন্ন। কিন্তু এই মতপার্থক্য তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতম ব্যত্যয়ও ঘটাতে পারেনি। বরং ইখলাস ও উদারতার অবস্থা তো ছিলো এই যে, অন্যের যুক্তি হৃদয়ংগম হওয়া মাত্র প্রসন্নচিত্তে তা মেনে নিয়েছেন। এমন কি শিক্ষক হয়েও ছাত্রের যুক্তি ও মতামত মেনে নিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না তাদের।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কতিপয় দৃষ্টান্তঃ

আমাদের বক্তব্যকে অধিকতর হৃদয়ংগম করানোর জন্য ফকীহদের পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) একবার ইমাম আবু হানীফার কবরের নিকট ফজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মতে ফজরে দোয়া 'কুনূত' পড়া আবশ্যক হলেও সেদিন তিনি এই বলে কুনূত পড়া বাদ দিলেন যে, এই কবরবাসী (ইমাম) আবু হানিফা ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তার আদব রক্ষা করতে চাই। অনেকের মতে সেদিন তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, আবু হানীফা (রঃ) অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।১

ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)কে শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন–

"ফিক্বাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব

তাকে বরণ করতেই হবে। কেননা, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের তাওফীক (ঐশী দান)প্রাপ্তদেরঅন্যতম।২

১। আওজাযুল মাসালেক ১ঃ ১০৩। ২। আওজাযুল মাসালেক ১ঃ ৮৮।

এমন কি ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের প্রতিও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। দেখুন–

'কেউ ফিকাহ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। কেননা, কোরআন–সুন্নাহর মর্ম তাদের সহজ–আয়ত্তে এসেছিল। আল্লাহর শপথ মুহাম্মদ বিন হাসানের গ্রন্থসমগ্রের কল্যাণেই শুধু আমি ফকীহ হতে পেরেছি।১

১। দুররুল মুখতার–১ঃ ৩৫। রদ্দুল মুহতার– ১ঃ ৩৫।

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতপার্থক্যের কথা সর্বজনবিদিত, যার ফলে দুটি আলাদা মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন সুমধুর ছিলো আলোচ্য ঘটনা ও মন্তব্য তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয়।

এছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন। অনেকে ইমাম সাহেবের জীবনচরিতও রচনা করেছেন।১ তাছাড়া বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ অন্য মাযহাবের টীকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেছেন; যা প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ আলাদা পথের পথিক নন। উৎস তাদের এক এবং লক্ষ্যও তাদের অভিন্ন। যেন তারা একই মায়ের অনেক সন্তান; শারীরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই মাতৃগর্ভে যাদের জন্ম এবং একই মাতৃকোলে যারা প্রতিপালিত এবং একই নাড়ীর বন্ধনে যারা আবদ্ধ।

১। শাফেয়ী মাযহাবের মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার মূল্যবান জীবনচরিত রচনা করেছেন– عقود الجمان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان নামে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আমাকে বলেছিলেন, যেহেতু হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে আপনারা শ্রেষ্ঠ সেহেতু আমার অজানা কোন হাদীস আপনার সংগ্রহে থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সে জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর বসরা বা সিরিয়া সফর করতেও আমি তৈরী আছি।১

অন্য মাযহাবের ইমামের সামনে একজন বরেণ্য ইমামের এমন অতুলনীয় বিনয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাদের ইখলাছ, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর প্রতি ইমাম আহমদের (রঃ) সশ্রদ্ধ অনুভূতিও লক্ষ্য করুন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ فِىْ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ رَجُلًا يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ

'প্রত্যেক শতাব্দির মাথায় আল্লাহ এমন এক ব্যক্তি পাঠান যিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদান করেন।'

এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয। আর দ্বিতীয় শতাব্দিতে হলেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জন্য আমি দোয়া ও ইস্তিগফার করছি।২

১। আদাবুশ–শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু ৯৫ পৃষ্টা, শব্দের সামান্য ব্যবধানে ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ২খঃ, ১৫৪ পৃঃ এবং ১খঃ, ৪৭৬ পৃঃ। হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯খঃ, ১০৬ পৃঃ।

২। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৬০ পৃষ্ঠা।

পুত্র আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন,

প্রিয় পুত্র! পৃথিবীর জন্য ইমাম শাফেয়ী হলেন সূর্যতুল্য এবং মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য।১ ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে তাঁর আরো দুটি মন্তব্য দেখুন–

'ফিকাহ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।"২

ইলমের আলোচনায় তার চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই। তদ্রূপ সুন্নাতে রাসূল আনুসরণেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।৩

১। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

২। ইমাম রাযী বিরচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী ৬১ পৃষ্ঠা। ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী ২খঃ ২৫৮ পৃঃ।

৩। ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী ২খঃ, ২৫৮ পৃঃ। ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী ৬১ পৃষ্ঠা।

এছাড়া আবু উসমানের প্রতি ইমাম আহমদের ভালবাসার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তিনি ইমাম শাফেয়ীর পুত্র ছিলেন।১

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক সম্পর্কে আবু মানসুর আল-বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেকের (রঃ)

১। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইবনে আবি হাতেম রাযী রচিত আদাবুশ-শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, ইমাম বাইহাকী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রচিত মানাকিবুশ-শাফেয়ী এবং হিলইয়াতুল আওলিয়ার ইমাম শাফেয়ী অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম মালেকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খিদমতে ছিলেন।

ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেকের কোন উদ্ধৃতি এ ভাবে দিতেন, আমাদের উস্তাদ মালিক বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলতেন,

'ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম মালেক (রঃ) সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই। হাদীছের সনদ আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালেকের অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য।

ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (রঃ) না হলে হিজাযের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত। (ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ–শাফেয়ী ৪৯ পৃষ্ঠা।)

অন্যদিকে ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ীকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন? খতীবে বাগদাদী রচিত তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে ইমাম মালেকের মন্তব্য শুনুন–

শাফেয়ীর চেয়ে মেধাবী কোন কোরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি। (ইমাম রাযী রচিত মানাকিবুশ শাফেয়ী, ৫৮ পৃষ্ঠা।)

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর শ্রদ্ধাবোধঃ

এক মজলিসে এক হাদীস শুনে ভাবাতিশয্যে ইমাম শাফেয়ী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ফলে তার মৃত্যুর ভুল সংবাদ বলাবলি শুরু হল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী তা শুনে বললেন, সত্যি তার মৃত্যু হয়ে থাকলে যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা হারালাম।

ফেকাহ ও ফতোয়া সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ইমাম শাফেয়ীকে দেখিয়ে বলতেন, এঁকে জিজ্ঞাসা করো(মানাকিবুশ–শাফেয়ী, ৫৮–৫৯)

ইমাম আবু হানীফার দরবার থেকে কেউ আসলে বলতেন, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ফকীহ' এর কাছ থেকে এসেছো।

এক সাথে হজ্ব পালনকালে সুফিয়ান সাওরী ইমাম আবু হানীফার পিছনে চলতেন। আর কোন মাসআলা পেশ হলে তিনি নিরব থাকতেন। ইমাম সাহেবই জবাব দিতেন। (আওজাযুল মাসালেক।) ইমাম সুফিয়ান সাওরী স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, আবু হানীফার সাথে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্যও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন; তাঁদের প্রতি কি অতুলনীয় ভক্তি–শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করতেন।

এতক্ষণ ফকীহদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে আলোচনা হল। আসুন এবার দেখি, একের ইজতিহাদ ও মতামত সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন কি ছিল।

পারস্পরিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাঃ

প্রথম দৃষ্টান্তঃ আল ইশ্‌বাহ আন আখিরিল মুসাফফা গ্রন্থে ইমাম নাসাফী (রঃ) লিখেছেনঃ

আমাদের ও অন্যান্য ইমামের ফিকহী মাযহাবের (বিশুদ্ধতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলব, আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নির্দ্বিধায় বলব যে, আমাদের আকীদাই হক এবং প্রতিপক্ষের আকীদা না হক। অর্থাৎ, ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবী করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রমাণ সেখানে প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা অদৃঢ়মূল। পক্ষান্তরে আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ়মূল। সুতরাং ভিন্নমতের কোনই অবকাশ নেই।

(দুররুল মুখতার ১খঃ, ৩৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের (রঃ) মতে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করালে অযু ভেংগে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভাংগে না তাদের পিছনে কি আপনি নামায পড়বেন। জবাবে তিনি বললেন, কেন নয়। ইমাম মালেক ও ইমাম সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবের পিছনে কেন নামায পড়ব না? (তাঁদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভংগ হয় না)

এ ঘটনাটিতে দু'টি বিষয় ফুটে উঠেছে (এক) কোন মাযহাবই ভ্রান্ত নয়। কেননা, সকল মুজতাহিদের মাযহাব ও ইজতিহাদের মূল উৎস হচ্ছে কোরআন, সুন্নাহ ও সেই ভিত্তিক কিয়াস। (দুই) পরস্পরের মতামত ও ইজতিহাদের প্রতি ইমামদের শ্রদ্ধাবোধ ছিলো পুরো মাত্রায় এবং প্রত্যেকেই অপরকে হকের অনুসারী মনে করতেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) একবার হাম্মাম খানায় গোসল করে ইমামতি করলেন। নামাযের অনেক পরে জানা গেল যে, হাম্মাম খানার কুয়ায় মরা ইঁদুর পড়ে আছে। হানাফী মাযহাব মতে পানি নাপাক বিধায় নামায দোহরানো দরকার; কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না। তখন তিনি বললেনঃ

এ সংকট মুহূর্তে আমরা আমাদের মদনী ভাইদের (মদীনাবাসী ইমামদের) এই মত অনুসরণ করব যে, দু'মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা নাপাক হয় না। (আল ইনসাফ ৭১, দিরাসাত ফিল ইখতিলাফ থেকে সংগৃহীত ১১৭ পৃষ্ঠা)

দেখুন, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) মদীনার ইমাম মালেক ও তাঁর অনুসারীদের ভাই বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা উভয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছি এবং নিজ নিজ চিন্তা মোতাবেক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমরা সকলেই হকের উপর আছি। যেহেতু আমাদের উভয়ের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ সেহেতু আমরা একই মায়ের দুটি সন্তান তুল্য। আরো লক্ষণীয় যে, একাধিক মাযহাবের উপস্থিতি সংকটকালে শরীয়তের উপর আমল করার ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা ও সহজতা এনে দেয় আলোচ্য ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন,

'মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমার মতের বিপরীত আমল করতে দেখলে তাকে বাঁধা দিও না।' (হাফিজ আবু নু'আয়ম রচিত হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬খঃ, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।)

তিনি আরো বলেন,

'ফকীহদের মতভেদ রয়েছে এমন ক্ষেত্রে কোন ভাইকে আমি যে কোন মত গ্রহণে বাঁধা দেই না। (আল–ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্‌কিহ ২খঃ, ৬৯ পৃঃ)

আলোচ্য দুটি মন্তব্য থেকে ইমাম সুফীয়ান সাওরীর এই কর্মনীতিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অপর মুজতাহিদের মতামতকে তিনি না হক মনে করতেন না। কেননা, এটা ইজতিহাদের ফল। আর ইজতিহাদ হচ্ছে শরীয়তেরই নির্দেশ। তদুপরি তাঁর 'ভাই' শব্দটি আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়

পঞ্চম দৃষ্টান্তঃ হাদীসের ইরশাদ হল,

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

'তোমাদের কেহ কোন 'অন্যায়' দেখলে হাতে (শক্তি দ্বারা) বাঁধা দিবে। তা না পারলে মুখে (কথা দ্বারা) বাঁধা দিবে, তাও না পারলে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিম (৪৯), আবু দাউদ (১১৪০), তিরমিযি (২১৭৩), নাসাঈ (৮ঃ ১১১), ইবনে মাজাহ (৪০১৩))

হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম নববী (রঃ) বলেন, এমন ক্ষেত্রেই শুধু প্রতিবাদ করা যাবে যার অন্যায় হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাঁধাদান করা বৈধ নয়।

ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাযযালী অন্যায় কর্মে বাঁধাদান প্রসংগে লিখেছেনঃ

'যে সকল অন্যায় তল্লাশি ছাড়া প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তার অন্যায় হওয়া ইজতিহাদনির্ভর নয় বরং স্বতঃসিদ্ধ, সেগুলোতেই শুধু বাঁধাদান করা হবে। অতঃপর তিনি ইজতিহাদনির্ভর না হওয়ার শর্ত সম্পর্কে লিখেছেনঃ

এ শর্ত এ জন্য যে, কোন বিষয়ের অন্যায়ত্ব ইজতিহাদনির্ভর হলে (যেহেতু তা সুনিশ্চিত নয় সেহেতু) তাতে বাঁধাদানের অধিকার নেই। সুতরাং গুই সাপ, হায়েনা এবং বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কোন শাফেয়ীকে বাঁধা দেয়ার অধিকার কোন হানাফীর নেই। কেননা, হানাফী মাযহাবে জায়েয না হলেও তাঁদের মাযহাবে তা জায়েয। তদ্রূপ নেশা উদ্রেক করে না এরূপ নবীয (খেজুরের বা আংগুরের রস) পান করার ব্যাপারে কোন হানাফীকে বাঁধা দেয়ার অধিকার কোন শাফেয়ীর নেই। ইত্যাদি। (ইহইয়ায়ে উলুমদ্দীন ২ঃ ৩৫৩।)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী ফকীহদের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও পরমত সহিষ্ণুতা ছিল পূর্ণ অটুট। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) লিখেছেন–

'সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তীদের অমৌল বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য ছিল। যেমন নামাযে সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়া, কিংবা উচ্চস্বরে বা অনুচ্চস্বরে পড়া। তদ্রূপ ফজরে কুনূত পড়া না পড়া। রক্তমোক্ষণ বা নাকে রক্তক্ষরণ ও বমনকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করা না

করা, ইত্যাদি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা একে অপরের পিছনে 'ইকতিদা' করতেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও অন্যান্যরা ইমাম মালেকসহ মদনী ইমামদের পিছনে ইক্তিদা করতেন। অথচ তাঁরা উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে কোনভাবেই বিসমিল্লাহ পড়তেন না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১খঃ, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, আল-ইন্সাফ।)

ফিকহী মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়

ফিকাহ'র বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদগত কারণে মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়, বরং নববী যুগে স্বয়ং ছাহাবা কেরামের মাঝেও তা বিদ্যমান ছিল। তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির বরকতে এ মতপার্থক্যের নিরসন তাঁদের জন্য ছিল অতি সহজ। তাঁরা যখনই কোন সমস্যা বা মতপার্থক্যের সম্মুখীন হতেন, সাথে সাথে দরবারে রিসালতে তা পেশ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হতেন না। বরং মীমাংসা করে দিতেন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উভয়ের মতামতকেই অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন, সহী বুখারীতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আহযাবের (খন্দক যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, তোমাদের কেউ যেন বনী কুরায়যা পৌঁছার পূর্বে নামায আদায় না করে। পথে আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে একদল সাহাবা বললেন, এমন কি সময় পার হয়ে গেলেও বনী কুরায়যায় পৌঁছার পূর্বে আমরা নামায পড়বো না। অন্যরা বললেন, আমরা পথেই সময়মত নামায পড়ব। কেননা, নামায কাযা করানো আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের গতি দ্রুত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাতে আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছা যায়। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দলকেই তিরস্কার করেননি।

এখানে দুটি বিষয় বোঝা গেল। প্রথমতঃ আয়াত বা হাদীসের সাধারণ অর্থের উপর আমল করা যেমন দোষনীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদ প্রয়োগ করে বিশেষ অর্থ আহরণ করাও নিন্দনীয় নয়। (বুখারী, হাদীস নং ৪১১৯।)

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের অমৌল বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য। কোনটাকেই না হক বলা যাবে না। (ফাতহুল বারী ৪০৯ পৃঃ ৭ম খণ্ড, দারুল মা'রিফ বইরুত কর্তৃক প্রকাশিত।) তবে মতান্তর থেকে

মনান্তর বা পরস্পরের নিন্দাবাদকে আল্লাহর রাসূল ভাল চোখে দেখেননি। তিরস্কার করেছেন। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আলিমের শরণাপন্ন না হয়ে ইজতিহাদ করাকেও তিনি পছন্দ করেননি। যেমন, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমাদের এক সাথীর মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফরয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয আছে কি না জানতে চাইলেন। সাথীরা না বাচক উত্তর দিলে বাধ্য হয়ে তিনি গোসল করলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হল। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কঠিন তিরস্কার করে বললেন–

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ، هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ـ

'তাকে তারা খুন করেছে। আল্লাহ তাদের খুন করুন। জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হল অজ্ঞতার দাওয়াই।

আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, যাদের যোগ্যতা নেই তাদের ইজতিহাদ করার অধিকার নেই, বরং যোগ্য আলিমের কথা মেনে চলাই তাদের কর্তব্য।

মোটকথা, ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদী মতপার্থক্য নববী যুগেও ছিল। পরবর্তীতে সাহাবা যুগেও ছিল। বরং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মতপার্থক্য সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল। যেমন, নামায তরককারীর কাফের হওয়া না হওয়া; গোসলে মেয়েদের মাথার খোপা খোলা না খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে তার ইদ্দতের মেয়াদ কতটুকু? ইত্যাদি বিষয়গুলো সাহাবা যুগেও অমীমাংসিত ছিল।

তবে আগেও বলে এসেছি যে, সাহাবা ও ফকীহদের যাবতীয় ইজতিহাদের উৎস ছিল অভিন্ন। একই উৎস থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁরা মাসায়েল ইস্তিম্বাত করেছেন। ফকীহ ও মুজতাহিদদের ইজতিহাদের উৎস কি কি? এবার সে সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করবো।

ফিকাহ শাস্ত্রের উৎস

ফিকাহ শাস্ত্রের যাবতীয় মাসায়েল আহরণের উৎস মোট চারটি। যথা, কোরআন, হাদীস, ইজমা ও 'কিয়াস'। প্রথম উৎস হল কালামুল্লাহ এবং দ্বিতীয় উৎস হল সুন্নাতে রাসূল। সুতরাং কোরআনে বা সুন্নায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কোন হুকুম পাওয়ার পর পরবর্তী কোন দলীল বা যুক্তির অবতারণার কোন অবকাশ নেই। সেটাই মেনে নিতে হবে অম্লান বদনে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় ফায়সালা করার পর মুমিন নর-নারীর কোন অধিকার থাকে না। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় তারা পরিষ্কার ভ্রান্তিতে আছে।' (আল-আহযাব-৩৬)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (আল-ইমরান-১৩২)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে তাদের কাফের আখ্যায়িত করে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাদের ভয় থাকা উচিত যে, (দুনিয়াতেই) হয়ত তারা কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হবে কিংবা (আখেরাতে

অবধারিতভাবে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের ঘিরে ধরবে। (সূরায়ে নূর-৬৩)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

'আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না। (সূরা আল-ইমরান, ৩২)

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ

'আর এরা দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এরা মোটেই (প্রকৃত) মুমিন নয়। আর এদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পানে আহবান করা হয়, যেন তিনি তাদের বিবাদ মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরায়ে নূর, ৪৭)

কয়েক আয়াত পরেই মুমিনদের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে-

انما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اذا دُعُوا الى اللّٰهِ ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلوا سَمِعْنَا واَطَعْنَا واولٰئك هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পানে আহবান করা হবে, যেন তাদের মাঝে তিনি ফয়সালা করে দেন, তখন মুমিনদের কথা তো হবে এই যে, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। এরাই হল সফলকাম। (সূরায়ে নূর, ৫৪)

Contents

আরো বিভিন্ন স্থানে আরো পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ জারি করেছেন, যাতে মুর্খরা হাদীসে রাসূল উপেক্ষার পায়তারা করার কোন সুযোগ না পায়। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন।' (আলে ইমরান, ৩১)

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

'রাসূল তোমাদের যা কিছু দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর। (সূরায়ে হাশর, ৭) (এখানে 'যা কিছু' যেহেতু অনির্ণীত, কাজেই শরীয়তের যাবতীয় আহকামও তার অন্তর্ভুক্ত হবে।)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।' (সূরায়ে নিসা, ৮০)

কেননা তাঁর জীবনের সকল কথা, কাজ ও 'অনুমোদন' তথা হাদীসে রাসূল হচ্ছে আহকামে এলাহী বা কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

এছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম–আহকাম ও ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন এবং তা শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'বস্তুতঃ আল্লাহ পাক মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের মাঝে তাদেরই (মানব জাতিরই) মধ্য হতে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান এবং তাদের সংশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও 'হিকমত' (জ্ঞানের বাণী) শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।'১

১। উম্মতের সামনে কোরআনের ব্যাখ্যা তুলে ধরাও তাঁর রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون

'আর আমরা নাযিল করেছি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন যেন মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় তাদের জন্য আপনি ব্যাখ্যা করে দেন। যাতে তারা চিন্তা ফিকির করে। (সূরা আন্‌নাহ্‌ল, ৪৪)

আরও এরশাদ হয়েছে–

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم اللذي اختلفوا فيه وهدي ورحمة

لقوم يؤمنون

'আর আমরা আপনার উপর কিতাব এ জন্যই নাযিল করেছি যে, যে সব বিষয়ে তারা বাদানুবাদ করেছে তা আপনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে (বুঝিয়ে) দিবেন আর মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত রূপে।' (সূরায়ে আন্‌নাহ্‌ল,৬৪)

হাদীসের আলোকে ফিকাহর দ্বিতীয় উৎস -

পবিত্র কোরআনের ন্যায় হাদীসে রাসুলেও এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, কোরআনের পর সুন্নাহ হচ্ছে শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। যেমন, সাহাবায়ে কেরামকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ তোমরা সেভাবে নামায পড়ো।

হজ্বের ক্ষেত্রেও একইভাবে ইরশাদ হয়েছে–

خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের যাবতীয় আহকাম শিখে নাও।'

শরীয়তে কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِيْ

'আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে গেলাম যা আকড়ে ধরলে কখনো তোমরা বিচ্যুত হবে না। আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ (হাদীস)।

এ মর্মে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো এখানে একত্র করা আমাদের উদ্দেশ্যও নয় আর বর্তমান পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবে আর একটি হাদীস অবশ্যই উল্লেখ করব, যা আলোচ্য বিষয়ে সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিস্তারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়া'য (রাঃ)কে ইয়ামানের প্রশাসকরূপে প্রেরণ কালে বিদায় লগ্নে জিজ্ঞাসা করলেন,

---

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। একটি কিতাব, অপরটি হিকমাত। আল্লামা ইবনে কাছীর, ইমাম শাওকানী, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখ এখানে কিতাব ও হিকমাতের অর্থ করেছেন 'কোরআন ও সুন্নাহ'। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১খঃ, পৃঃ ৪২৫। তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, ১খঃ, পৃঃ ৩৯৫। তাফসীরে আবুস-সাউদ, ১ঃখ, পৃঃ ১০৯। মুখতাসার তাফসীর আল-তাবারী, ১খঃ পৃঃ১৩০।

এছাড়া অধিকাংশ তাফসীর বিশারদগণের মতে, এখানে 'হিকমাত' দ্বারা সুন্নাহকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ পাক এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি হলো, কিতাব বা কোরআন। দ্বিতীয়টি হিকমাত, যার অর্থ সুন্নাতে রাসূল বলে আমার দেশের জনৈক বিজ্ঞ আলেম মন্তব্য করেছেন, যা যুক্তিযুক্তই মনে হয়। (আল্লাহ ভাল জানেন) কেননা, আল্লাহ এখানে কিতাব তথা কোরআনের পর 'হিকমাত' শব্দ উল্লেখ করেছেন, তদ্রূপ তাঁর অনুগ্রহের উল্লেখ প্রসংগে রাসূলের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। কাজেই এখানে হিকমাত অর্থ সুন্নাতে রাসূল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। (আর-রিসালাহ, ৭৮পৃঃ)

কোন সমস্যা দেখা দিলে কিভাবে তুমি তার সমাধান করবে? মুয়ায (রাঃ) বললেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে সমাধান করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে? মুয়ায (রাঃ) বললেন, তখন সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোকে সমাধান করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তাতেও যদি কোন সমাধান না পাও? হযরত মুয়ায (রাঃ) বললেন, তবে আমি নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)

'আলাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে রাসূলের সন্তুষ্টিজনক কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, দারামী, তাবাকাতে ইবনে আবি সাআাদ, জামেউ বায়ানিল ইলম।)

সা'হাবা ও ইমামদের দৃষ্টিতে ফিকাহ'র উৎস

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের ইমামদের কারোই এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না যে, কোরআনের পর সুন্নাহই শরীয়ত ও ফিকাহ'র দ্বিতীয় উৎস। দু' একটি নমুনা দেখুন।

(এক) সাফওয়ান ইবনে মুহরিব (?) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে 'কছর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ

(কছর হচ্ছে চার রাকাতের পরিবর্তে) দু' রাকাত। যে সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের পুত্র হযরত বেলাল বলেন, একদিন আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসে রাসূল শোনালেন-

لَا تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ

'নারীদেরকে তোমরা মসজিদে যাওয়ার হক থেকে বঞ্চিত কর না।'

আমি বললাম, আমি আমার পরিবারকে অবশ্যই বারণ করব। কারো ইচ্ছা হলে বউ নিয়ে ঘুরে বেড়াক। তিনি আমার দিকে ফিরে ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। আমি হাদীসে রাসূল শোনাচ্ছি আর তুমি বিরুদ্ধাচরণ করছ?

(তিন) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন–

'মানুষের মাঝে যতদিন হাদীসের তলব থাকবে ততদিন তাদের কল্যাণ হবে। যখনই তারা হাদীসবর্জিত জ্ঞান চর্চা শুরু করবে তখনই তারা বরবাদ হবে। (মীযানুল কুবরা, ১খঃ, ৫১পৃঃ)

(চার) তিনি আরও বলেন–

'আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে স্ব–চিন্তাদ্ভুত কোন মন্তব্য করার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। আর সুন্নতে রাসূল অনুসরণে যত্নবান হবে। কেননা, সুন্নতে রাসূল থেকে যে বিচ্যুত হবে সে গোমরাহ হবে। (মীযানুল কুবরা, ১ঃ ৫০)

(পাঁচ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন–

'হাদীস শোনার পরও যদি আমি অন্যমত পোষণ করি তাহলে কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে; আর কোন জমিন আমাকে ধারণ করবে? (আসারুল হাদীস)

(ছয়) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আরও বলেন,–

আমার কিতাবে 'সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী কোন কথা পেলে আমার কথা বর্জন করে সুন্নাতে রাসূলই তোমরা গ্রহণ করবে।' (মানাক্বিবুশ্–শাফেয়ী লিল–বাইহাকী, ১ঃ ৪৭৪। হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯খঃ, ১০৬। আদাবুশ্ শাফেয়ী, ৬৭)

(সাত) হাদীসের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে ইমাম মালেক (রঃ) বলেন–

'হাদীস হল নূহের কিশতি। তাতে আরোহণকারী নাজাত পাবে আর তা পরিত্যাগকারী ডুবে মরবে। (তাওয়ালিত্তাসীস্, ৬৩। মানাক্বিবুশ শাফেয়ী লিল–বাইহাক্বী, ১ঃ ৪৭২)

(আট) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও সুন্নাতে রাসূল উপেক্ষাকারীকে ধ্বংসের পথের যাত্রী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন–

'আমার জানামতে হাদীস চর্চার প্রয়োজন বর্তমানের মত অতীতে আর কখনো দেখা দেয়নি। কেননা, বিদ'আতের এমন প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যে, হাদীস জানা না থাকলে মানুষ নির্ঘাত বিদ'আতের শিকার হবে।; (মিফতাহুল জান্নাহ)

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি এ সত্য সুপ্রমাণিত হয়ে গেছে যে; ফিকাহ বা শরীয়তের আহকাম আহরণের সর্বপ্রধান উৎস হলো, কিতাবুল্লাহ, অতঃপর সুন্নাতে রাসূল। কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কোন মতামত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবা কেরাম এবং পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাহিদদের আকীদা ও আমলও ছিল অনুরূপ। কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাঁরা আহকাম ও বিধান আহরণ করতেন। কোন বিষয়ে কোরআন সুন্নায় প্রত্যক্ষ বিধান না পেলে চিন্তা ও ইজতিহাদ দ্বারা আহকাম আহরণ করতেন। কিন্তু সেটা তাদের নিজস্ব মতামত নয়। কোরআন সুন্নহারই প্রচ্ছন্ন বিধান মাত্র। এখানে এসে দুর্বল মনে সাধারণতঃ যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই যে, কোরআন সুন্নাহর অভিন্ন উৎস থেকেই যদি সকল মুজতাহিদ মাসআলা আহরণ করে থাকেন তাহলে তাদের মাঝে মতপার্থক্যের কারণ কি? ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ফতোয়া সহী হাদীসেরই বা পরিপন্থী হয় কেন?

বস্তুতঃ এ প্রশ্নের সমাধান পেশ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই মূল আলাচনায় প্রবেশের জন্য এতক্ষণ আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছি। আসুন, বুঝার ম'নোভাব নিয়ে এবং সত্য অন্বেষণের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে বিষয়টি আমরা আলোচনা করে দেখি, কেন ইমামদের মাঝে মতাপার্থক্য হতো এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মতপার্থক্যের স্বরূপই বা কী?

মতপার্থক্যের কারণ সমূহ

১। ক্বেরাতের বিভিন্নতা

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত ভিন্ন ভিন্ন অর্থের একাধিক কিরাআ'তে (তেলাওয়াত পদ্ধতিতে) বর্ণিত রয়েছে যার কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে অথবা উভয় অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে ইমামদের মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআনে অযু প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

'আর টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করবে)। (সূরায়ে মায়েদাহঃ ৬)

এখানে ارجلكم শব্দটি দুই কেরাতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রথম ক্বিরাত হলো, ارجلَكم (লামের উপরে যবর), যার অর্থ দাঁড়ায় মুখ ও হাতের সাথে পা দু'টোও ধৌত করতে হবে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ক্বেরাতকেই গ্রহণ করে ফতোয়া দিয়েছেন, পা ধৌত করা অযুর ফরযের অন্তর্ভুক্ত।১

১। তাদের যুক্তি হল–

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও অযু করতে গিয়ে মোজা ছাড়া খালি পায়ে মাস্‌হ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

(২) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে একবার সফরে সাহাবায়ে কেরামকে অযুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মাস্‌হ করতে দেখে কঠোরভাবে ধমক দিলেন যে, 'তোমাদের পায়ের শুক্‌না অংশটুকু জাহান্নামে যাবে।' আর এ জাতীয় সতর্কবাণী ফরয উপেক্ষা করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই বুঝা গেল, পা ধৌত করাই ফরয।

(৩) আল্লাহ্ পাক হাতের বেলায় যেমন কনুই পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। পায়ের বেলায়ও টাখনু পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন, যা ধোয়ার বেলায়ই সম্ভব।

(৪) তাছাড়া 'পা' ধৌত করলে অযু বিশুদ্ধ হওয়া নিশ্চিত কেননা, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; পক্ষান্তরে শুধু মাস্‌হকারীর অযু বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কাজেই সুনিশ্চিত ও মতবিরোধমুক্ত দিকটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ অর্থে এ কথাও বলা যায় যে, ধৌত করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

পক্ষান্তরে অপর একটি ক্বিরাত রয়েছে ارجـلِكم। (লামের নীচে যের), এ কেরাতের প্রেক্ষিতে শব্দটির সম্পর্ক হবে رؤوس (মাথা)র সাথে; যার অর্থ দাঁড়াবে, মাথার মত পাও মাস্হ করলেই চলবে। ধৌত করা আবশ্যক নয়। এ ক্বিরাতের প্রেক্ষিতে অনেকেই জমহুরের মতের খেলাফ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।১

১। যেমন, (ক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অযুর ফরয হল (মুখ ও হাত) ধৌত করা এবং (মাথা ও পা) মাস্হ করা।'

(খ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পায়ের ব্যাপারে কোরআনে মাস্হের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর হাদীসে ধোয়ার হুকুম করা হয়েছে।

(গ) হযরত ইকরামাহ অযুতে পা মাস্হ করতেন এবং বলতেন, পা' ধোয়ার নির্দেশ নেই; বরং তাতে মাস্হ করার নির্দেশ রয়েছে।

(ঘ) হযরত কাতাদাহ বলেনঃ আল্লাহ পাক অযুতে দু'টি অঙ্গ ধোয়া আর দু'টি মাস্হ করা ফরয করেছেন।

(ঙ) ইবনে জারীর আল তাবারীর মত হল; পায়ের ব্যাপারে ফরয হল ধোয়া অথবা মাস্হ করা। (তাফসীরে কুরতুবী থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)

২। কোন হাদীস মুজতাহিদ ইমামের সংগ্রহে না থাকা

প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব আহকাম একই সময় এবং সকল সাহাবীর সম্মুখে বর্ণনা করেননি; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে, একটি হাদীস মাত্র দু' একজন ছাড়া কেউ শুনেননি। তদ্রূপ সব সাহাবার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সব সময় হাযির থাকা সম্ভব হয়নি। কেউ সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে খেয়ে না খেয়ে ছায়ার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে ইল্মে নববী হাসিল করতেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) দেশে বিদেশে সব সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম-এর সঙ্গে থাকতেন। তদ্রূপ আসহাবে সুফ্ফার সাহাবীগণ (রাঃ)

বিশেষতঃ হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) মসজিদে নববীর চত্বরে সর্বদা ইল্‌ম হাসিলের জন্য পড়ে থাকতেন।

পক্ষান্তরে অনেককে মাত্র সামান্য কিছু সময় দরবারে রিসালাতে থেকে পূনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যেতে হয়েছে, আর কোনদিন উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। কাজেই সব সাহাবীর পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ যারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন তাঁদের পক্ষেও সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসীনের বেলায়ও তাই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যেও কারও পক্ষে সব হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।১

১। এ মর্মে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

আমাদের জানা মতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন; কোন হাদীস্‌ই তার ছুটে যায়নি। বরং সকল আলেমের ইল্‌মের ভাণ্ডার একত্রিত করলেই সমস্ত হাদীস একত্রিত করা সম্ভব হবে। তাঁদের প্রত্যেকের ইল্‌মের ভাণ্ডার পৃথক করলেই দেখা যাবে প্রত্যেকেরই সংগ্রহে হাদীস শাস্ত্রের বেশ কিছু অংশের অনুপস্থিতি ঘটেছে যা অন্যদের ভাণ্ডারে মজুদ রয়েছে। ইল্‌মের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে অবশ্যই স্তরভেদ রয়েছে। অনেকে অধিকাংশ হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন; যদিও কিছু হাদীস তাঁদের সংগ্রহে আসেনি। পক্ষান্তরে অনেকে অন্যদের তুলনায় সামান্য সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। (শীর্ষ ভাগই তাঁর ছুটে গিয়েছে।)

এ দাবীটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করে শেষের দিকে লিখেছেন,

'সব ইমাম বা কোন বিশেষ ইমাম সব সহী হাদীসই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, এমন ধারণা যে করবে সে মারাত্মক ভুলের শিকার হবে।

ইমাম বিকায়ী স্বীয় উস্তাদ আল্লামা ইবনে হাজারের মন্তব্য নকল করেন,

'অর্থাৎ, উম্মতের কারও ব্যাপারে এ দাবী করা যায় না যে, তিনি সকল হাদীস সংগ্রহ, স্মরণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এমনও বলেছেন, কোন এক ব্যক্তির সংগ্রহে সব হাদীস রয়েছে বলে যে দাবী করবে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপ সেও ফাসেক বলে গণ্য হবে যে বলবে, কিছু হাদীস উম্মতের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারও সংগ্রহেই নেই।

কাজেই, কোন মাসআলার সমাধানে যিনি সহী হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি সে অনুযায়ী মাসআলা পেশ করেছেন। অপরপক্ষে যিনি সহী হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি, তিনি বাধ্য হয়ে অন্যান্য যুক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। ফলে অনেক সময় তাঁর মত আল্লাহ পাকের খাস কুদরতে হাদীসের অনুকূল হয়েছে। আবার অনেক সময় হাদীসের বিপরীতও হয়েছে; যার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য। বরং হাদীসের অনুকূল সিদ্ধান্ত নিতে পেরে যেমন তিনি দুটি পূণ্যের অধিকারী হতেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি একটি পূণ্যেরঅধিকারীহবেন।১

১।বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী আম্‌র বিন আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر

'কোন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হলে সে দুটি পূণ্যের অধিকারী হবে। আর (সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর) ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সে একটি নেকীর অধিকারী হবে। (মুশকিলুল আছার, ১খঃ, ৩২৬ পৃঃ, মুসনাদ ইমাম শাফেয়ী, ৩৫৫ পৃঃ)

সাহাবা ও পরবর্তী যুগে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

(এক) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তঃ একদা তাঁর কাছে দাদীর মীরাস সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, দাদী মীরাস পাবে বলে কোরআন হাদীসের কোথাও কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আমি অন্যদের কাছে জেনে দেখব। অতঃপর তিনি সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ ও মুহাম্মদ বিন সালামাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ মীরাস দিয়েছেন। (রাফউল মালাম, ৬ মুসনাদে ইমাম আহমদ থেকে)

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)র মত ব্যক্তিত্ব, যিনি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেন এবং ঈমান গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধান পর্যন্ত কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি

এতদসত্ত্বেও এ হাদীসটি তার সংগ্রহে ছিল না, যা একজন সাধারণ সাহাবীর সংগ্রহে ছিল।

হযরত ওমরের (রাঃ) দৃষ্টান্তঃ

সহী বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, একদিন হযরত আবু মুসা আস'আরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট এসে তিনবার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেলেন। (অন্য সময়) যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ফিরে গিয়েছিলেন কেন? জবাব দিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েও আনুমতি পাইনি; তাই ফিরে গিয়েছি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

'তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়াই তার কর্তব্য।'

এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়, অনুমতি সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর জানা ছিল না, যা হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)র জানা ছিল।

(দুই) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)র দৃষ্টান্ত, যাতে তাঁর সিদ্ধান্ত হাদীসের অনুকূল হয়েছিলঃ

নাসায়ী শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)র নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল যে, জনৈক মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন। মহিলাটির 'মহর' নির্ধারিত করা ছিল না। (এখন তার মহর কোন হিসাবে আদায় করা হবে)। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জাতীয় কোন ফায়সালা করতে দেখিনি। অতঃপর তাদের মাঝে বিষয়টি অমীমাংশিত রয়ে গেল। ফলে বেশ বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এভাবে দীর্ঘ একটি মাস কেটে যাওয়ার পর হযরত ইবনে মাসউদ (অনন্যোপায় হয়ে) 'কিয়াস' (যুক্তি কেন্দ্রিক ইজতিহাদ) করে ফতোয়া দিলেন যে, তাকে 'মহরে মিস্‌ল' (পরিবারস্থ অন্যদের সমপরিমাণ) দেয়া হবে। কমও নয় বেশীও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে মিরাসেরও অংশীদার হবে।

হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) তখন বলে উঠলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক (বিধবা) মহিলার ব্যাপারে এই ফায়সালাই করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ কথা শুনে এত আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এমন আনন্দিত কোনদিন হননি। (নাসায়ী শরীফ)

এ ঘটনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারলাম, (ক) সংশ্লিষ্ট হুকুমটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর জানা ছিল না (খ) ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছেন (গ) আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে তার 'কিয়াস' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুকূল হয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) দৃষ্টান্তঃ

ওয়াক্ফ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর ফতোয়া হল, কোন জিনিস ওয়াক্ফ করার পর সেটা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং যে কোন সময় ওয়াক্ফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যদি সেটা ওসিয়্যতের পর্যায়ে হয় বা শরয়ী' ক্বাজীর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবু হানীফার এ ফতোয়া ছিল জমহুর ইমামদের পরিপন্থী এবং সহী হাদীসের খেলাফ। কেননা, এ সংক্রান্ত হাদীস তাঁর জানা ছিল না। অপরপক্ষে সেই হাদীসের ভিত্তিতেই জমহুর ওলামায়ে কেরাম এমনকি ইমাম আবু হানীফার শাগরেদদ্বয় (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)) এর মতও তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হানাফী মাযহাবের ফতোয়াও তাই।

ইমাম আবু ইউসুফের মতও প্রথমতঃ ইমাম আবু হানীফার মতের অনুকূলেই ছিল। অতঃপর হাদীসটি পেয়ে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন,

এমন স্পষ্ট ও সহী হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধীকার কারো নেই। ইমাম আবু হানীফাও এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।

এখানে আমার উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম আবু হানীফার মত ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধু ফিকাহ শাস্ত্রেই নয় বরং হাদীস শাস্ত্রেও অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার পক্ষেও কোন কোন হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তিনি

সহী হাদীস ও জমহুরের মতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে তো অনেকের মন্তব্য যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। কাজেই তার জন্য এটা স্বাভাবিক ব্যাপারই ছিল। এর জবাব হল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ তার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অথবা নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে অনেকে এহেন অন্তসারশূন্য উক্তি করেছেন। তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিব; বিতর্কের মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইমাম আবু হানীফার (রঃ) জীবনী পড়ুন। তখন আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন যে, সত্যই তিনি হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং ইমামে আযম উপাধি তার জন্য যথাযথ ছিল। তাঁর মতানুসারীর সংখ্যা সব যুগেই গরিষ্ঠতা লাভ করেছে এমনিতেই তো আর নয়। বিষয়টি যেহেতু বেশ গুরুতর সেহেতু আমরা এ বইয়ের শেষের দিকে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) স্বীয় ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি। বরং সহী হাদীস পাওয়া মাত্রই নিজ ইমামের মত প্রত্যাখ্যান করে সহী হাদীসের উপরই আমল করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং সাথে সাথে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইমামের মতের কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা নিজেই সে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, আমার কোন মত যদি কোন সহী হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে। এরপরও যদি কেউ হানাফী ইমামদের প্রতি ইমামের মতের কারণে সহীহ হাদীস উপেক্ষা করার অপবাদ রটিয়ে বেড়ান তবে তাদের জবাব আমাদের কাছে নেই।

ইমাম মালেক (রঃ)র দৃষ্টান্তঃ

ইমাম মালেক (রঃ) সম্পর্কে তার শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বলেন, একদিন তাকে মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অযুর মধ্যে পায়ের আংগুল খিলাল করার গুরুত্ব কতটুকু? জবাবে তিনি বলেন, এটা জরুরী নয়। উপস্থিত লোকেরা চলে যাওয়ার পর তাঁকে বল্লাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের

নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন হাদীস, বলতো?

বললাম, সাহাবী ইবনে শাদ্দাদ আল কারশী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযুর সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পায়ের অঙ্গুলীর ফাঁকে খিলাল করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

ইমাম মালেক (রঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে হাদীসটি 'হাসান'। এটি ইতিপূর্বে আমি কখনও শুনিনি। ইবনে ওয়াহাব বলেন, এরপর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি খিলাল করার নির্দেশ দিতেন। (তাকদিমাতুল জারহি ওয়া–ত্তা'দীল, ৩১ ; আল–ইসতিযকার, তাতে অবশ্য এ কথাও আছে যে, এরপর থেকে তিনি ওযুতে যত্নের সাথে খিলাল করতেন।)

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর দৃষ্টান্তঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আমাদেরকে বলেছেন, আপনারা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই, আপনাদের সংগ্রহে কোন হাদীস থাকলে আমাদের জানাবেন। তার রাবী যে কোন দেশেই হোক না কেন হাদীসটি সহীহ হলে আমি তার কাছে যাবো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া–৯ঃ ১০৬পৃঃ)

এখানে ইমাম শাফেয়ীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অনেক হাদীস তার সংগ্রহে ছিল না; তাই তাঁকে ইমাম আহমদের (রঃ) শরণাপন্ন হতে হয়।

ইমাম আহমদের দৃষ্টান্তঃ

আলী ইবনে মুসা আল হাদ্দাদ বলেন, একদা আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ও মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ আল–জাওহারীর সাথে কোন এক জানাযায় শরীক ছিলাম। দাফন কার্য সমাধা হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করল। ইমাম আহমদ (রঃ) বললেন,

হে ভাই! কবরের পাশে কোরআন পাঠ করা বিদ'আত।

অতঃপর কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদ ইবেন কুদামাহ তাঁকে বললেন, ইবনুল–লাজলাজ তার ছেলেকে আসীয়ত করেছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মাথার পাশে সূরায়ে বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করতে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি ইবেন ওমরকে এ অসীয়ত করতে শুনেছি। এ কথা শুনে ইমাম আহমদ (রঃ) বললেন, লোকটিকে পাঠ করতে বলে এসো।

সারকথা, উল্লেখিত ঘটনাগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবাদের এবং পরবর্তী যুগের ইমামদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না যার নিকট সব হাদীসই সংগৃহীত ছিল। বরং লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগহ করা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হাদীস ছুটে গিয়েছে। ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে অন্য দলীলের নিরিখে ফতোয়া প্রদান করেছেন; যার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এ ফতোয়া সহীহ হাদীসের এবং অন্যান্য ইমামদের মতের পরিপন্থী হয়েছে। অতঃপর অনেক ক্ষেত্রে তার জীবদ্দশাতেই সহী হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি নিজমত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে শাগরিদদের কেউ হাদীসটি পেয়ে ইমামের মতকে সংশোধন করে নিয়েছেন। যেমন, আবু ইউসুফের ঘটনাটিতে আমরা স্পষ্ট দেখে এসেছি। তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ইমামের কোন মত সহী হাদীসের বা অন্যান্য ইমামদের মতের সাথে পরিপন্থী হওয়ার সম্ভাব্য অনেকগুলো কারণের (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) মধ্যে এটা একটা কারণ মাত্র। কাজেই, কোন ইমামের কোন মত বাহ্যতঃ হাদীসের পরিপন্থী পেলেই চক্ষু বন্ধ করে বলে দেয়া যাবে না যে, তিনি এ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং অন্য কোন কারণ আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

একটি সংশয়ের নিরসনঃ

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসশাস্ত্র তো সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত রয়েছে। কাজেই ইমামদের হাদীস ছুটে যাওয়ার কারণ কি? যার ফলে তাদেরকে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এর জবাব হল, প্রথমতঃ এমন কোন হাদীস গ্রন্থ নেই যার মধ্যে সব হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে।১

১। ইমাম নববী (রঃ) বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে লিখেছেন,

و لم يستوعبا الصحيح و لا التزماه (التقريب و التيسير)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের রচিত সহীহ গ্রন্থগুলোতে সকল 'সহীহ' হাদীসের সমাবেশ ঘটাননি। তাঁরা সে চেষ্টাও করেননি। ইমাম বুখারী নিজেই বলেন,

ما ادخلت في كتاب الجامع الاما صح و تركت من الصحاح مخافة الطول

'আমি এ জামে গ্রন্থে (বুখারী শরীফ) সহীহ ব্যতীত অন্য কোন হাদীসের সমাবেশ ঘটাইনি। আর কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে অনেক 'সহীহ' হাদীসও ছেড়ে দিয়েছি। (তাদরীবুর রাবী- ৭৪) ইমাম বুখারী আরও বলেন,

صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة الف حديث

'আমি 'সহীহ' গ্রন্থটি ১৬ বছরে সংকলন করেছি এবং তাতে ছয় লক্ষ হাদীস হতে (বেছে এ হাদীসগুলো) সংকলন করেছি। আর এটাকে আমি আমার ও আল্লাহ তাআ'লার মাঝে দলীল স্বরূপ নির্ধারিত করে রেখেছি (বুখারীতে সর্বমোট ৭২৭৫ টি হাদীস রয়েছে।)

(ما تمس حاجة القاري لصحيح الامام البخاري ص ٤١ و ٤٥ طباعة دار الفكرعمان)

ইমাম মুসলিম (রঃ) বলেন,

و ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، انما وضعت ما اجمعوا عليه

আমার নিকট সংগৃহীত সকল 'সহীহ' হাদীস এ কিতাবে সংকলন করিনি। বরং যে সব হাদীসের (বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) সকলে একমত সেগুলোই সংকলন করেছি।

কাজেই এ ধরনের দু' একটি কিতাবের উপর ভরসা করে কি ফিকাহ শাস্ত্রের সকল সমস্যার সমাধান বের করা বা ফেকাহ শাস্ত্রের এ বিশাল ভাণ্ডার তৈরী হওয়ার কথা কল্পনা করা যায়? তাছাড়া শুধু কিতাবের মধ্যে হাদীসগুলো সংরক্ষিত থাকাই তো যথেষ্ট নয়, মুখস্থ থাকারও তো প্রশ্ন রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস গ্রন্থগুলোর প্রায় সব ক'টি সংকলিত হয়েছে ইমামদের পরবর্তী যুগে। কাজেই এ প্রশ্ন ইমামদের প্রতি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়তঃ পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে যে পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করেছেন পূর্ববর্তী ইমামদের স্মৃতি ভাণ্ডারে এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষিত ছিল। কেননা, তাঁরা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী যুগের। কাজেই তাদের কাছে সহী সনদে (বিশুদ্ধ সূত্রে) এমন সব হাদীস পৌছেছে, যা পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীনের নিকট পৌছেনি, অথবা দুর্বল সূত্রে বা অগ্রহণযোগ্য সূত্রে পৌছেছে। কাজেই এসব হাদীস গ্রন্থের

উপর ভিত্তি করে তাঁদের উপর কোন প্রশ্নের অবতারণা করা অবাঞ্ছনীয় নয় কি?

তৃতীয় কারণঃ কোন হাদীস আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত না হওয়া

অর্থাৎ, কোন একটি হাদীস কারো নিকট বিশুদ্ধ ও আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য জনের নিকট তা প্রমাণিত হয়নি। এই মূল মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাগুলোতে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ মূল মতপার্থক্যের কয়েকটি উৎস হতে পারে।

প্রথম উৎসঃ অগ্রহণযোগ্য সনদে হাদীস প্রাপ্ত হওয়া

এ আলোচনার পূর্বে প্রথমে আমরা মৌলিক কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী যুগের ইমামদের নিকট কোন হাদীস পৌছার পর হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রকার যাচাই বাছাই না করেই তারা আমল করা শুরু করতেন না। বরং হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা এবং আমল করার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট 'দাদীর মিরাস' সংক্রান্ত হাদীসটি পৌছার সাথে সাথেই সে অনুযায়ী ফায়সালা করেননি বরং তিনি প্রথমে তার বিশুদ্ধতায় নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হল, একদা জনৈকা মহিলা (যিনি সম্পর্কে কোন মৃত ব্যক্তির দাদী ছিলেন) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এসে জানতে চাইলেন, তিনি তাঁর নাতির মীরাস পাবেন কি না? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার জানা মতে কোরআন-হাদীসের কোথাও নাতির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে দাদী কোন অংশ পাবে বলে উল্লেখ নেই। তবে তুমি এখন চলে যাও। আমি অন্যান্য সাহাবীদের নিকট জেনে দেখি। অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে হযরত মুগিরাহ ইবনে শু'বাহ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আর কেউ (সাক্ষী) আছে কি? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে একই সাক্ষ্য দিলেন। তখন এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) মীরাসের ফয়সালা করলেন।

দ্বিতীয়তঃ কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার উপর। বর্ণনাকারী যতই বিশ্বস্ত স্মরণশক্তি সম্পন্ন হবেন হাদীসের গুরুত্বের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, বর্ণনাকারীর অসাধুতার পরিমাণ যত বেশী হবে হাদীসটি ততই দুর্বল বলে পরিগণিত হবে। বর্ণনাকারী যদি একেবারেই অসাধু হয় এবং অসত্য ভাষণে অভ্যস্ত ও জাল হাদীস রচনায় অভিযুক্ত হয়ে থাকে তবে সত্য বললেও তার কোন হাদীসই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে সে সত্য বলেছে।

তৃতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে একই হাদীস বিভিন্ন ইমামের নিকট বিভিন্ন সনদে (সুত্র পরম্পরায়) পৌছেছে। কারো নিকট সহী সনদে, কারো নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সনদে পৌছেছে। ফলে যার নিকট সহী সনদে পৌছেছে তিনি হাদীসটিকে সহী বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে যার নিকট দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য সূত্রে পৌছেছে তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

তাছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের ইমামদের মাঝে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ তফাৎ রয়েছে। কেননা, পূর্ব যুগের ইমামগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী যুগের। ফলে তাদের পক্ষে মাত্র দুই বা তিন সূত্রে হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের ইমামদের মাঝে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ হওয়াতে তাঁদের হাদীস সংগ্রহ করতে সুত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বলাবাহুল্য যে, সূত্রের সংখ্যা যতই কম হবে সনদের বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন থাকা এবং হাদীসের কথা অবিকৃত থাকার সম্ভাবনা ততই বেশী হবে। পক্ষান্তরে সূত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে সনদের বিশ্বস্ততা ততই লাঘব হবে এবং হাদীসের বাক্য বিকৃতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনাও ততই অধিক হবে। কাজেই, পূর্ববর্তী যুগের লোকদের পক্ষে স্বভাবতঃই বিশ্বস্ত সূত্রে এবং অধিক সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করা যতটা সম্ভব হয়েছিল ততটা পরবর্তীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনুরূপ, একই হাদীস পূর্বযুগের লোকেরা সঠিক সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের লোকদের কাছে পৌছতে গিয়ে সূত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিশ্বস্ততায় বিঘ্ন ঘটেছে অথবা বিকৃতি এসেছে। ফলে তাঁদের দৃষ্টিতে সেটি যয়ীফ বলে বিবেচিত হয়েছে।

এ মৌলিক ও দীর্ঘ আলোচনার পর এবার আমরা অনায়াসেই নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি–

(এক) হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি অনেকটা আপেক্ষিক। কাজেই কোন হাদীস এক ইমামের দৃষ্টিতে সহী হলে সকলের দৃষ্টিতে সেটা সহী হওয়া জরুরী নয়; বরং অন্যদের দৃষ্টিতে দুর্বল বলে বিবেচিত হতে পারে।

(দুই) এই মূল মতবিরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলোতে স্বভাবতঃই মতবিরোধ দেখা দিবে। কেননা, কোন ইমামই তো কোন হাদীস পাওয়ার পর তার বিশুদ্ধতা যাচাই বাছাই না করে আমল শুরু করে দেননি। কাজেই যাঁর কাছে হাদীসটি সহী সূত্রে পৌছেছে, তিনি তারই ভিত্তিতে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন। পক্ষান্তরে অপরজন যেহেতু অগ্রহণযোগ্য সূত্রে হাদীসটি পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট কোরআন ও হাদীসে এর পরিপন্থী অন্যান্য প্রবল যুক্তি রয়েছে। কাজেই তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ করতে পারেননি।

আর এ ব্যাপারে তিনি অপারগই বটে। সাহাবাদের যুগে ও ইমামদের যুগে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে শুধু হযরত ওমরের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ক্ষান্ত হবো।

সূরায়ে তালাকের প্রথম আয়াতের ভিত্তিতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)র ফতোয়া ছিল যে, তার ভরণ–পোষণ ও বাসস্থান দু'টোই বহন করার দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে। অতঃপর যখন তাঁর নিকট ফাতেমা বিনতে কাইসের এই হাদীসটি পৌছল–

(মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ফাতেমা বিনতে কাইস বলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান অথবা ভরণ–পোষণ কোনটিরই হুকুম দেননি।

হযরত ওমর (রাঃ) হাদীসটি শুনে মন্তব্য করেন,

'এমন একজন মহিলার কথায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নতকে উপেক্ষা করতে পারি না যার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই যে, বিষয়টি তার স্মরণ রয়েছে না ভুলেই গিয়েছে।

কাজেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ভরণ–পোষণ ও বাসস্থান দু'টোই পাবে।

কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন। (অতঃপর তিনি সূরায়ে তালাকের প্রথম আয়াতটি পাঠ করেন)

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, অধিকাংশ ইমামই এসব পরিস্থিতিতে নিজ মন্তব্য পেশ করার সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এর বিপক্ষে কিন্তু একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে (বিশুদ্ধ সূত্রে না পাওয়ায় তা গ্রহণ করতে আমি সক্ষম হইনি।) হাদীসটি সহী বলে প্রমাণিত হলে সেটাই হবে আমার মত।

(তিন) যেহেতু হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি অনেকটা আপেক্ষিক কাজেই কোন হাদীসকে যাঁরা সহী বলে মন্তব্য করেছেন তাঁদের মন্তব্যের ভিত্তিতে অন্য ইমামদের সম্পর্কে বলা ঠিক নয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করছেন।

অনুরূপ, যাঁরা যয়ীফ বা অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন তাঁদের মন্তব্যের ভিত্তিতে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে 'অপবাদ' চাপিয়ে দেয়া যাবে না যে, তাঁরা যয়ীফ বা 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য) হাদীস ভিত্তিক ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের এ ফতোয়া ভুল। কেননা, তিনি তো হাদীসটি সহী সনদে পেয়েছেন।

অনুরূপ, প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর রচয়িতা মুহাদ্দিসগণ প্রায় সবাই ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও অনুসরণীয় ইমামদের পরের যুগের।১

১। ফুকাহা কেরামের মধ্যে—
ইমাম আবু হানীফা (রঃ)র জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৫০
ইমাম মালেক (রঃ)র জন্ম ৯৩ হিজরীতে, মৃত্যু ১৭৯
ইমাম শাফেয়ী (রঃ)র জন্ম ১৫০ হিজরীতে, মৃত্যু ২০৪
ইমাম আহমদ (রঃ)র জন্ম ১৬৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৪১
অপরপক্ষে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে
ইমাম বুখারী (রঃ)র জন্ম ১৯৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৫৬
ইমাম মুসলিম (রঃ)র জন্ম ২০৪ হিজরীতে, মৃত্যু ২৬১
ইমাম নাসায়ী (রঃ)র জন্ম ২১৫ হিজরীতে, মৃত্যু ৩০৩
ইমাম আবু দাউদ (রঃ)র জন্ম ২০২ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৫
ইমাম তিরমিযি (রঃ)র জন্ম ২০৯ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৯
ইমাম ইবনে মাজা (রাঃ)র জন্ম ২০৭ হিজরীতে, মৃত্যু ২৭৩

কাজেই পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের কোন গ্রন্থের মন্তব্য দ্বারা ইমামদের প্রতি আপত্তি করা মোটেই সঙ্গত হবে না, বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যেহেতু সাবার আগের যুগের ছিলেন এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ছিলেন প্রায় এক শতাব্দী পরের সেহেতু বুখারী ও মুসলিমের কোন সহী হাদীস দেখেই এ মন্তব্য করে দেয়া যাবে না যে, ইমাম আবু হানীফা ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করেছেন।

অনুরূপ, বুখারী মুসলিমে অথবা সিহা সিত্তায় কোন হাদীস নেই বলেই এ মন্তব্য করা যাবে না যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় অথবা দুর্বল। কেননা, নিঃসন্দেহে পূর্বযুগের ইমামগণের সংগ্রহে এঁদের তুলনায় হাদীস সংখ্যা অধিক ছিল এবং তাঁদের সূত্র ছিল এঁদের তুলনায় অধিক প্রবল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বেশ উদারতার সাথে এ বাস্তবতা স্বীকার করে লিখেছেন,

বরং এসব হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা এঁদের তুলনায় সুন্নতে রাসূল সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা, এমন অনেক হাদীস তাদের কাছে পৌঁছেছে এবং সহী বলে প্রমাণিত হয়েছে যা আমাদের নিকট মোটেই পৌঁছেনি কিংবা অপরিচিত বা মুনকাতি' (মধ্যসূত্র বিচ্ছিন্ন) সনদে পৌঁছেছে। (রাফউল মালাম আ'নিল আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা–১২ দারুল কুতুব বইরুত কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ)

দ্বিতীয় উৎসঃ 'ইত্তিসালে সনদ' (সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকা)–র ক্ষেত্রে মত পার্থক্যঃ

(মূলতঃ এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, কোন হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

(এক) ইত্তিসালে সনদ (সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকা ও কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়া)

(দুই) 'আদালতে রাবী' (বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হওয়া)

(তিন) 'যবতে রাবী' (হাদীসটি বর্ণনাকারীর নিখুঁতভাবে স্মরণ থাকা)

(চার) হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' (সূত্র ও কথা) বিরলতা ও অভিন্নতা থেকে মুক্ত হওয়া।

(পাঁচ) মারাত্মক ধরনের ব্যতিক্রমধর্মিতা ও আপত্তিদুষ্টতা থেকেও মুক্ত থাকা।

এ মৌলিক পাঁচটি শর্তের ব্যাপারে দ্বিমত নেই। কিন্তু এর বিস্তারিত বিশ্লেষণে এসেই মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রথম শর্ত হলো 'ইত্তিসালে সনদ' বা সূত্র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকা। অর্থাৎ রাবী যার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তার সাথে সাক্ষাতের প্রমাণ পাওয়া। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এটা اللقاء নামে প্রসিদ্ধ।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী প্রমুখের শর্ত হল, জীবনে একবার অন্ততঃ সাক্ষাত ঘটেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। অপরপক্ষে ইমাম মুসলিম প্রমুখের শর্ত সামান্য শিথিল। তাদের দৃষ্টিতে বাস্তবে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়, বরং স্থান-কালের বিচারে সাক্ষাৎ সম্ভব বলে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। এ মূলনীতিতে মতের ভিন্নতার ভিত্তিতে একই হাদীসের মূল্যায়নের ব্যাপারে মতের অমিল দেখা দিয়েছে। যেমন, কোন হাদীসের সনদে রাবীদ্বয়ের পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি তখন সে হাদীসটি ইমাম মুসলিম প্রমুখ সহী বলে মন্তব্য করবেন। অপরপক্ষে ইমাম বুখারী প্রমুখের মন্তব্য বিপরীত হবে। ফলে, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম মুসলিম প্রমুখ যে সব ফতোয়া ইস্তিম্বাত করেছেন তাতে ইমাম বুখারী প্রমুখের সাথে মতের ভিন্নতা দেখা দিবে।

তৃতীয় উৎসঃ হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে মতপার্থক্যঃ

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন তাবেয়ী তাঁর উর্ধতন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বর্ণনা করে দেয়া। চাই সে সাহাবী নবীন হোন কিংবা প্রবীন।

উসূলে ফিকাহর পরিভাষায় হাদীসে মুরসাল হল, কোন রাবী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি।[১]

১। আল্লামা আল-আমেদী তার রচিত আল-ইহ্‌কাম নামক কিতাবে লিখেছেন-

و صورته ان يقول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

হাদীসে মুরসালের ব্যাখ্যা এই যে, কোন বিশ্বস্ত রাবী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অথচ তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাৎ ঘটেনি। (আল-ইহকাম-২ঃ খঃ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

এ জাতীয় হাদীস দ্বারা মাসআলা ইস্তিম্বাত করা যাবে কিনা এ ব্যাপারেও ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে হাদীসে মুরসাল দুর্বল হাদীস বলেই বিবেচিত এবং ইস্তিম্বাতের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, ইমাম মুসলিম (রঃ) সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় লিখেছেন,

আমাদের ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের মূলনীতি অনুযায়ী হাদীসে মুরসাল দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা সহ অন্যান্য ফুকাহাদের মতে হাদীসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য।

ইমাম জামালুদ্দীন আল-যাইলায়ী বলেন,

হানাফী ওলামায়ে কেরাম হাদীসে মুসনাদের মত হাদীসে মুরসালকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবৃয়ে তাবেয়ীনদের মধ্যে দু'শ শতাব্দি পর্যন্ত অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের এ নীতিই ছিল। কেননা, কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে মুরসাল (বিশেষতঃ শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের মুরসাল)কে উপেক্ষা করা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি শীর্ষভাগ উপেক্ষা করারই নামান্তর।

অনুরূপ, আল্লামা আল-আলা আল--বুখারী (রঃ) বলেন,

হাদীসে মুরসালকে উপেক্ষা করা সুন্নাহর একটি বিরাট অংশকে উপেক্ষা করার নামান্তর। কেননা, হাদীসে মুরসালের সংখ্যা এত বেশী যে, সকল হাদীসে মুরসালকে একত্রিত করাতে প্রায় ৫০ খণ্ডের মহাগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কয়েকটি পরিস্থিতি সাপেক্ষে হাদীসে মুরসাল গ্রহণ করে থাকেন। যেমন,

১। সাহাবীর হাদীসে মুরসাল ২। অথবা হাদীসটি অন্য সূত্রে মুসনাদরূপে বর্ণিত। ৩। হাদীসটির অনুকূলে কোন সাহাবীর ফতোয়া রয়েছে। ৪। হাদীসটির অনুকূলে অধিকাংশ আলেমের ফতোয়া রয়েছে। ৫। এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তিনি কোন অবিশ্বস্ত রাবীর ক্ষেত্রে 'ইরসাল' করে থাকেননা। যেমন, ইবনেমুসায়্যাব।১

১। হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে।
تدريب الراوي ١/١٥٩ -١٧١ محاسن الاصطلاح : ١٣ ، التبصرة و التذكرة ١/ ١٤٤
فتح المغيث ١/١٢٨، جامع التحصيل في احكام المراسيل، الباعث الحثيث ١٠٧ - ٧٧٤

মোটকথা, এ মূলনীতিতে মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিবে। যেমন, কোন বিষয়ে যদি হাদীসে মুরসাল ব্যতীত অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যায়। তখন মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসে মুরসালটিকে যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মাসআলার সমাধানে অন্য যুক্তির শরণাপন্ন হবেন। অনুরূপ, যতক্ষণ হাদীসে মুরসালটি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি দ্বারা সমর্থিত না হবে ততক্ষণ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তা গ্রহণ করবেন না এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলাটির সমাধানে অন্য দলীলের শরণাপন্ন হবেন। ফলে স্বভাবতঃই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে। যেমন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় জনৈক অন্ধ ব্যক্তি এসে মসজিদের ভিতরের একটি গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তা দেখে অনেকে (নামাযের মধ্যেই) হেসে ফেললেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে পুনরায় অযু করে নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন। (আল–মারাসীল–৭৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে ইবনে আবূ শাইবাহ–১ খঃ, ৪১ পৃষ্ঠা)

এজাতীয় আরও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী ওলামায়ে কেরাম উচ্চস্বরে হাসির কারণে নামাযের সাথে সাথে অযুও ভঙ্গ হওয়ার ফতোয়া পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে যেহেতু হাদীসগুলো মুরসাল এবং ইমাম শাফেয়ী– আরোপিত শর্তে উত্তীর্ণ নয়, উপরন্তু তা উসূলের পরিপন্থী। তাই ইমাম শাফেয়ীসহ জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসটি গ্রহণ করেননি।১

১। বিস্তারিত জানার জন্য আর–রিসালাহ, ৪৬৯ পৃঃ, নাসবুর–রায়াহ ১খঃ ৪৭–৫৩ পৃঃ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১খঃ, ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

চতুর্থ উৎসঃ রাবীর 'আদালত' (বিশ্বস্ততা) র মাপকাঠির ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

হাদীস সহী বলে প্রমাণিত হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল রাবী 'আদেল' তথা বিশ্বস্ত হওয়া। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু বিশ্বস্ততার মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। কারও বক্তব্য হল, কোন বর্ণনাকারী 'আদেল' হওয়ার জন্য তিনি মুসলমান হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকাই যথেষ্ট। কেউ বলেছেন, বরং এর সাথে বাহ্যিক ক্ষেত্রে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ থাকতে হবে। কেউ আরো কঠোরতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ উভয় ক্ষেত্রেই তার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হতে হবে। আরও মতপার্থক্য রয়েছে যে, কারো বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একজন ইমামের সাক্ষ্য যথেষ্ট না দু' জনের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অনুরূপ, কোন রাবীর বিশস্ততা ক্ষুণ্নকারী দুর্বলতাগুলো নির্ণয়ের ব্যাপারে মতপার্থ্যক্য রয়েছে। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোন রাবীর বিশেষ কোন দুর্বলতা এক ইমামের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা অন্য ইমামের হয়নি। ফলে একই রাবী সম্পর্কে কেউ বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করছেন অন্যরা অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করছেন। 'রেজালশাস্ত্র' খুললে খুব কম রাবীই পাওয়া যাবে যার সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

এমনকি ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আলী ইবনে মাদীনী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, যুহায়ের ইবনে হারব প্রমুখ ইমামও (কোরআনের উচ্চারিত রূপটিকে 'মাখলূক' বলে ফতোয়া দেয়ার দায়ে) ঘোর সমালোচনার শিকার হয়েছেন। একবার নিশাপুর এলাকার আলেম সমাজ ও জনসাধারণ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার নেতৃত্বে বেশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে ইমাম বুখারীকে অভ্যর্থনা জানান এবং অত্র এলাকার সকল ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন তাঁর দরসে হাদীসে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যেই তিনি কোরআনের উচ্চারণ 'মাখলূক' না গায়রে মাখলুক এ প্রশ্নের জাবাবে বললেনঃ

'আমাদের সকল কর্মই 'মাখলুক' আর আমাদের ভাষার উচ্চারণও আমাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত (কাজেই কোরআনের উচ্চারণ 'মাখলুক' হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়।)

এ জবাবের সাথে সাথেই সমস্ত এলাকা জুড়ে বিপুল হাঙ্গামার ঝড় বয়ে যায় এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে নিশাপুরের লোকেরা কোরআনের পরই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাবের সংকলক ইমাম বুখারীর সাথে যে অমানবিক ব্যবহার করেছে তা বলার মত নয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর সাথে বয়কট করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন–

'কোরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়। কোরআনের উচ্চারণকে যে 'মাখলুক' বলে ধারণা করে সে বিদ'আতী। তার সঙ্গে উঠাবসা করা যাবে না। কথাও বলা যাবে না। আজকের পর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কাছে যাবে তাকে তোমরা কলংকিত ধরে নেবে। কেননা, তার কাছে সেই যাবে যে তার মতানুসারী।

এ ঘোষণার ফলে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ও আহমদ ইবনে সালাম ব্যতীত সব শাগরিদই ইমাম বুখারীর সঙ্গ ছেড়ে দেন। এমনকি ইমাম মুসলিমও কি যেন ভেবে স্বীয় الجامع الصحيح। গ্রন্থে ইমাম বুখারীর কোন রিওয়ায়েত উল্লেখ করেননি। আর ইমাম যুহালী (রঃ)র রিওয়ায়েতগুলো তো আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। হাফেয ইবেন হাজার (রঃ) 'হাদইউস–সারী লি–ফাতহিল বারী'তে ইমাম মুসলিমের এ পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেনঃ

ইমাম মুসলিম সত্যিকার ইন্‌সাফের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা (তার দৃষ্টিতে বিতর্কিত) দু' জনের কারও রেওয়ায়েত নিজ হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এ বিষয়টি যুহালী ও তার শাগরিদ পর্যন্তই সীমিত থাকেনি বরং ইয়াহইয়া ইবনে যুহালী (রঃ) অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের নিকটও নিশাপুরের ঘটনাটি সম্পর্কে অবগতিনামা পাঠান। ইবনে আবূ হাতেম স্বীয় আল–জারাহ ওয়াত্তাদীল নামক কিতাবে ইমাম বুখারী সম্পর্কে লিখেছেন–

'আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ২৫০ হিজরী সনে আগমন করেন। আমার পিতা এবং আবু যারআ'হ রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন; অতঃপর যখন তাঁদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী লিখে পাঠালেন যে, 'বুখারী' নিশাপুরে লোক সমাবেশে (কোরআনের উচ্চারণ

'মাখলুক' বলে) ফতোয়া দিয়েছেন। এ সংবাদ প্রাপ্তির পর আমার পিতা ও আবু যারআ'হ রাযী তাঁরা উভয়ই ইমাম বুখারীর বরাতে হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দেন। বিষয়টি এমন জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এর ভিত্তিতেই উকাইলী (রঃ) আলী বিন আল মাদীনীর মত স্বনামধন্য মুহাদ্দিসকেও দুর্বল বর্ণনাকারীর তালিকাভুক্ত করেছেন।১

১। হাফেয যাহবী (রঃ) এ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে লিখেছেনঃ

'উকাইলী তোমার কি আকল নেই? তুমি কি জানো না, কার ব্যাপারে মুখ খুলেছ। আমি তোমার (এ মন্তব্যের) এমন কঠোর সমালোচনা করছি একমাত্র এ জন্যই যাতে এ মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে যেসব অহেতুক মন্তব্য করা হয়েছে তার নিরসন ঘটে।

তুমি হয়ত বেমালুম ভুলে গেছো যে, তুমি যাদের সমালোচনায় মেতে উঠেছো এদের সবাই তোমার তুলনায় অনেক গুণ বেশী বিশ্বস্ত। বরং তাঁরা এমন আরও অনেকেরই তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত, যাদেরকে তুমি তোমার যায়ীফ বর্ণনাকারীর ফিরিস্তিতে উল্লেখ করোনি। এ ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসই সংশয়ী হতে পারেন না।

বরং কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি এককভাবে কোন হাদীস সংগ্রহ করেন, তবে তো সেটা তার অধিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। সেই সাথে প্রমাণ করে যে, তিনি তার সমপর্যায়ের অন্যান্যদের চেয়ে অধিক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু, যদি তাদের কোন স্পষ্ট ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তবে ভিন্ন কথা এবং তখন সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হবে।

আচ্ছা, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকেই লক্ষ্য করে দেখ না, তাঁদের মধ্যে ছোট বড় এমন কোন সাহাবীই নেই যিনি কোন হাদীসের একমাত্র সংগ্রহকারী নন। তাবেয়ীনদের বেলায়ও তাই। তাদের প্রত্যেকের নিকটই এমন ইলম রয়েছে যা অন্যদের সংগ্রহে নেই।

মোটকথা, রাবীর আদালাত সম্পর্কিত বিষয়টি বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ ও বিতর্কিত। এ বিষয়ে রিজাল শাস্ত্র নামে সতন্ত্র এক শাস্ত্র তৈরী হয়েছে এবং অসংখ্য কিতাব লেখা হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তার বিশদ বিবরণ পেশ করা অসম্ভবই বটে। তবে এ আলোচনা দ্বারা এতটুকু অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, রাবীর বিশ্বস্ততার বিষয়টি যেহেতু বিতর্কিত, কাজেই তার রিওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারটিও বিতর্কিত হবে। ফলে হাদীসটি থেকে আহরিত মাসা'আলায় সৃষ্টি হবে মতভিন্নতা। অর্থাৎ, যার দৃষ্টিতে হাদীসটি সহী

ও আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তিনি আমল করেছেন। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তিনি হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই তার ব্যাপারে এ মন্তব্য করা যাবে না যে, তিনি হাদীস পরিপন্থী ফতোয়া পেশ করেছেন।

পঞ্চম উৎসঃ রাবীর স্মরণ ও সংরক্ষণের পরিমাণের ব্যাপারে মতপার্থক্যঃ

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য মুহাদ্দিসীনের নিকট তৃতীয় শর্ত হল রাবীর تام الضبط পরিপূর্ণ স্মরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা থাকা। এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। তবে, এর বিশ্লেষণে এসে তাদের পরস্পরে মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মুহাদ্দিসীন রাবীর লিখিত সংরক্ষণ ও স্মৃতির সংরক্ষণ উভয়টিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)র শর্ত হল, হাদীসটি শুনার সময় থেকে রিওয়ায়েত করা পর্যন্ত রাবীর সম্পূর্ণ স্মরণ থাকতে হবে। মাঝে কখনো ভুলে গিয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ শর্তের প্রেক্ষিতে তার সাথে অন্যান্য ইমামদের অসংখ্য হাদীসের ব্যাপারে সহী যয়ীফ হওয়ার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সেখান থেকেই মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সূত্রপাত হয়েছে।

এখানে এসেও হয়ত কোন বিবেকশূন্য ব্যক্তি অন্যান্য ইমামের সত্যায়িত কোন হাদীস দেখে মন্তব্য করে বসবেন যে, ইমাম আবু হানীফা অমুক সহী হাদীসের পরিপন্থী মন্তব্য করেছেন। অথচ, তাঁর দৃষ্টিতে সে হাদীসটি যয়ীফ বলে বিবেচিত ছিল।

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য অন্যান্য শর্তগুলোতেও ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে সে আলোচনা আর করা হলো না।

ষষ্ঠ উৎসঃ দুর্বল হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্যঃ

ইমামদের নিজ নিজ শর্তানুযায়ী যে সব হাদীস বিশুদ্ধ বা হাসান বলে সাব্যস্ত হবে তার উপর আমল করার ব্যাপারে এবং এর ভিত্তিতে শরীয়তের

আহকাম ইস্তিম্বাত করার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু, দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এবং মুস্তাহাব আমলের বেলায় যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন।

এছাড়া শরীয়তের অন্যান্য আহকাম অর্থাৎ, হালাল হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (রঃ) যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন। (মিরকাত ১খঃ, ১৯ পৃঃ)

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামদের মন্তব্য শুনুন। হানাফী ইমাম ইবনুল হোমাম বলেনঃ

একান্ত 'মওযু' (জাল) না হলে যয়ীফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব বিষয় প্রমাণিত হবে। (ফাত্হুল ক্বাদীর–১খঃ, ৪১৭ পৃঃ)

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম নববী (রঃ) বলেন–

ওলামা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম ও অন্যান্যরা (একবাক্যে) মন্তব্য করেন, নিতান্ত 'মওযু' (জাল) না হলে যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে ফাযায়েল, তারগীব (উৎসাহ প্রদান) তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) এর ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয ও মুস্তাহাব। তবে, আহকাম (যেমন হালাল–হারাম, ক্রয়–বিক্রয়, বিবাহ–শাদী ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া আমল করা যাবে না। অবশ্য সতর্কতার বেলায়; যেমন, যদি কোন যয়ীফ হাদীস বেচা–কেনার কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিষেধ করে অথবা কোন বিবাহকে সমর্থন না করে তবে সে ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে তা থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব। কিন্তু, ওয়াজিব নয়।

মালেকী মাযহাবের শেষের দিকের জনৈক শীর্ষস্থানীয় ইমাম বলেন–

ইমাম মালেকের হাদীসে মুরসাল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে মুকাত্তা' ও মু'যাল তাঁদের মতে দলীলযোগ্য। কেননা, মৌলিক অর্থে এগুলো মুরসালের অন্তর্ভুক্ত।

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদের (রঃ) বিভিন্ন মন্তব্য বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে নাজ্জার আল হাম্বালী স্বীয় কিতাব শারহুল কাওকাবুল মুনীরে (২১ খঃ, ৫৭৩ পৃঃ) সে সব মন্তব্য উল্লেখ করে লিখেন, ইমাম সাহেব বলেনঃ হাদীসে মুরসাল সম্পর্কে আমার নীতি হল, যয়ীফ হাদীসকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না, যতক্ষণ না তার বিপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। (আল-কাওকাবুল মুনীর-২খঃ, ৫৭৩ পৃঃ)

আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে আবূ হাতেমসহ মুহাদ্দিসদের একটি জামাতও আহকামের ক্ষেত্রে অন্য কোন আয়াত বা হাদীস না পেলে একেবারেই দুর্বল নয় এমন যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেন। অনুরূপ, ইবনে হাযম (রঃ) দোয়া কুনূতের ব্যাপারে বলেন

যদিও 'আছার' (সাহাবার কওল) দলীল নয়। কিন্তু দোয়া কুনূতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কোন দলীল পাওয়া যায়নি। কাজেই এটি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট যয়ীফ হাদীস কিয়াস অপেক্ষা উত্তম। আলী ইবনে হায্‌ম বলেন, আমাদের বক্তব্যও তাই। (আল-মুহাল্লা ৪খঃ, ১৪৮ পৃঃ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রঃ)র ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, একবার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন এক শহরে একজন মুহাদ্দিস রয়েছেন, কিন্তু তার সহী ও দুর্বল হাদীসের মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান নাই। আর একজন রয়েছেন যিনি কিয়াসপন্থী। সেখানে কোন মাসআলার সমাধানের জন্য কোন্ জনের কাছে যেতে হবে? জবাবে আব্বা বললেনঃ

মুহাদ্দিসের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিয়াসপন্থীর কাছে নয়। কেননা, যয়ীফ হাদীস কিয়াস অপেক্ষা প্রবল।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)ও কোন বিষয়ে অন্য কোন যুক্তি খুঁজে না পেলে হাদীসে মুরসালের উপর আমল করে থাকেন (অথচ, তাঁর দৃষ্টিতে 'হাদীসে মুরসাল' যয়ীফ হাদীস বলে বিবেচিত) (ফাত্‌হুল মুগীছ-১খঃ, ২৮৮ পৃঃ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বইরুত কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ)

হাদীসে মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার আর একটি ক্ষেত্র হল, কোন হাদীসের সম্ভাব্য দু'টি অর্থের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে হাদীসে

মুরসালকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম নবভী (রঃ) বলেন,

'হাদীসে মুরসাল' দ্বারা তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান জায়েয।

মোটকথা, আহকামের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা নিয়ে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসদের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম গ্রহণ করেছেন। অনেকে শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটেই গ্রহণ করেননি। আর এ মৌলিক মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে একটি ভুল ধারণার অপনোদন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেকের ধারণা, যয়ীফ হাদীস কোন ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি ফাযায়েল, তারগীব ও তারহীবের ব্যাপারেও অনেকে যয়ীফ হাদীসকে অগ্রহণীয় মনে করেন। যেন যয়ীফ আর মওযু হাদীস একই পর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং হাদীসটিই যেন দুর্বল। বস্তুতঃ হাদীস সম্পর্কে বিশেষতঃ যয়ীফ হাদীসের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ ভুল ধারণার মূল কারণ। অথচ, আমরা উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে যে ধারণা পেলাম তা নিম্নরূপঃ

(এক) যয়ীফ হাদীস বলা হয় যার 'সনদের' বিশেষ কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই দুর্বলতার বিষয়টি স্বয়ং হাদীসের সাথে নয় বরং সনদের সাথে।

(দুই) হাদীসের সহী–যয়ীফ নিরূপণের বিষয়টি বিতর্কিত। কাজেই, কোন একজন মুহাদ্দিস যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন বলেই হাদীসটির প্রতি বীতঃশ্রদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কেননা, হয়ত অন্যদের সন্ধানে সেটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(তিন) যয়ীফ হাদীসগুলোর দুর্বলতার ক্ষেত্রে স্তরভেদ রয়েছে। কাজেই গড়ে সবগুলোকে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করা যাবে না।

(চার) যয়ীফ হাদীস আর মওযু (জাল) হাদীস একই তালিকাভুক্ত নয়; বরং মওযু হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে যয়ীফ হাদীস ফাযায়েল, মুস্তাহাব আমল ও তারগীব–তারহীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফুকাহার মতে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ ও মুহাদ্দিসীনের একটি জামাত যয়ীফ হাদীস কবুল করে

থাকেন। যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য বিস্তারিত আমরা দেখে এসেছি।

অথচ, পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনেকে ফাযায়েল বা তরগীব-তারহীব সংক্রান্ত কোন হাদীস সম্পর্কে যয়ীফ বা সমালোচিত শুনলেই অমনি তা উপেক্ষা করে বসেন। আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিসগণ যাঁরা সারা জীবন কোরআন হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস যাঁদের অন্তকরণে ছিল সংরক্ষিত। জীবনপণ সাধনা করে যাঁরা হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁদের সিদ্ধান্তকে আজ আমরা দু' একটি হাদীসের তরজমা দেখেই চ্যালেঞ্জ করে বসি। ভুলে যাই তাঁদের মাঝে আর আমাদের মাঝে তফাতের কথা।

সপ্তম উৎসঃ রিওয়ায়াতুল হাদীস বিল মা'নার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিসৃত হাদীসের হুবহু শব্দের প্রতি লক্ষ না রেখে শুধু তার ভাবার্থ বর্ণনা করা। এতে অনেক ক্ষেত্রে রাবী প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই এ জাতীয় বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জমহুর ওলামার মত হল, রাবীর আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত আরোপ করেছেন। বস্তুতঃ তা ইমাম সাহেবের বিচক্ষণতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শর্তটি হল, বর্ণনাকারীকে ফকীহ হতে হবে। ইমাম সাহেবের যুক্তি হল, অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সামান্য তফাতে অর্থের খুব একটা ভিন্নতা সৃষ্টি না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেক সময় এক একটি শব্দের উপর নির্ভর করে অনেক মাসআলার সমাধান, যা একমাত্র ফেকাহশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

বিষয়টিকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যার দ্বারা ইমাম আবু হানীফার (রঃ) বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের গভীরতাও কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

নাসায়ী শরীফে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার একটি বিশেষ

সময় নির্ধারিত ছিল। সে সময় আমি তার নিকট হাযির হয়ে অনুমতি চাইতাম। তখন তিনি নামাযে ব্যস্ত থাকলে গলায় কাশির শব্দ করতেন। আওয়াজ পেলে আমি প্রবেশ করতাম। আর ব্যস্ত না হলে সরাসরি অনুমতি দিতেন। এ হাদীসে কোন কোন বর্ণনাকারী (تنحنح) (গলায় কাশির শব্দ করা) এর স্থলে (سبح) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ তাসবীহ পাঠ করা।১ এ শব্দ দু'টোর পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই মাসআলা ইস্তিম্বাতের বেলায় ইমামদের পরস্পরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যেমন,

ইমাম আহমদ (রঃ)র মতে নামাযে রত আছে এ কথা বুঝানোর জন্য তাসবীহ পাঠ করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। গলায় কাশির শব্দ করলে তাঁদের মাযহাবের কারো কারো মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে আর পরবর্তী যুগের ওলামাদের মতে মাকরূহ হবে। (আল-মুগনী,১খঃ ৭০৬-৭০৭ পৃঃ, শরহু মুনতাহাল ইবাদাত ১খঃ ২০১ পৃঃ)

শাফেয়ী মাযহাব মতে, নামাযে তাসবীহ পাঠ করলে কোন অবস্থাতেই নামায ফাসেদ হবে না।২ কিন্তু গলায় শব্দ করলে যদি দু'টি হরফ উচ্চারিত হয়ে যায় তবে শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশের ফতোয়া হল, নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।৩

১। সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২খঃ, ৫৪ পৃঃ,
২। আল-মাজমূ' ৪খঃ ২১ পৃঃ
৩। আল-মাজমূ' ৪খঃ, ১০ পৃঃ)

হানাফী মতে, তাসবীহ পাঠ করাতে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু বিনা ওজরে গলায় শব্দ করলে নামায ফাসেদ হবে। আর ওজর বশতঃ যেমন, তেলাওয়াতের জন্য গলা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে অথবা সে নামাজে আছে বলে কাউকে সতর্ক করার লক্ষ্যে গলায় শব্দ করলে নামায ফাসেদ হবে না।

(আছারুস হাদীস ৩১ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

আর একটি দৃষ্টান্তঃ

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা নামাযে আসতে শান্তভাবে আসবে।

অতঃপর (ইমামের সাথে) যে কয় রাকাত পাবে পড়ে নিবে, আর যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নিবে।[১] অন্য রিওয়ায়েতে (فاتموا) (পুরা করে নিবে) এর স্থলে (فاقضوا) রয়েছে।[২]

১। বুখারী, হাদীস নং-৬৩৫

২। মুসনাদ আল হুমাইদী ২খঃ, ৪১৮ পৃঃ, হাদীস নং-৪১৮ মুসনাদ ইমাম আহমদ ২খঃ, ২৭০ পৃঃ

আর একটি বর্ণনাতে রয়েছে (وليقض ما سبقه) অর্থাৎ, যা ছুটে গিয়েছে তা কাযা করে নেবে। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-২খঃ ২৮৮ পৃঃ)

শব্দের এ সামান্য পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে হয়ত কোন গুরুত্ব পূর্ণ নয়। অথচ, শব্দ দু'টির উপর ভিত্তি করেই ফেকাহ শাস্ত্রে ইমামদের মাঝে বিরাট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কোন মুক্তাদী যদি চার রাক'আত নামাযের চতুর্থ রাকআতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয়, তবে ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর তার ছুটে যাওয়া তিন রাকআত কিভাবে আদায় করবে। প্রথম রেওয়ায়েত, অর্থাৎঃ (فاتموا) 'তোমরা অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে নেবে'-এর অর্থ দাঁড়ায়, মুক্তাদী যে রাকআত ইমামের সাথে আদায় করেছিল সেটা হল তার প্রথম রাকআত। ফলে ইমামের সালাম শেষে সে যখন ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াবে সেটা হবে তার দ্বিতীয় রাকআত। কাজেই তাতে 'ছানা' পাঠ করতে হবে না এবং এ রাকআত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। অবশিষ্ট দু' রাকআতে ছুরাও মিলাতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী' (রঃ) ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম এ ফতোয়াই দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত (فاقضوا) অর্থাৎ ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো আদায় করে নেবে- অনুযায়ী ইমামের নামায শেষে যখন দাঁড়াবে সেটা হবে তার প্রথম রাকআত। কাজেই তাতে 'ছানা' পড়তে হবে এবং প্রথম দুই রাকআতে সুরায়ে ফাতেহার সাথে সুরা মিলাতে হবে। ইমাম আবু হানীফা প্রমূখ এ ফতোয়াই পেশ করেছেন। উপরন্তু তাঁরা অন্য রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে

বলেছেন, যেহেতু তার ইমামের সাথে আদায় করা রাক'আতটি ছিল প্রকৃত প্রথম রাক'আত কাজেই দাঁড়িয়ে আর এক রাকআত পড়ে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসবে। এই হিসাবে উভয় রিওয়ায়েতের উপর তার আমল হয়ে যাবে।

মোটকথা, এ দু'টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, শব্দের সামান্য পার্থক্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থের তেমন একটা তফাৎ দৃষ্টিগোচর না হলেও মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় আর সে জন্যই ইমাম আবু হানিফা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার জন্য রাবীর ফকীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তের উপর ভিত্তি করে যে সব রাবী ফকীহ নন এবং হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা সেগুলোকে দুর্বল ও অগ্রহণীয় বলে গণ্য করেছেন; যা অন্যান্য ইমামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও সহী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই বলে সেসব ইমামের কোন মন্তব্যের উপর নির্ভর করে ইমাম আবু হানীফার উপর এ অপবাদ রটানো কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, তিনি স্পষ্ট ও সহী হাদীসের পরিপন্থী মন্তব্য করেছেন এবং সহী হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন?

অষ্টম উৎসঃ হাদীস গ্রহণের জন্য আর একটি শর্ত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বাক্যগুলো কিভাবে উচ্চারণ করেছেন সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ, যের, যবর, পেশের কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা, আরবী ভাষার সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিরই অজনা নেই যে, আরবী ভাষা খুবই স্পর্শকাতর। যের–যবরের সামান্য পার্থক্যে বা কোন একটি শব্দ সামান্য দীর্ঘ করা না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ দাঁড়ায়। যেমন, পবিত্র কোরআনে রয়েছেঃ

'আমি সেসব (মূর্তি) পূজা করি না যেগুলোর পূজা তোমরা করে থাক। এখানে যদি(لَآ اَعْبُدُ)শব্দটি দীর্ঘ না করে (لَاَعْبُدُ) পাঠ করা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে নিশ্চয়ই আমিও সেসব মূর্তির পূজা করি যেগুলোর তোমরা করে থাকো।—নাউযুবিল্লাহ। কাজেই যদি এ জাতীয় পরস্পর বিরোধী অর্থের দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় তখনই সমস্যা দেখা দিবে এবং ফুকাহাদের মাঝে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে।

যেমন, শরীয়ত মুতাবেক কোন বকরী যবেহ করার পর তার উদর হতে যদি কোন বাচ্চা পাওয়া যায় তবে তার হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

এ হাদীসে দ্বিতীয় ذكاة শব্দটির শেষে যবর ও পেশ উভয় বর্ণনা রয়েছে। পেশের বর্ণনাটি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা অর্থ করেছেন ذكاة الجنين هي ذكاة امه উদরের বাচ্চা হালাল হওয়ার জন্য তার মাকে হালাল করাই (যবেহ করা) যথেষ্ট। কাজেই বাচ্চাটি নতুনভাবে যবেহ করতে হবে না। আর যাঁরা যবরের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অর্থ করেছেন, ذكاة الجنين هي كذكاة امه উদরের বাচ্চাটির হালাল করার পদ্ধতি তার মাকে হালাল করার মতই। অর্থাৎ, يذكى تذكية مثل ذكاة امه উদরের বাচ্চাটিকেও তার মাকে যেভাবে যবেহ করে হালাল করা হয়েছে সেভাবে যবেহ করে হালাল করতে হবে।

এ বর্ণনা অনুযায়ী যদি বাচ্চাটি জীবিত বের হয় তবে তাকে তার মার ন্যায় পৃথকভাবে যবেহ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রসিদ্ধ ও প্রথম রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন; আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইবেন হাযাম আল যাহেরী (রঃ) দ্বিতীয় রিওয়ায়েত অনুসারে ফতোয়া দিয়েছেন। (আল মুহাল্লা–৭খঃ, ৪১৯ পৃঃ)

চতুর্থ কারণঃ 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যঃ

একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার মাঝেও ইমামদের মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কারও শর্ত খুবই কঠিন। কারও শর্ত অপেক্ষাকৃত (কিছুটা) নমনীয়। যেমন ইমাম আবু হানীফার যুগে কুফা শহরে জাল হাদীস রচনার প্রচলন খুব বেশী ছিল বলে তিনি হাদীস গ্রহণের বেলায় বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং তার শর্তগুলি ছিল কঠিন। এ ব্যাপারে কোন কোন ইমামের মত হল হাদীসটি কোরআন ও সুন্নাহর অপরাপর কোন দলীলের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে সেটা পরিহার্য। আর কোন কোন ইমামের মত হল, যদি কোন হাদীস শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী হয় তবে দেখতে হবে, হাদীসের রাবী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ কিনা। তিনি ফেকাহ শাস্ত্রবিদ হলে গ্রহণ করা হবে অন্যথায় নয়। শর্তের এই

মতপার্থক্যের ফলে একই সূত্রে বর্ণিত হাদীস একজনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যা অপরজনের দৃষ্টিতে বর্জনীয় বলে প্রমাণিত হবে। ফলে দ্বিতীয় জন বাধ্য হয়ে এ মাসআলার সমাধানে অন্যান্য যুক্তির আশ্রয় নিবেন। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হবে মতের ভিন্নতা।

পঞ্চম কারণঃ হাদীস বিস্মৃত হয়ে যাওয়াঃ

অর্থাৎ, মুজতাহিদের কোন মাসআলা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ জানার পর তাঁর স্মৃতিপট থেকে সে হাদীসটি বিস্মৃত হয়ে যায়। ফলে তিনি এ মাসআলার জবাবে হাদীসের নির্দেশ না পেয়ে অন্যান্য যুক্তির নিরিখে কিয়াস করতে বাধ্য হন। আর যেহেতু হাদীসটি তার মোটেই স্মরণে ছিল না। কাজেই এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি অপারগ এবং ক্ষমার যোগ্য।

যেমন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)র নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল, সফরে গোসল ফরয হওয়ার পর পানি না পাওয়া গেলে কি করবে। হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন, পানি পাওয়া পর্যন্ত নামায মুলতবী রাখবে। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ হয় যে, একদিন আমরা উভয়ে একটি উটে আরোহী ছিলাম এবং আমাদের উভয়েরই (স্বপ্নদোষজনিত) গোসল ফরয হয়। অতঃপর পানি না পেয়ে আমি গোসলের তায়াম্মুম করার জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। আর আপনি নামায মুলতবী করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি দু'হাত জমিনের উপর মেরে চেহারা এবং হাত দু'টো মাস্‌হ্‌ করে বললেন, এতটুকু করলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন, আপনি যদি হুকুম করেন তবে আর কাউকে এ হাদীস শুনাতে যাব না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সে দায়দায়িত্ব তোমার নিজের। এ ঘটনা দ্বারা আমরা জানতে পরলাম–

তায়াম্মুম সংক্রান্ত হাদীসটি হযরত ওমর (রাঃ)র জানা ছিল, পরে ভুলে গিয়েছিলেন। (দুই) ফলে তিনি কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন যা সহী হাদীসের পরিপন্থী ছিল। (তিন) তাই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে মোটেই কল্পনা করা

যায় না যে, তিনি ইচ্ছাকৃত সহী হাদীসের খেলাফ ফতোয়া দিয়েছেন।

ষষ্ঠ কারণঃ হাদীসের সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মতপার্থক্যঃ

অনেক সময় হাদীসে ব্যবহৃত বাক্য সহজবোধ্য না হওয়ায় সবার পক্ষে হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব হয়নি। কেউ সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, কেউ তার বিপরীত বুঝেছেন, যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে–

১। হাদীসে বিরল ব্যবহৃত কোন শব্দ রয়েছে।

২। কোন শব্দ হাদীসে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মুজতাহিদ ইমামের এলাকাতে বা তার পরিভাষায় তা ভিন্ন অর্থে প্রচলিত রয়েছে। (আর একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমাদের বাংলা ভাষায়ও অনেক রয়েছে) কাজেই, তিনি নিজ এলাকার প্রচলিত অর্থেই ধরে নিয়েছেন। ফলে যিনি সঠিক অর্থের সন্ধান নিতে সক্ষম হয়েছেন তার সাথে এ ইমামের মতের অমিল দেখা দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআনে মদ্যপান নিষেধ করতে গিয়ে خمر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ শুধু 'আঙ্গুরের পাকানো রস'। এ অর্থের ভিত্তিতে অনেকে কোরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ خمر বলতে আঙ্গুরের পাকানো রসকেই বুঝেছেন। অথচ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, خمر বলতে মস্তিষ্ক আচ্ছন্নকারী প্রত্যেক দ্রব্যকেই বুঝানো হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

'মাতলামী আনয়ন করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই 'খামর' বলা হয়। আর মাতলামী আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।'। এছাড়া আরও বহু বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ মদ শুধু আঙ্গুরের রসেই সীমিত নয়।

৩। কুরআন ও হাদীসে অনেক শব্দ বা বাক্য রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা সকলের বোধগম্য হয়ে উঠেনি। ফলে কেউ কেউ তার শাব্দিক অর্থ ধরে নিয়েছেন। যেমন হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন, যখন আল্লাহ পাক হুকুম করলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

'আর তোমরা (রোযার রাতে) খাও এবং পান কর সাদা সূতা (সুবহে সাদেক) কালো সূতা (সুবহে কাযেব) থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত।'

তখন আমি সাদা ও কালো দু' রং এর দু'গাছি সূতা নিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিলাম এবং যতক্ষণ না ভোরের আলোতে সূতা দু'টির পার্থক্য পরিলক্ষিত হল, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিনি। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একাণ্ড শুনালে তিনি বললেন–

إِنَّمَا وِسَادَتُكَ لَعَرِيضٌ

'তোমার বালিশটি তো বেশ বড়সড়।'

সংশ্লিষ্ট আয়াতটির অর্থ হচ্ছে; রাতের আঁধার হতে ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া

৪। আরবী ভাষার অনেক শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তার মধ্যে কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে ফুকাহাদের মাঝে মতের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন,পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে তিন قروء পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আর قروء শব্দটি ঋতু এবং দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে । এখন এ আয়াতে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ণয়ের বেলায় সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু মূসা, উ'বাদাহ ইবনে সামেত, আবুদ্দারদা, ইবনে আব্বাস ও মু'য়ায ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) ঋতুর অর্থ নিয়েছেন। পক্ষান্তরে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর

অর্থ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় নিয়েছেন। পরবর্তী ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রথম মত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (রঃ) দ্বিতীয় কওল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ) পরবর্তী পর্যায়ে নিজ মত পরিবর্তন করে প্রথম কওল গ্রহণ করেছেন।]

(আল্লামা ইবনে কায়্যিম কর্তৃক রচিত যাদুল মায়া'দ পৃষ্ঠা-৬০০-৬০১ পঞ্চম খণ্ড, মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ বইরুত কর্তৃক ১৩ তম সংস্করণ)

প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমর্থনে কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন এবং একে অপরের যুক্তির জবাব পেশ করেছেন। আর এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত শেষের সময়সীমা নির্ধারণ। মহিলাটির অন্যত্র বিবাহ জায়েয হওয়া। তালাকে রেজয়ীপ্রাপ্তা মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার মীরাসের অধিকার ইত্যাদি বিষয়। যারা قروء অর্থ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময় বলেছেন তাদের মতানুযায়ী তালাকের পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। মীরাসের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতানুযায়ী মহিলার তৃতীয় ঋতু শেষ হওয়ার পরই এসব হুকুম প্রযোজ্য হবে।

সপ্তম কারণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আমলের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে মতপার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ও শিক্ষা যেমন শরীয়তের দলিলরূপে বিবেচিত তদ্রূপ তাঁর আমলও শরীয়তের দলীলরূপে বিবেচিত। কাজেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথা থেকে যেমন দলীল গ্রহণ করতেন অনুরূপ তাঁর আমল দেখেও শীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না যে, তাঁর এ আমলটি সুন্নত, নফল বা ওয়াজিব কোন পর্যায়ের ছিল। নাকি এ আমলটি তার নিতান্ত অভ্যাসগত ছিল, যার সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। তখন সাহাবায়ে কেরাম আনুষঙ্গিক অন্যান্য যুক্তির নিরিখে তা সাব্যস্ত করতেন, যাতে বিষয়টির প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝেও দেখা দিত মতপার্থক্য। ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে সক্ষম হননি। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় আরাফার ময়দান থেকে ফেরার পথে আবতাহ (ওয়াদি মুহাস্‌সার) নামক স্থানে অবতরণ করেন। হযরত আবু হুরায়রাহ ও ইবনে ওমর (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবতরণ ইবাদত হিসেবে ছিল। কাজেই এখানে অবতরণ করা হজ্বের সুন্নতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, তার এ অবতরণ ঘটনাক্রমে ঘটেছিল। কাজেই এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবেই একই ঘটনা থেকে সাহাবা ও ফুকাহাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

অষ্টম কারণঃ পরস্পর বিরোধী একাধিক বর্ণনা বর্তমান থাকাঃ

অনেক সময় একই বিষয় সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটে তখন সে মাসআলার সমাধান এবং এ হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বেশ জটিল, যা ওলামাদের পরস্পরের মতপার্থক্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে প্রসংঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তের সকল হুকুম আহকামই যেহেতু একই উৎস থেকে নিসৃত কাজেই বাস্তবে শরীয়তের কোন হুকুমেই স্ববিরোধিতা নেই। অর্থাৎ, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, আল্লাহ ও রাসূল উম্মতকে একই মুহূর্তে পরস্পর বিরোধী দু'টি নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করছেনঃ

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

'আর যদি এ কোরআন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ হতে হত, তবে তাঁরা তাতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বিশদ আলোচনা করে জোরদারভাবে দাবী করেছেন যে, হাদীসে রসূলে স্ববিরোধ বা পরস্পর বিরোধী একাধিক হাদীস বলতে কিছুই নেই। সবগুলোর পিছনেই কোন না কোন যুক্তি রয়েছে। অথবা কোন সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা রয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম শাফেয়ী রচিত আল রিসালাহ-২১৬-২১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

এখন প্রশ্ন হল, যদি তাই হয় তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলীলের সামাবেশ ঘটার কারণ কি? জবাব হলঃ

(এক) অনেক সময় শরীয়ত কর্তৃক কোন একটি নির্দেশ দেয়ার পর অন্য নির্দেশ দ্বারা পূর্বের নির্দেশ রহিত করে দেয়া হয়। কিন্তু সাহাবীদের অনেকেই হয়ত নির্দেশ দু'টোর যে কোন একটি শুনেছেন। অপরটি শুনেননি। সুতরাং তিনি তাঁর শাগরিদদের সেটাই শুধু শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট উভয় হাদীসই সঠিক সূত্রে পৌছেছে, যার ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, শরীয়ত কর্তৃক পরস্পর বিরোধী দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তার মধ্যে একটি ছিল রহিত।

(দুই) অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে কোন নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার বিপরীত পরিস্থিতিতে ভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে অনেক শ্রোতা নির্দেশ দু'টির কোন একটি শুনেছেন কিন্তু সেটি যে বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ছিল এবং তার বিপরীত পরিস্থিতিতে ভিন্ন নির্দেশ রয়েছে তা তাঁরা জানতে সক্ষম হননি আর এভাবেই তাঁরা পরবর্তীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছন। ফলে পরবর্তীদের দৃষ্টিতে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ, বাস্তবে তাতে কোন বিরোধ নেই।

(তিন) অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ প্রশ্নের জবাবে কোন হাদীস বলেছেন, যার সঠিক মর্ম বুঝা অনেক সময় নির্ভর করে প্রশ্নটি সম্পর্কে জানার উপর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয়ত অনেকে জবাবটি সংগ্রহ করেছেন, প্রশ্নটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্নসহ বিস্তারিত যারা বর্ণনা করেছেন তাঁদের সাথে এদের বর্ণনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। অথচ, বাস্তবে তার মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই।

(চার) অনেক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই 'আমল' দেখে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধারণা করেছেন। যেমন, আবু দাউদে সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের নিয়ত করার সময় উচ্চস্বরে যে তালবিয়া পাঠ করেছিলেন তার সময় নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের

মাঝে মতপার্থক্য বিস্ময়কর নয় কি? জবাবে তিনি বললেন, ব্যাপারটি আমি ভালভাবেই জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে হজ্ব একটিই করেছিলেন। কাজেই হজ্বের এহরামও জীবনে একবারই করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ মতপার্থক্যের কারণ ছিল, তিনি যখন হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মসজিদে যিল–হুলাইফাতে পৌঁছে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন তখন হজ্বের নিয়ত করলেন এবং উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর উটের উপর বসে পুনরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। অনুরূপ 'বায়দা' নামক এলাকার উচুঁতে যখন চড়লেন তখন পুনরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু একসাথে এবং একই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতেন না; বরং একের পর এক দলে দলে উপস্থিত হতেন, ফলে যিনি উক্ত তিন সময়ের যে সময় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছেন তিনি সে সময়ের কথাই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাযে বসেই হজ্বের নিয়ত করেছিলেন। অতঃপর উষ্ট্রীতে বসে যখন চলতে আরম্ভ করলেন তখন পুনরায় তালবিয়া পড়েছেন। অনুরূপ, বায়দা নামক স্থানের উচুঁ স্থানে চড়েও পাঠ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ

এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হজ্বের ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবাদের এ মতপার্থক্যের কারণ কি? শুধু তাই নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবীও করেছেন। এর জবাবে কাযী আইয়ায বলেনঃ

এ জাতীয় পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন কেরাম বেশ লেখালেখি করেছেন। এদেঁর মধ্যে সর্বাধিক বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন আবু জা'ফর আল তাহাবী। তিনি এ বিষয়ে এক হাজারের বেশী পৃষ্ঠা লিখেছেন। আরও আলোচনা করেছেন আবু জাফর তাবারী, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সুফ্‌রাহ, আল–মুহাল্লাব, কাজী আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুরাবেত, কাজী আবু হাসান ইবনুল ক্বাস্‌সার আল বাগদাদী ও হাফেয ইবনে আব্দুল বার প্রমূখ।

কাজী আইয়ায আরও বলেন, তবে তাদের সকলের বক্তব্যগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ ব্যাপারে সবচে'

বাস্তবানুগ ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মন্তব্য হল যে, লোকদের জন্য (এহরামের ব্যাপারে) এই তিন পদ্ধতির সবগুলোরই অনুমতি দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সবগুলোই জায়েয বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, যদি কোন একটি পদ্ধতির নির্দেশ দিতেন, তবে অপরাপর পদ্ধতিগুলা না জায়েয বলে ধারণা হত।

মোটকথা, বিভিন্ন কারণে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী একাধিক বর্ণনার সমাবেশ ঘটেছে, যার কারণে এ গুলোর মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে এবং এর সার্বিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ওলামাদের পরস্পরে মাতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কাজেই পরস্পরবিরোধী এ বর্ণনাগুলোও ইমামদের মতপার্থক্যের অন্যতম একটি কারণ।[১]

১। তবে ওলামায়ে কেরাম এসব বর্ণনার পিছনে সীমাহীন মেহনত ও সাধনা করেছেন। অনেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন,

(এক) اختلاف الحديث রচনা করেছন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। কিতাবটিতে তিনি আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন হাদীস পেশ করে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বাস্তব ক্ষেত্রে এর মাঝে কোনই বিরোধ নেই।

(দুই) شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الاحكام এ মহাগ্রন্থ চার খণ্ডে সমাপ্ত। রচনা করেছেন, ইমাম আবু জাফর আল তাহাবী (রঃ) তাতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে স্ববিরোধী রিওয়ায়েত ও দলীলগুলো একত্র করে পরিশেষে হানাফী মাযহাবের যুক্তি ও দলীল তুলে ধরেছেন এবং স্ববিরোধী দলীলগুলোর সুরাহা করেছেন বেশ নিপূণতার সাথে।

(তিন) مشكل الآثار এটাও আবু জাফর তাহাবী রচিত। এটা চারখণ্ডে সমাপ্ত। এতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করে তাতে উদ্ভাবিত প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। সেই সাথে হাদীসটি যদি অন্য কোন রিওয়ায়াত বা কোরআনের আয়াতের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ মনে হয়, তারও সুরাহা করেছেন। তাঁর এ অনন্য গ্রন্থ দু'টো হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের জন্য খুবই ফলপ্রসূ।

(চার) تهذيب الآثار এটা ইবনে জারীর আল তাবারীর রচিত একটি অমূল্য কিতাব। এ কিতাবটি প্রথমতঃ তিনি সমাপ্ত করার পূর্বেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ রচিত সব কয়টি খণ্ড সংগ্রহ করতে পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম সক্ষম হননি। তাতে তিনি

আশারায়ে মুবাশ্শারাহসহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন সাহাবীর স্বতন্ত্র 'মুসনাদ' তৈরী করেছেন, তার মধ্যে মাত্র হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাসের তিনটি মুসনাদ ছাপা হয়েছে। কিতাবটি সম্পর্কে আলহাজ্জ খলীফা যথার্থই বলেছেন, 'এ বিষয়ে, এ বর্ণনা ভঙ্গিতে এমন বিশদভাবে তার মত আলোচনা আর কেউ করেননি।'

খতীব বাগদাদী বলেন, 'এ বিষয়ে তাঁর এ কিতাবটির মত অন্য কোন কিতাব আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।'

আল্লামা ইয়াকূত আল হামাওয়ী বলেনঃ 'এটা এমন অনন্য কিতাব, যার তুলনা পেশ করা ওলামাদের পক্ষে দুষ্করই বটে। তদ্রূপ এ (অসমাপ্ত কিতাবটি) সমাপ্ত করাও তাদের জন্য সুকঠিন।'

ফুকাহায়ে কেরাম 'আপাত' পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর সমাধানে তিনিটি পন্থা অবলম্বন করেছেন।

১। এমন পন্থা অবলম্বন করা যাতে এক সাথে উভয়টির উপর আমল হয়ে যায়।

২। কোন একটিকে 'মানসূখ' (রহিত) প্রমাণ করা।

৩। কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

অনেকে দ্বিতীয় পন্থার আগে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, তাদের ধারাক্রম এই, প্রথমে উভয়টির উপর আমল করার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে সর্বশেষ কোন একটিকে 'মানসূখ' বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। ধারাক্রমের ক্ষেত্রে এই মতভিন্নতার ফলেও অনেক ক্ষেত্রে ফতোয়ার সমাধানে মতের ভিন্নতা দেখা দিবে। মোটকথা, ফুকাহায়ে কেরাম প্রথমতঃ এমন কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন যাতে একসাথে উভয়টির উপর আমল হয়ে যায়।

আর পরস্পর বিরোধী দু'টি বর্ণনার মাঝে সমতা বজায় রেখে উভয়টির উপর আমলের চেষ্টা করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়; বরং তা নির্ভর করে কঠিন সাধনা এবং গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর। আর যেহেতু সকলের জ্ঞানের তীক্ষ্ণতার পরিমাণ সমপর্যায়ের নয়। কাজেই, কেউ হয়ত এ পন্থায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে সৃষ্টি

হয়েছে মতের ভিন্নতা।

দ্বিতীয় পন্থাঃ

সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেও প্রথম পন্থা গ্রহণে সক্ষম না হলে ফুকাহাগণ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, কোন একটি বর্ণনাকে 'মনসূখ' তথা রহিত প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য তাঁরা ক্রমান্বয়ে চারটি প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেনঃ

(এক) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেনঃ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

'আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন তা রহিত করে দিলাম। কাজেই) এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।

(দুই) কোন সাহাবীর বক্তব্য। যেমন, তিরমিযি শরীফে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔

'অগ্নি স্পর্শ করেছে এমন কিছু খেলে অযু করে নিবে।' এ জাতীয় আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, (আগুনে) রান্না করা কিছু খেলে তাতে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রান্না করা জিনিস খেয়ে পুনঃ অযু না করেই নামায পড়েছেন।

ফলে হাদীসগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়েছে, যার সমাধান করা হয়েছে সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর বক্তব্য দ্বারা। তিনি বলেন—

كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

১৪—

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

'অগ্নি স্পর্শ করা কিছু খেয়ে অযু না করাই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের আমল।'

ইমাম সিনধী বলেনঃ

'এ সাহাবীর বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, প্রথম বর্ণনাটি 'মানুসূখ'। এ হাদীস না পাওয়া গেলে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী ছিল।১

১। (হাশিয়াতুল ইমাম আল সানাদী আন্নাসায়ী–১খঃ, ১০৮–১০৯ পৃঃ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য شرح معاني الآثار ৬২–৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(তিন) অনেক সময় দু'টি হাদীসের বর্ণনাকাল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ হাদীস আগে এবং কোনটি পরে বলেছেন। তাতেও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রথমটি 'মানসূখ'।

যেমন, শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন তিনি কোন এক ব্যক্তিকে সিঙ্গা লাগাতে দেখে বললেনঃ

افطر الحاجم والمحجوم

যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে যাবে।

অন্য হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم محرمًا صَائِمًا

'অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন।'

উল্লেখিত হাদীস দ্বয়ের প্রথমটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সিঙ্গা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, রোযা ভঙ্গ হয় না। ফলে হাদীস দুটো

পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। এর সমাধান হল যে, প্রথম বর্ণনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের বছরের। অর্থাৎ, অষ্টম হিজরীর। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহরাম অবস্থার। আর তিনি এহরাম বিদায়ী হজ্বের বছরই করেছিলেন এবং বিদায়ী হজ্ব হয়েছিল দশম হিজরীতে। কাজেই, বুঝা গেল যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি পরের, যার দ্বারা প্রথমটিকে 'মানসূখ' করে দেয়া হয়েছে।

অনেক সময় আনুষঙ্গিক বিভিন্ন (قرائن) প্রমাণ দ্বারাও কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, হাদীস দু'টির বর্ণনাকারী সাহাবীদ্বয় বেশ আগে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং প্রথমে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসটি ইসলাম গ্রহণ করার পর পরই শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। অপরপক্ষে দ্বিতীয়জনও তার হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে দাবী করেছেন। কাজেই জানা গেল যে, প্রথম জনের হাদীসটি পূর্বের হুকুম ছিল যা দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারা 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে।

(চার) চতুর্থ প্রমাণ হল, উভয় হাদীসের কোন একটির উপর যদি এমন 'ইজমা' তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। এতেও প্রতীয়মান হবে যে, অপর হাদীসটি 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একেবারে কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি এ দাবী (প্রমাণিত) করা সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয় পন্থাঃ

'মানসূখ'ও প্রমাণিত করা সম্ভব না হলে ফুকাহয়ে কেরাম তৃতীয় পন্থা– অর্থাৎ, উভয় বর্ণনার কোন একটিকে 'তারজীহ' বা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর এ পন্থাটি সর্বাধিক কঠিন। কেননা, এতে যেমন হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে তদ্রূপ প্রয়োজন হবে হাদীসগুলোর পটভূমি, রাবীদের ইতিহাস, গুণাবলী ইত্যাদির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বিচার বিশ্লেষণ করা। তবেই কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হবে।

'তারজীহ' দেয়ার জন্য তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। আল্লামা হাসেমী (রঃ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار গ্রন্থে পঞ্চাশটি পদ্ধতি লিখে পরিশেষে বলেছেন, এ ছাড়া আরও অনেক

পদ্ধতি আছে যা কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করিনি।১

১। আর হাফেয ইরাকী حاشيةعلي ابن الصلاح গ্রন্থে 'তারজীহ' দেয়ার পদ্ধতি ১১০ পর্যন্ত লিখেছেন। অতঃপর বলেছেন, এ ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার সবগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

নবম কারণঃ কোন বিষয়ে কোরআন ও হদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধানের অনুপস্থিতিঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর বেশ কিছু নব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে ও ঘটছে যা তাঁর যুগে ঘটেনি। ফলে তাঁর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রত্যক্ষ কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম কোরআন ও হাদীসের অপরাপর আহকামের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে অথবা আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে নব উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। আর তখনই তাঁদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেখুন–

প্রথমদৃষ্টান্তঃ

কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরসুরীদের মধ্যে ভাই এর উপস্থিতিতে দাদার মীরাসের অধিকার সংক্রান্ত মাসআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পেশ হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবাদের সামনে পেশ হয়েছে। ফলে এর সমাধানে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) তার সুরাহা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন–

'লোকসকল! আমার বাসনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তিনটি বিষয়ের যদি সমাধান করে যেতেন, আমরা তা মেনে নিতাম এবং আমরা আজ এ সমস্যায় পড়তাম না। বিষয় তিনটি হল, ১। 'কালালা'– অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পিতা বা সন্তানের কেউ নেই। ২। দাদার মীরাস সংক্রান্ত মাসআলা। ৩। সুদ সংক্রান্ত কয়েকটি

বিষয়।

মোটকথা, দাদার মীরাসের ব্যাপারে হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধান না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, মুয়া'য ইবনে জাবাল, আবু মূসা আশআরী, আবু হুরায়রাহ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের মতে, দাদা যেহেতু ভাইদের তুলনায় মৃত ব্যক্তির নিকটতম। কেননা, তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য পিতৃতুল্য। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে দাদাকে পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন,
'তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের (আঃ) মিল্লাত বা ধর্ম'। কাজেই দাদা, ভাইদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা মীরাসের অংশীদার হবে না। (হযরত ওমর (রাঃ)ও প্রথম দিকে এ মতই পোষণ করেছিলেন, পরে তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেন।)

অপরপক্ষে হযরত আলী, ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)র মতে, মৃত ব্যক্তির নৈকট্যের ব্যাপারে দাদা ভাই উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী। কেননা, উভয়ের সাথেই তার সম্পর্কের সূত্র হল পিতা। কাজেই দাদা ও ভাই উভয়েই মীরাসের অংশীদার হবে।

সাহাবায়ে কেরামের এ মতপার্থক্যের ফলে পরবর্তী যুগের ইমামগণও একমত হতে পারেননি। যেমন, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম,ইমাম আহমদের মতামত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত হল, এ ক্ষেত্রে দাদাও মিরাস পাবে। তবে মিরাস বন্টনের বেলায় তাদের পরস্পরে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ ও দাউদ (রঃ) প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, দাদা মীরাস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ

হযরত ওমরের (রাঃ) যুগে একটি নতুন মাসআলা পেশ হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ হল, ইয়ামানের রাজধানী সানআ'তে জনৈক মহিলার স্বামী তার অন্য

পক্ষের একটি সন্তানকে আমানত রেখে কোথাও সফরে যায়। স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে। সৎসন্তানের কারণে অপমান্বিত হতে হয় কিনা সে ভয়ে মহিলাটি তার অবৈধ প্রেমিককে প্ররোচিত করে তার এক দাস ও অন্য আর এক ব্যক্তিসহ সকলে মিলে ছেলেটিকে হত্যা করে এবং তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কেটে চামড়ার থলেতে করে একটি পরিত্যাক্ত কূপে ফেলে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে সকলেই অপরাধ স্বীকার করে। অত্র এলাকার প্রশাসক ব্যাপারটি হযরত ওমরের (রাঃ) কাছে লিখে পাঠালেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাদের সকলকেই হত্যা করার নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, সানআ'বাসীদের সকলেও যদি তার হত্যায় অংশগ্রহণ করত আমি অবশ্যই তাদের সকলকে এর কিসাসে হত্যা করতাম।

এ সিদ্ধান্তে হযরত আলী, মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমরের সাথে একমত ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত যায়ীদ ইবনে মুসায়্যাব, আল হাসান, আ'তা ও কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ এ মত গ্রহণ করেছেন। আর এটাই হল ইমাম মালেক, সাওরী, আওযায়ী', শাফেয়ী, ইসহাক্ব, আবু সাওর ও 'আসহাবুর রায়' সম্প্রদায়ের মাযহাব।

অপরপক্ষে ইবনুয্‌যুবায়রের সিদ্ধান্ত ছিল– দিয়ত নেয়া। পররর্তীদের মধ্যে আল–যুহরী; ইবনে সীরীন, 'রাবীয়াতুর রায়, দাউদ, ইবনুল মুনযিরের মতও তাই ছিল। ইমাম আহমদ থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে।

তাঁদের মতভিন্নতার কারণ হল, একাধিক ব্যক্তি মিলে কাউকে হত্যা করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি। ফলে এর কোন সমাধান প্রত্যক্ষভাবে কোরআনে বা হাদীসে নেই।

কোন ইমামের সহী হাদীস পরিপন্থী ফতোয়াঃ

আশাকরি উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। ১। একই উৎস কোরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ফিকাহ শাস্ত্রে ইমামদের পরস্পরের মতপার্থক্যের কারণ ও উৎসগুলো কি কি? ২। অনেক সময় কোন কোন ইমামের ফতোয়া 'সহীহ' হাদীসের পরিপন্থী পরিলক্ষিত হয় কেন?

এবার আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ

বিষয়টিও অনেক সময় সাধারণের মনে বেশ দ্বিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অনেক সময় কোন কোন আলেম সম্প্রদায়ের মাঝেও বেশ জটিলতা ও বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি হল, অনেক সময় দেখা যায় যে, সহী বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহ্ সিত্তার কোন কিতাবে অথবা অন্য কোন 'সহীহ্' হাদীস গ্রন্থে এমন স্পষ্ট ও সহী হাদীস দৃষ্টিগোচর হয় যা ইমামের ফতোয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উপেক্ষা করা, বিন্দুমাত্র ঈমান যার অন্তরে আছে তার পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে অনুসরণীয় ইমামের ফতোয়াও তো নিশ্চয়ই কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক কোন না কোন দলীলের উপর নির্ভর করেই উৎসারিত। কাজেই, দ্বিমুখী পথের কোনটি অবলম্বন করা উচিত। এর জবাব হল, আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, শরীয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল কোরআন ও হাদীস, যা মুমিন মাত্রই নিঃসংকোচে মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য। কাজেই কোন ইমাম বা মুফতীর কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে আমরা বিশদভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসুরী ইমামদের সর্বসম্মত মতামত ও আমল পেশ করে এসেছি। প্রত্যেক ইমামেরই বক্তব্য ছিল যে, আমার পরিবেশিত কোন ফতোয়ার পরিপন্থী যখনই কোন হাদীস 'সহীহ্' বলে প্রমাণিত হবে তখন আমার বক্তব্য বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে হাদীসকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেবে। আর সেটাই হবে আমার মাযহাব।

তবে তা বিনা শর্তে নয়; বরং এই শর্তে যে, প্রথমতঃ হাদীসটি সত্যিই 'সহীহ' কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ইমাম সাহেব সংশ্লিষ্ট হাদীসটির প্রতিকূল ফতোয়া পেশ করলেন কেন? তিনি কি হাদীসটি সম্পর্কে আদৌ অবগত ছিলেন না; নাকি তিনি জেনেশুনে অন্য কোন প্রবল যুক্তির ভিত্তিতে অথবা এ হাদীসটি রহিত বলে প্রমাণিত হওয়ার কারণে এড়িয়ে গেছেন? তাও ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সেই সাথে এ সব বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা, হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান, ইমাম সাহেবের সকল কিতাবাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে সবার আগে। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য পূর্বসুরী ও আকাবিরদের বিভিন্ন বক্তব্য ও আমল পেশ করছি।

আল্লামা ইবনুশ্‌শিহ্‌নাহ্‌ আল কাবীর আল হালাবী আল হানাফী শায়খুল কামাল ইবনুল হুমাম (রঃ) লিখেছেন–

যদি মাযহাবের পরিপন্থী কোন হাদীস পাওয়া যায় এবং তা 'সহীহ' বলে প্রমাণিত হয় তবে হাদীসটির উপরই আমল করতে হবে। আর সেটা তার নিজস্ব মাযহাব বলে বিবেচিত হবে এবং এ বিশেষ ক্ষেত্রে মাযহাবের ফতোয়া ত্যাগ করা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে তাকে হানাফী বলেই গণ্য করা হবে। কেননা, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন, যদি কোন বিষয়ে আমার ফতোয়ার পরিপন্থী কোন হাদীস 'সহীহ্‌' বলে প্রমাণিত হয় তবে সেটাই হবে আমার মায্‌হাব। ইবনে আব্দুল বার ইমাম আবু হানীফা প্রমূখ থেকে এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আ'বেদীন উপরোক্ত উক্তি উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ

ইমাম শা'রাণী ইমাম চতুষ্টয় থেকেও উপরোক্ত মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সহী হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমামের ফতোয়া রদ করা তারই পক্ষে সম্ভব, যে কোরআন হাদীস পর্যালোচনা করার সামর্থ্য রাখে এবং কোরআন ও হাদীসের 'মুহকাম' (বহাল হুকুম) আর 'মানসূখ' (রহিত হুকুমের) মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা যার রয়েছে। মোটকথা, যখন কোন মাযহাবপন্থী (মুকাল্লিদ) কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল পর্যালোচনা করে আমল করবে তা মাযহাবের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মাযহাবের অনুসারী বলে অভিহিত করা হবে। কেননা, তার এ পদক্ষেপ– অর্থাৎ, মাযহাবের মতামত ত্যাগ করে 'সহীহ' হাদীস গ্রহণ করা মাযহাব কর্তৃক অনুমোদনক্রমেই ছিল। কেননা, তার ইমাম যদি স্বীয় দলীলের দুর্বলতা সম্পর্কে অবিহিত হতেন তবে অবশ্যই তিনি তাঁর এ দুর্বল দলীল উপেক্ষা করে সবল দলীলটিই গ্রহণ করতেন।

ইবনে আবেদীন তাঁর রচিত 'শারহু রাসমিল মুফতী' নামক কিতাবেও একই প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি আরও লিখেছেনঃ

কোন সহী হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাবের মতামত প্রত্যাখ্যান করার জন্য আর একটি শর্ত হল, উক্ত হাদীসটির অনুকূলে কোন না কোন মাযহাবের মতামত থাকতে হবে। কেননা, সকল মাযহাবের পরিপন্থী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইজতিহাদের অনুমতি কেউ দেননি। কারণ, পূর্বের ইমামদের ইজতিহাদ তার

চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। কাজেই বলাবাহুল্য, তার দলিলের চেয়েও প্রবল কোন দলিল তাঁদের নিকট ছিল, যার ভিত্তিতে তাঁরা এ হাদীসের উপর আমল করেননি।

আল্লামা আব্দুল গাফ্ফার (রঃ) তাঁর রচিত 'দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল ক্বিরাআতি খাল্ফাল ইমাম' নামক কিতাবে ইবনে আবেদীনের উল্লেখিত মন্তব্যের সমর্থনে লিখেছেনঃ

তার এ শর্তগুলো খুবই সঙ্গত। কেননা, সাম্প্রতিককালে আমরা অনেক অহংকারী তথাকথিত আলেমকে দেখি, নিজেকে তিনি সুরাইয়া তারকা মনে করেন। অথচ, তার স্থান মাটির অতলতলে। হয়ত অনেক সময় তিনি 'সিহাহ্ সিত্তার' কোন একটি হাদীসগ্রন্থে হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী কোন 'সহীহ' হাদীস পেয়েই বলে বসবেন, আবু হানীফার মাযহাবকে দেয়ালে নিক্ষেপ কর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ কর। অথচ, এমনও হতে পারে যে, হাদীসটি মানসূখ অথবা অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ অথবা হাদীসটির যুক্তিসংগত কোন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু তার সে ব্যাপারে আদৌ জানা নেই। এমন লোকদের প্রতি যদি ফতোয়ার দায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং তাদের কাছে যারা শিখতে আসবে তাদেরকেও গোমরাহ করে ছাড়বে।

অনুরূপ, শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববী (রঃ) ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের অসাধারণ বুৎপত্তির কথা উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

বস্তুতঃ স্পষ্ট ও 'সহীহ' হাদীসের পরিপন্থী মতামতকে উপেক্ষা করা আর হাদীসকে গ্রহণ করার যে অসীয়ত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে তা তিনি সতর্কতার লক্ষ্যে বলেছিলেন। কেননা, কোন মানুষের পক্ষে সকল হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর আমাদের ইমামগণ তার এ অসীয়ত যথাযথ পালন করেছেন এবং (مسألة التثويب) ফজরের আযানের পর নামাযের জন্য পুনরায় ডাকা এবং হজ্বের মধ্যে হালাল হওয়ার জন্য অসুস্থতা ইত্যাদির শর্তারোপ করা; প্রভৃতি বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ মাসআলাগুলোতে এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু এর জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা এ যুগের খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সে সব শর্ত আমি 'শারহুল-মুহায্যাব' কিতাবের ভূমিকাতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

ইমাম নববী (রঃ)আলোচিত শর্তগুলো সংক্ষেপে আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ)র উল্লেখিত বক্তব্যের এ অর্থ নয় যে, তাঁর ফতোয়ার পরিপন্থী কোন হাদীস পেয়ে এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব বলে তার বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা আরম্ভ করে দিবে। বরং ইজতিহাদ–ফিল–মাযহাবের যোগ্যতা ব্যতিরেকে কারো পক্ষে এ দবী করা বা এ পন্থা অবলম্বন করার অধিকার নেই। সেই সাথে তাকে প্রথমেই যথাসম্ভব নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর অবগতিতে ছিল না। অথবা হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সক্ষম হননি। আর ইমাম সাহেবের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁর এবং তাঁর শাগরিদদের রচিত সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন করার পরই সম্ভব হবে। যা দুষ্করই বটে। খুব কম লোকই সে পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে।

এ শর্তারোপের কারণ হল, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) অনেক হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে তার যাহেরী অর্থের উপর আমল করেননি। যেমন, ১। হাদীসটির বিরূপ সমালোচনা ছিল। ২। 'মানসূখ' ছিল। ৩। তার বিশেষ কোন অর্থ ছিল। ৪। অন্য কোন ব্যাখ্যা তিনি করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম নববী (রঃ) ছিলেন সপ্তম শতাব্দির। যে শতাব্দির প্রথম দিকে ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী, ইবনে সালাহ, আল মুনযিরী, আল 'ইয্ ইবনে আব্দুস সালাম, ইবনে মুনীর, আবুল হাসান ইবনে ক্বাত্তান, আল মুওয়াফ্ফিক ইবেন ক্বুদামাহ প্রমুখ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ইমামগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের ব্যাপারেই ইমাম নববী (রঃ) মন্তব্য করছেন যে, মাযহাবের মত ত্যাগ করে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করার মত সামর্থ্য এ যুগে খুব কম লোকের মধ্যেই রয়েছে। তা হলে বুঝে নিন ইলমের এ দৈন্যের যুগে অবস্থা কি হতে পারে!

ইমাম শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আল ক্বরাফী আল–মালেকী (রঃ) তার রচিত 'আত্তানকীহ' নামক কিতাবে লিখেন–

শাফেয়ী মাযহাবের অনেক ফিকাহবিদ ইমাম শফেয়ীর (রঃ) এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলে বসেন, এ ব্যাপারে অমুক হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। তাদের এ পন্থা নিছক ভুল। কেননা, কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য শুধু 'সহীহ বলে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে হাদীসটির পরিপন্থী কোন প্রবল প্রমাণ না থাকাও জরুরী হবে। আর কোন হাদীসের পরিপন্থী দলিল নেই বলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শরীয়তের সকল বিষয়ের সার্বিক জ্ঞান–অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া। তবেই তার সে মন্তব্য যথাযথ হবে। আর পূর্ণাংগ 'মুজতাহিদ' ব্যতীত অন্য কারও পর্যালোচনার কোন গুরুত্ব নেই। কাজেই এ পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে সে যোগ্যতা অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য।

ইমামদের এ বিস্তারিত আলোচনা শুনার পর নিশ্চয়ই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন সহীহ হাদীস পাওয়া মাত্রই তার উপর আমল শুরু করে দেয়া ঠিক নয়; বরং তার জন্য অগ্র–পশ্চাৎ কিছু শর্ত রয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমলের দিকে আগে বাড়তে হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন অসাধারণ যোগ্যতা। কাজেই অযোগ্যদের জন্য সুযোগ্য ইমামের শরণাপন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে যে, তারা তো বলেছেন, আমার বক্তব্যের পরিপন্থী কোন 'সহীহ' হাদীস পরিদৃষ্ট হলে হাদীসের উপরই আমল করবে এবং সেটাই হবে আমার মাযহাব– এর কি অর্থ? এর জবাবে আল্লামা হাবীব আহমদ আল কীরানূভী বলেন–

ইমামদের এসব বক্তব্যের অর্থ হল, প্রকৃত সত্যের প্রকাশ করে দেয়া যে, প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যই হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য দলিল। কাজেই আমার বক্তব্যকে স্বতন্ত্রভাবে দলিলরূপে ধারণা করো না। আর আমি অজ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বললে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু সে জন্য এ কথা জরুরী নয় যে, কোন হাদীস 'সহীহ' বলে প্রমাণিত হওয়া মাত্রই সেটা ইমাম সাহেবের মাযহাব বলে বিবেচিত হবে।

কেননা, অনেক হাদীসই সহীহ বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও ইমামগণ

জেনেশুনে বিভিন্ন যুক্তির ভিত্তিতে তা পরিহার করেছেন। যেমন, হযরত ইব্রাহীম আল–নাসায়ী বলেন–

আমি কোন হাদীস শোনার পর লক্ষ্য করে দেখি; যেগুলো গ্রহণযোগ্য, সেগুলো গ্রহণ করি। বাকি সব ছেড়ে দেই।

আল–কাজী আল–মুজতাহিদ ইবনে আবু লাইলা (রঃ) বলেন–

কোন মানুষ হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে ততক্ষণ পর্যন্ত সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যগুলো গ্রহণ করবে আর বাকিগুলো ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রঃ) বলেন–

কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না হাদীসের প্রামাণ্য–অপ্রামাণ্য এবং ইল্‌মের উৎসগুলো জানতে সক্ষম হবে এবং যে কোন হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা থেকে বিরত না হবে, সে ইমাম হতে সক্ষম হবে না।

ইবনে ওয়াহাব (রঃ) বলেন–

আল্লাহ পাক যদি আমাকে ইমাম মালেক ও ইমাম লাইসের উছিলায় হিফাযত না করতেন তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিভাবে? জবাবে তিনি বললেন–

আমি প্রচুর পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করেছিলাম। ফলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ি। অতঃপর সেসব হাদীস ইমাম মালেক ও ইমাম লাইসের সম্মুখে পেশ করি; তখন তাঁরা বলে দেন, এই হাদীসটি গ্রহণ করো আর এই হাদীসটি ছেড়ে দাও।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, একবার ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইবনে উয়াইনাহ'র নিকট ইমাম যুহরীর বর্ণিত অনেক হাদীস সংগৃহীত রয়েছে যা আপনার নিকট নেই। জবাবে ইমাম মালেক (রঃ) বললেন–

আমি যে সব হাদীস সংগ্রহ করেছি, সবই কি আর বর্ণনা করি নাকি? যদি তাই করতাম তবে তাদেরকে গোমরাহ করে ছাড়তাম।

এ সব বক্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন হাদীস পাওয়া মাত্রই কোন প্রকার আলোচনা পর্যালোচনা ব্যতিরেকে তার উপর আমল শুরু করে দেয়া যাবে

না। আর ফুকাহায়ে কেরাম তা করেনওনি। কেননা, পূর্বেই বলে এসেছি যে, অনেক হাদীস বিভিন্ন যুক্তির নিরিখে 'মানসূখ' বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, সে হাদীসগুলো 'সহীহ' ও সবল সনদে বর্ণিত। যেমন, 'সহীহ' মুসলিমে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ

অপরপক্ষে 'সহীহ' বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস, আমর ইবনে উমাইয়া আয্যামবী ও উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি হাড় (থেকে কিছু গোস্ত) খেলেন। কোন কোন বর্ণনাতে রয়েছে বকরীর কাঁধের অংশের গোস্ত খেলেন এবং কোন প্রকার পানি স্পর্শ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করলেন।

এ রিওয়ায়েতটি মুসলিম শরীফেও রয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত ইবেন আব্বাস থেকে আরো একটি রিওয়ায়েত রয়েছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামাযের জন্য বের হয়েছেন এমন সময় তার জন্য রুটি আর গোস্ত হাদীয়া স্বরূপ পেশ করা হল। তিনি তা থেকে তিন লোক্মা খেলেন এবং পানি স্পর্শ করেননি।

উল্লেখিত হাদীস দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী আর উভয়টিই নির্ভরযোগ্য 'সনদে' বর্ণিত। এখন যদি কোন ব্যক্তি যে কোন একটি হাদীস দেখেই 'সহীহ' বলে আমল শুরু করে দেয় আর জোর গলায় মন্তব্য করে যে, আমি বুখারী শরীফে হাদীসটি পেয়েছি। তবে কি তার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে? অথচ হাদীস দু'টিই তো সহীহ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। কাজেই বুঝা গেল যে, কোন একটি মাত্র সহী হাদীসের উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; বরং তার সাথে সম্পর্কিত অপরাপর হাদীস বা দলিল সমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুরূপ, সে হাদীসটি অন্য কোন যুক্তির মাধ্যমে 'মানসূখ' হয়েছে কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। আর এ বিচার বিশ্লেষণ যেহেতু সাধারণ ব্যাপার নয় কাজেই ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, যাঁরা 'সনদ' ব্যাখ্যা ও পটভূমি সহ লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন, সেই সাথে পবিত্র কোরআনের

ব্যাখ্যা ও পটভূমি সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং একসাথে কোরআন ও হাদীসের সকল দলিল সামনে রেখে 'ফেকাহ শাস্ত্র' প্রণয়ন করেছেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি আমাকে কোন একটি বিষয়ে 'সহীহ' বুখারীর একটি হাদীস পেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন (হানাফী মাযহাবের ফতোয়া সে হাদীসটির বাহ্যতঃ পরিপন্থী ছিল) বলুন তো, একদিকে কোরআনের পর বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারীর হাদীস, অপরদিকে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য। এখন কোন দিকে যাবো? জবাবে আমি বললাম, আপনার সামনে তো বুখারী শরীফের মাত্র একটি হাদীস রয়েছে, যার সঠিক ব্যাখ্য বুঝা কতটুকু সম্ভব হয়েছে আপনার পক্ষে সে আল্লাহ পাকই জানেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একই সাথে কোরআন হাদীসের অসংখ্য যুক্তিকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন কোরআন হাদীসের ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। সেই সাথে তিনি অন্যান্যদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম যুগের ছিলেন বলে তার পক্ষে 'সহীহ' সনদে অধিক পরিমাণে হাদীস সংগ্রহ করা এবং কোরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা পরবর্তী যুগের লোকদের তুলনায় বিশেষ করে আপনার আমার তুলনায় অধিক সম্ভব হয়েছিল। এবার বলুন তো, কার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অতঃপর তাকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ কোরআনের অন্য একটি আয়াতের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তার তাবীল তথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

মোটকথা, ফেকাহ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন হাদীস-গ্রন্থের কোন একটি বর্ণনা দেখে কোন মাসআলার সমাধান করাতে গোমরাহীর সম্ভাবনাই অধিক।

আর সেজন্যই আমাদের পূর্বসুরীগণ এ ব্যাপারে উম্মাহকে বিশেষভাবে সতর্ক করে গিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালেক (রঃ)র শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব আল মিস্‌রী এবং ইমাম আল লাইস ইবনে সায়াদ (রঃ) বলেনঃ

'হাদীস' একমাত্র ওলামা ছাড়া অন্যান্যদের জন্য (অনেক ক্ষেত্রে) ভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদ্রূপ ইবনে উয়াইনাহ বলেন–

ফুকাহা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য হাদীস (অনেক ক্ষেত্রে) ভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্বেই বলে এসেছি যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত বিষয়গুলো দু' ভাগে বিভক্তঃ সহজবোধ্য ও দুর্বোধ্য। আর এও বলে এসেছি যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোই হল ওলামাদের পরস্পরের মতপার্থক্যের কেন্দ্রস্থল। আর উপরোক্ত বক্তব্যগুলোতে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, স্বতঃসিদ্ধ ও সকল প্রকার জটিলতামুক্ত বিষয়গুলোতে ভ্রান্তির কোনই কারণ নেই; বরং যেসব বিষয়ে শব্দগত দিক থেকে অথবা আনুষঙ্গিক দিক থেকে অথবা অন্য কোন কারণে জটিলতা রয়েছে বা বিষয়টি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। অথবা, অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ সেসব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ফিকাহশাস্ত্রে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ব্যতীত সরাসরি মাসআলা ইস্তিম্বাত করতে গেলে গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, নিকাহে মুতআ'র প্রথমে অনুমতি ছিল। পরে রহিত হয়ে গিয়েছে, পুনরায় অনুমতি দেয়া হয়েছে, পুনরায় রহিত করা হয়েছে। এখন স্বভাবতঃই অনুমতির হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে কেউ যদি আমল করতে থাকে তবে গোমরাহিতে পড়বে নিঃসন্দেহে।

তবে এর অর্থ এও নয় যে, 'হাদীস শাস্ত্র যখন গোমরাহীর কারণ কাজেই, তার ধারেকাছে যাওয়া যাবে না; বরং এর অর্থ হল, ফিকাহ শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে এবং ইমামদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে সরাসরি হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে।

আর সে জন্যই ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন যে, আমরা একমাত্র ফুকাহা ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করে থাকি না।

অনুরূপ, 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল–হাদীস' আবুয্–যিন্নাদ (আব্দুল্লাহ ইবেন যাক্ওয়ান) বলেন–

আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, আমরা শুধু ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও

বিশ্বস্তদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করে থাকি এবং যতটুকু গুরুত্ব কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে দিয়ে থাকি হাদীস শিক্ষার ব্যাপারেও তা দিয়ে থাকি।

খতীব বাগদাদী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার মুগিরাহ আল-যাবয়ি ইব্রাহীম আল-নাখায়ী (রঃ)র মজলিসে উপস্থিত হতে বিলম্ব করলেন, ইব্রাহীম তাকে বিলম্ব করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমাদের নিকট জনৈক হাদীস বর্ণনাকারী 'শায়েখ' এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করায় ব্যস্ত ছিলাম। ইমাম ইব্রাহীম বললেন-

তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখেছ, আমারা এমন লোকের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করি যার মধ্যে হালাল-হারামের পার্থক্য করার সামর্থ্য রয়েছে। তুমি অনেক মুহাদ্দিসকেই দেখবে যে, নিজের অজান্তেই তিনি হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল প্রতিপন্ন করে যাচ্ছেন।

ইমাম ইব্রাহীম আল-নাখায়ী (রঃ) বলেন-

কোন মতামত রেওয়ায়েত ব্যতিরেকে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপ, কোন রিওয়ায়েতও মতামত ব্যতিরেকে সাঠিক হতে পারে না।

ইমাম সারাখসী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শায়বানী (রঃ) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু সুলাইমান আল খাততাবী (রঃ) 'মা'আলেমুস্‌সুনানে লিখেছেনঃ

আজকের আলেম সম্প্রদায়কে দেখছি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। হাদীস ও 'আছর' পন্থী আর ফেকাহ ও কেয়াসপন্থী। আর উভয়টিই প্রয়োজনের বেলায় অপরিহার্য। মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে একে অপরের মুখাপেক্ষী। কেননা, হাদীসশাস্ত্র হল মূল ভিত্তিতুল্য আর ফিকাহশাস্ত্র হল সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত একটি ইমারততুল্য। আর বলাবাহুল্য যে, মূল ভিত্তি ছাড়া যেমন কোন ইমারত নির্মাণের কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ ইমারতবিহীন শুধু ভিত্তিরও কোন মূল্য নেই।

কোন 'সহী হাদীস' সংগ্রহ করার পর তার উপর আমল করার জন্য আমাদের পূর্বসূরীগণ আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতেন সেটা হল, অনুসরণীয় সাহাবা ও ইমামদের মধ্যে কেউ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন কি না।

কেউ যদি এর উপর আমল না করে থাকেন তবে তা গ্রহণ করতেন না। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, কোন হাদীসকে মূল্যায়নের মানদণ্ড হল পূর্বসূরীদের আমল; পূর্বসূরীদের আমলের উপর নির্ভর করে হাদীস গ্রহণ করা–না করা। (নাউযুবিল্লাহ) কস্মিনকালেও নয়; বরং এর অর্থ হল, হাদীসটির উপর একজনেরও যদি আমল না পওয়া যায় তবে বুঝা যাবে, হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে আমলযোগ্য নয়।। আর যে হাদীস সকলেই মূলতবী করেছেন নিশ্চয়ই তার বিপক্ষে অন্য কোন প্রবল যুক্তি রয়েছে, অথবা সেটি 'মনসূখ' বা রহিত। কাজেই তার উপর আমল করা যাবে না। আর পূর্বসূরীদের আমল তালাশ করা শুধু মাত্র এ কথা প্রমাণিত করার জন্য যে, হাদীসটি 'মনসূখ' নয় এবং অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণও নয়।

আল্লামা ইবনে আবু যায়েদ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

কোন মত বা কিয়াসের কারণে সুন্নাহর প্রতি আমল ব্যাহত হতে পারে না। আমাদের পূর্বসূরীগণ যেসব হাদীসের 'তাবীল' বা ব্যাখ্যা করেছেন, আমরাও তার ব্যাখ্যা করেছি। আর তাঁরা যেগুলোর উপর আমল করেছেন আমরাও আমল করেছি। তাঁরা যেগুলো মূলতবী করেছেন আমরাও সেগুলো মুলতবী রেখেছি। আর তাঁরা যেগুলো থেকে বিরত রয়েছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা আমাদের পক্ষেও সম্ভব। আর তাঁরা যেসব বিশ্লেষণ করেছেন সেগুলোর আমরা অনুসরণ করি। আর যেসব বিষয় তাঁরা ইস্তিম্বাত করেছেন এবং নবউদ্ভূত মাসআলার যে সমাধান পেশ করেছেন সেসব বিষয়ে তাদের মতানুসরণ করি। আর যে সব বিষয়ে বা ব্যাখ্যায় তাঁরা পরস্পরে মতপার্থক্য করেছেন সেগুলোতে তাঁদের জমাত থেকে বের হয়ে যাই না।

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রঃ) কে কোন এক সময় তার ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি অমুক হাদীসটির অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি কেন? জবাবে তিনি বললেন, (لم اجد الناس عليه) এ জন্য যে, পূর্বসূরীদের কাউকে এর অনুকূল আমল করতে দেখিনি।

ইমাম নাখায়ী বলেন–

অযুর মধ্যে টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে পাঠ করে থাকি। এতদসত্ত্বেও যদি সাহাবাদেরকে হাঁটু পর্যন্ত পা ধুতে দেখতাম তবে আমি তাদের অনুসরণে অবশ্যই হাঁটু পর্যন্ত ধৌত করতাম। এ জন্য যে, তাদের ব্যাপারে সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরক করার কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া তাঁরা ছিলেন (ارباب العلم) সত্যিকার ইল্‌মের অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক আগ্রহশীল। কাজেই, তাঁদের ব্যাপারে এহেন সংশয় সেই করতে পারে যে মূলত দ্বীনের ব্যাপারেই সংশয়ী।

ইবনে মুয়া'যযিল (রঃ) বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি ইবনে মাজেশূনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে নিজের রিওয়ায়েত করা হাদীসের উপর অনেক সময় নিজেই আমল করেন না, এর কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমরা এ হাদীসটি জেনে শুনেই বাদ দিয়েছি।

ইমাম মালেকের জনৈক শাগরিদ হাফেজে হাদীস ও ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদ মুহাম্মদ ইবেন ঈসা আত্‌তিবা' বলেন–

যদি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোন হাদীস পৌঁছে, যার উপর সাহাবাদের মধ্যে কেউ আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই তবে সে হাদীসটি তুমি ছেড়ে দিবে।

হাফেয ইবনে রাজাব আল হাম্বালী (রঃ) তাঁর রচিত 'ফায্‌লু ইলমিস্–সালাফ আ'লাল–খালাফ্ নামক কিতাবে লিখেন–

ফুকাহা ও ইমামগণ যে কোন সহী হাদীসের উপর আমল করতেন যদি সেটা সাহাবা, তাবেয়ীন অথবা, তাঁদের একটি জামায়া'তের নিকট আমলকৃত হত। কিন্তু যে হাদীসের তরক করার ব্যাপারে তাঁরা সকলে একমত ছিলেন তার উপর আমল করা জায়েয নেই। কেননা, সে হাদীসটি আমলের যোগ্য নয় বলে জেনে শুনেই তাঁরা ছেড়েছেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) বলেন, তোমরা সেসব মতামত গ্রহণ করবে যা তোমাদের পূর্বসূরীদের মতের অনুকূল হয়। কেননা, তাঁরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে রাজাব আরও বলেন–

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের পর যেসব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেসব ব্যাপারে লোকদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, তাঁদের পরে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর আহলে যাহেরেদের এমন সব লোকেরা হাদীস বর্ণনা আরম্ভ করেছে যারা হাদীস ও সুন্নাহর অনুসারী বলে অভিহিত অথচ, পূর্বসূরী ইমামদের বোধ ও গ্রহণকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মতামত অবলম্বন করার ফলে সবচে' বেশী হাদীসের বিরোধিতা করেছেন।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম তাঁর রচিত ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন কিতাবে ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করেন–

যদি কোন ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মতপার্থক্য সম্বলিত কিতাবাদি থাকে তবে তার পক্ষে জায়েয হবে না যে, নিজ ইচ্ছা মুতাবেক কোন একটিকে মনোনীত করে আমল করবে বা ফয়সালা করবে; যতক্ষণ না কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেবে যে, তার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত আর কোনটি ছেড়ে দেয়া উচিত। তবেই তার পক্ষে সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

বয়স ও বংশ পরিচয়

তাঁর পূর্ণ নাম হল, আবু হানীফা আন–নু'মান ইবনে ছাবেত যাওতী। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৮০ হিজরীতে কূফা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষা দীক্ষাঃ

প্রথমতঃ তিনি কুফা শহরেই ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। অতঃপর কুফার শীর্ষস্থানীয় ফিকাহশাস্ত্রবিদ হাম্মাদ (রঃ) এর নিকট জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন। অতঃপর ১২০ হিজরীতে স্বীয় উস্তাদ হযরত হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং কুফার 'মাদাসাতুর রায়' এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সাথে ইরাকের অনন্য ইমাম বলে বিবেচিত হন এবং অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন এবং বসরাহ, মক্কা, মদীনা ও বাগদাদের তদানিন্তন সকল প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয়

ওলামা কেরামের সাথে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন এবং একে অপর থেকে উপকৃত হতে থাকেন। এভাবেই ক্রমশঃ তার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাসআলা ইস্তিম্বাতে ইমাম সাহেবের তীক্ষ্ণতাঃ

ইমাম সাহেব যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ও ধী–শক্তি সম্পন্ন ছিলেন তেমনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

একদিন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ক্বিরাত ও হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ তাবেয়ী' হযরত আ'মাশের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় কোন একটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করা হল। জবাবে তিনি তাঁর মতামত জানালেন। হযরত আ'মাশ (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দলিল তুমি কোথায় পেয়েছো। জবাবে ইমাম সাহেব বললেন যে, আপনিই তো আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন। আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে, আর ওয়ায়েল ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সূত্রে, আবী ইয়াস ও আবী মাসউদ আল আনসারীর সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ عَمَلِهٖ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজে অন্যকে পথ দেখাবে (উদ্বুদ্ধ করবে) সে ব্যক্তি উক্ত নেক কাজটি করার সমতুল্য সওয়াবের অধিকারী হবে।

আপনি আরো বর্ণনা করেছেন আবী সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে যে, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার ঘরে নামায আদায় করছিলাম এমন সময় কোন এক ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে; ফলে আমার অন্তরে 'উজব' (আত্মতুষ্টি) সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ

তুমি দু'টি সওয়াব পাবে অপ্রকাশ্যে আমল করার এবং প্রকাশ্যে আমল করার।

এভাবে ইমাম সাহেব তারই বর্ণনাকৃত আরও চারটি হাদীস শুনালেন। ইমাম আ'মাশ বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর শুনাতে হবে না। আমি তোমাকে

একশত দিনে যা শুনিয়েছি তুমি এক ঘন্টায় তা শুনিয়ে দিলে। আমার ধারণাও ছিল না যে, তুমি এ হাদীসগুলোর উপর আমল করে থাকো। সত্যি তোমরা ফকীহরা হলে ডাক্তারতুল্য; আর আমরা হলাম ওষুধের দোকানদার। আর তুমি তো উভয় দিকই হাসিল করেছ।

(الجواهرالمضية ২য় খণ্ড, ৪৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, একদিন আমি সিরিয়াতে হযরত আওযায়ী'র নিকট এলাম। তিনি আমাকে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুফা শহরে যে একজন বিদ'আতীর আবির্ভাব ঘটেছে, কে সে? আমি (তখনকার মত কোন জবাব না দিয়ে) ঘরে ফিরে এসে ইমাম সাহেবের কিতাবগুলো ঘেটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের করলাম এবং তিনদিন পর কিতাবটি হাতে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি কিতাব? আমি কিতাবটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি কিতাবটি হাতে নিতেই এমন একটি মাসআলার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল যাতে আমি (قال النعمان) শব্দটি চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি আযানের পর থেকে নামাজের ইকামত পর্যন্ত কিতাবটির সিংহভাগ পড়ে ফেললেন। অতঃপর কিতাবটি বন্ধ করে তিনি নামায পড়ালেন। সেই মসজিদের তিনি ইমাম ও মুয়ায্যিন ছিলেন। নামাজের পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নু'মান ইবনে ছাবেত লোকটি কে? আমি বললাম, তিনি একজন 'শায়খ'। ইরাকে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এ লোকটি শীর্ষস্থানীয় শায়খ। তার নিকট গিয়ে আরও অধিক পরিমাণ জ্ঞান আহরণ কর।' আমি বললাম, ইনি তো সেই ব্যক্তি যার নিকট যেতে আপনি বারণ করেছিলেন।

(তারীখে বাগদাদ ১৩ তম খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)

অতঃপর যখন মক্কা শরীফে ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি ইমাম সাহেবের সাথে সেসব মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ইবনুল মুবারক তাঁর কাছ থেকে যতটুকু লিখেছিলেন তিনি তার চেয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। সেই মজলিস থেকে ফিরে ইমাম আওযায়ী ইবনুল মুবারককে বললেন, লোকটির অসাধারণ ইলম এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আর আমি আল্লাহ পাকের দরবারে ইস্তিগফার

করছি। কেননা, আমি প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ কর। তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য ইতিপূর্বে আমার কাছে পৌছেছিল তিনি তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। (আওজাযুল মাসালেক ১খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তার শাগরিদদেরকে যারা পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে শির্ষস্থানীয় হাফেযে হাদীস ফাযল ইবনে মূসা আস্‌সিনানীকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যারা অপবাদ গেয়ে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তিনি বললেন, আসল ব্যাপার হল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাদের সামনে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করেছেন যার সবটা তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর তিনি তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। ফলে তারা ইমাম সাহেবের সাথে হিংসা আরম্ভ করেছেন।

একদিন দারুল হানাতীনে ইমাম আবু হানীফা ও আ ওযায়ী (রঃ) একত্রিত হয়ে ইল্‌মী আলোচনা করতে থাকলেন। ইমাম আওযায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা 'রুকু'র সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন? ইমাম সাহেব বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে। ইমাম আওযায়ী বললেন, কেন? আমাদেরকে ইমাম যুহরী, সালেম থেকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আরম্ভ করতে, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে হাত উঠাতেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বললেন, আমাকে হাম্মাদ ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামাজ আরম্ভ করার সময় ব্যতীত আর কোন সময় হাত উঠাতেন না। ইমাম আওযায়ী বললেন, আমি তোমাকে যুহরী, সালেম ও ইবনে ওমরের (রাঃ) বরাতে হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি শুনাচ্ছ হাম্মাদ আর ইব্রাহীম থেকে। জবাবে ইমাম আবু হানীফা বললেন, আমার বর্ণিত হাদীসের 'সনদে' হাম্মাদ তোমার সনদের যুহরীর তুলনায় অধিক ফকীহ ছিলেন। আর ইবনে ওমর যদিও সাহাবী, কিন্তু আলকামা তার চেয়ে কম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। আর আসওয়াদের অনেক ফযীলত রয়েছে।১ অতঃপর ইমাম আওযায়ী নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

১। পূর্বেই আমরা বলে এসেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর ফকীহ হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এর কারণও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার অসাধারণ বুৎপত্তিঃ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ফিকাহশাস্ত্রে এবং মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অনুরূপ, হাদীসশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যেমন একটু পূর্বেই আমরা ইমাম আ'মাশের মন্তব্য শুনে এলাম যে, 'তুমি উভয় দিকই হাসিল করেছ।' বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি কোরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত ফিকাহর ইমাম হতে পারে না। কেননা, ফিকাহশাস্ত্র কোরআন হাদীস থেকেই উৎসারিত। কাজেই ইমাম আবু হানীফার মত ফিকাহশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তির সম্পর্কে এ কথা ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন; বরং অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রেও অতুলনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি চার হাজার শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন বলে বিভিন্ন লেখক মন্তব্য করেছেন।১

১। আস সুন্নাহ ৪১৩ পৃঃ, উকুদুল জাম্মান ৬৩ পৃষ্ঠা। খাইরাতুল হিসান ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ আস্‌সালেহী 'উকুদুল জাম্মান' গ্রন্থে দীর্ঘ ২৪ পৃষ্ঠায় ইমাম সাহেবের মাশায়েখদের একটা ফিরিস্তি পেশ করেছেন।। (উকুদুল জাম্মান–৬৩–৮৭ পৃঃ।

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) বর্ণনা করেন,

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। 'সহীহ' হাদীস সম্পর্কে তিনি আমার চেয়ে অধিক দূরদর্শী ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসূফ (রঃ) আরও বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যখন দৃঢ়তার সাথে কোন মন্তব্য পেশ করতেন, তখন তাঁর এ মন্তব্যের সপক্ষে হাদীস বা 'আছর' সংগ্রহ করার জন্য কূফা শহরের সকল 'মাশায়েখ' দের কাছে যেতাম।

অনেক সময় এর সপক্ষে দু' তিনটি হাদীস পেয়ে যেতাম। অতঃপর সেগুলো ইমাম সাহেবের নিকট পেশ করলে তিনি এর মধ্যে অনেকগুলো সম্পর্কে এও বলতেন যে, এই হাদীসটি 'সহীহ' নয় অথবা অপরিচিত (সূত্রে বর্ণিত)। আমি তাকে বলতাম, তবে এ সম্পর্কে আপনার কি জানা রয়েছে। অথচ, এ হাদীসটি তো আপনার বক্তব্যের অনুকূল। জবাবে তিনি বলতেন, আমি কুফাবাসীদের ইল্‌ম সম্পর্কে ভালভাবেই জানি।

এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ইমাম সাহেব হাদীস শাস্ত্রে কি পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ সারা শহর ঘুরে যা সংগ্রহ করতেন তার চেয়ে বেশী তাঁর কাছে আগে থেকেই রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কুফা শহরের ওলামাদের সংগৃহীত সকল ইল্‌ম সংগ্রহ করেছিলেন। যেমন ইমাম বুখারীর জনৈক উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে আদম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) নিজ শহরের সকল হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের হাদীসগুলোর প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, বিভিন্নমুখী হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বশেষ হাদীস কোনটি ছিল) যার দ্বারা অন্যান্যগুলো রহিত সাব্যস্ত করা সহজ হয়।

বিখ্যাত ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও আবেদ হাসান ইবনে সালেহ বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হাদীসের নাসেখ–মানসূখ নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। কাজেই তিনি কোন হাদীসের উপর তখনই আমল করতেন যখন সে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সেই সাথে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রমাণিত হত। (কেননা, পূর্বেই বলে এসেছি যে, সাহাবাদের আমল দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, হুযুরের সর্বশেষ আমল কোনটি ছিল এবং কোনটি 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে)। আর তিনি কুফাবাসী (ওলামায়ে কেরামের) হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তার নিজ শহরের (ওলামাদের) আমল কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। ইবনে সালেহ আরও বলেন–

ইমাম আবু হানীফা (নিজেই) বলতেন, কোরআনের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যা 'নাসেখ' (অন্য নির্দেশকে রহিতকারী) আর কিছু বিষয় রয়েছে 'মানসূখ'। অনুরূপ, হাদীসের মধ্যে কিছু 'নাসেখ' ও কিছু 'মানসূখ' রয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা তাঁর শহরে যেসব হাদীস পৌঁছেছে তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সময়কার সর্বশেষ আমল কি ছিল সেসব তাঁর মুখস্থ ছিল।

মোটকথা, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কুফা শহরের ওলামাদের হাসিলকৃত সকল ইল্ম সংগ্রহ করেছিলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি কুফা শহর থেকে সফর করে দীর্ঘ ছয়টি বছর মক্কা মদীনা অবস্থান করে সেখানকার সকল 'শায়েখে'র নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। আর মক্কা মদীনা যেহেতু স্থানীয় ও বহিরাগত সকল ওলামা, মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের কেন্দ্রস্থল ছিল। কাজেই এক কথায় বলা চলে যে, মক্কা মদীনা ছিলো ইলমের 'মারকায'। আর তাঁর মত অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন, কর্মঠ ও মুজতাহিদ ইমামের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ মক্কা মদীনার ইলম হাসিল করা নিঃসন্দেহে সাধারণ ব্যাপার নয়।

এ ছাড়া তিনি পঞ্চান্ন বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (উকুদুল জাম্মান ২২০ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) প্রত্যেক সফরেই তিনি মক্কা মদীনার স্থানীয় ও বহিরাগত ওলামা, মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসীনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

আল্লামা আলী আল কারী মুহাম্মদ ইবনে সামায়াহ'র বরাত দিয়ে বলেছেন, আবু হানীফা (রঃ) তার রচিত গ্রন্থগুলোতে সত্তর হাজারের উর্ধ্বে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর الآثار গ্রন্থটি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে লিখেছেন। (আল-জাওয়াহিরুল মুযীআহ ২ খঃ, ৪৭৪ পৃঃ)

ইয়াহইয়া ইবনে নসর বলেন, একদিন আমি ইমাম আবু হানীফার ঘরে প্রবেশ করি, যা কিতাবে ভরপুর ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কি? তিনি বললেন, এগুলো সব হাদীসের কিতাব' এর মধ্যে সামান্য কিছুই আমি বর্ণনা করেছি, যেগুলো ফলপ্রদ। (আস্ সুন্নাহ ৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য, উক্কুদু জাওয়াহিরিল মুনীফাহ, ১ঃ ৩১)

ইমাম আবু হানীফাহ (রঃ)র যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মত হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন মজলিস ছিল না এবং হাদীসশাস্ত্রে কোন কিতাব সংকলন করেননি। যেমন, ইমাম মালেক (রঃ) করেছেন। কিন্তু তাঁর শাগরিদগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো সংগ্রহ করে বিভিন্ন কিতাব ও 'মুসনাদ' সংকলন করেছেন যার সংখ্যা দশের উর্ধ্বে।

তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হল, ইমাম আবু ইউসুফ রচিত 'কিতাবুল আ'সার'। ইমাম মুহাম্মদ রচিত 'কিতাবুল আ'সার আল মারফুয়াহ ও আল আসারুল মারফুয়াহ ওয়াল মাওকুফাহ। মুসনাদুল হাসান ইবনে যিয়াদ আল লু'লুয়ী। মুসনাদে হাম্মাদ ইবনে ইমাম আবু হানীফা। ইত্যাদি।

অনুরূপ, আল-ওয়াহাবী, আল-হারেসী আল-বুখারী, ইবনুল মুযাফ্‌ফার, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল 'আদল, আবু নায়ী'ম আল ইস্পাহানী, কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকী আল আনসারী, ইবনে আবীল-আউয়াম আস্‌সাদী ও ইবনে খস্‌রু আল-বালাখীও ইমাম সাহেবের হাদীস সংগ্রহে বিভিন্ন মুসনাদ রচনা করেছেন।

অতঃপর প্রধান বিচারপতি আবুল মুআইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল খাওয়ারিযিমী (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরী) উপরোক্ত মুসনাদগুলোর অধিকাংশকে একত্রিত করে জামেউল মাসানীদ নামে ফিকাহশাস্ত্রের অধ্যায়ের ধারাবহিকতায় مع حذف معاد وعدم تكرا رالاسناد মহা 'মুসনাদ গ্রন্থ' রচনা করেছেন। তাঁর ভূমিকাতে তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে অনেকের মুখেই শুনেছি যারা ইমাম আবু হানীফার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা মুসনাদে শাফেয়ী, মুআত্তা মালেকের সাথে তুলনা করে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে, তিনি হাদীস সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তাদের ধারণা যে, ইমাম আবু হানীফার কোন 'মুসনাদ' নেই এবং তিনি সামান্য কিছু ছাড়া হাদীস রিওয়ায়েত করেননি। কাজেই আমি দ্বীনের মর্যাদাবোধের লক্ষ্যে ১৫টি মুসনাদকে একত্রিত করার প্রয়াস পেলাম যা ইমাম আবু হানীফার নিকট হতে হাদীসশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম সংকলন করেছেন। তাঁর এ কিতাবটি আটশত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

এছাড়াও অসংখ্য প্রমাণ ও ঘটনা রয়েছে যা ইমাম সাহেবের অসাধারণ জ্ঞানের এবং হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে তদানিন্তন অনন্য মর্যদার সাক্ষ্য বহন করে। ইমাম সাহেবের জীবনী লেখা যেহেতু আমার উদ্দেশ্য নয় বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা লিখলাম। তার সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী থানুভী (রঃ) রচিত "ইনজাউল ওয়াত্বান আনিল ওয়াদাই বি-ইমামিয্ যামান"। আল্লামা সালেহী আল শাফেয়ী (রঃ) রচিত "উক্বদুল হামান"। আল মুওয়াফফিক আল মাক্কী রচিত "মানাকিবু আবি হানিফাতা" মুহাম্মদ যাহেদ আল কাওসারী রচিত "নাইবুল খাত্বীব"। আলী আল-ক্বারী রচিত "মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফাতা"। দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষায়ও তার জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন বই রয়েছে।

শেষ কথা

যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিতর্কিত ও জটিল একটি বিষয় নিয়ে কোরআন-সুন্নাহ, সাহাবাদের বাণী ও আমল এবং পূর্বসূরী আকাবিরদের রচিত কিতাবাদির আলোকে সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। আশাকরি এ আলোচনা দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

(এক) ফিকাহশাস্ত্র নতুন কোন বিষয় নয়; বরং কোরআন ও হাদীস থেকেই উৎসারিত ফলাফল মাত্র। কাজেই ইমাম আবু হানীফা বা অন্যান্য ইমামদের সংকলিত ফিকাহশাস্ত্রের অনুসরণ করা বস্তুতঃ কোরআন ও হাদীসেরই অনুসরণ করা।

(দুই) সেই সাথে ফিকাহশাস্ত্র সংকলনের বেলায় ফুকাহা ও ইমামদের মাঝে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে তা কোন মতেই নিন্দনীয় নয়। বরং উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ এবং এতে তাঁরা অপারগও বটে। কেননা, তাদের এ মতপার্থক্য কোন প্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা হিংসাপ্রসূত ছিল না বরং প্রত্যেকেরই নিজ সাধ্যানুযায়ী কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইখলাসের সাথে মাসআলা ইস্তিম্বাত করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

(তিন) ফিকাহর এ মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বসূরী ফুকাহায়ে কেরামদের পরস্পরে কখনও অশ্রদ্ধাবোধ বা দ্বন্দ্ব কলহ পরিলক্ষিত হয়নি।

কাজেই তাদের মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আমাদের পরস্পরে কলহ বিবাদ সৃষ্টি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(চার) ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ কল্পনাতীত পরিশ্রম ও জীবনপণ সাধনা করে কোরআন ও হাদীসের সংগৃহীত সকল যুক্তি ও দলিলকে সামনে রেখে ফিকাহ শাস্ত্র সংকলন করেছেন। যার সামান্য একটু চিত্র এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা অনেকটা ভেসে উঠেছে। কাজেই কোন কিতাবের দু' একটি হাদীস বা কোরআনের দু' একটি আয়াতের তরজমা দেখে তাদের এ অকল্পনীয় সাধনাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা অনধিকার চর্চা বৈ কিছু নয়।

(পাঁচ) এ কথাও প্রমাণ করে এসেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) পরবর্তী যুগের ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসদের অপেক্ষা হাদীসশাস্ত্রে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ ছিলেন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রণেতা বা অনুসারী। (মায়ারেফুস্ সুনান–৬খঃ, ৬১৩–৬১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কাজেই তাঁদের রচিত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত দু' একটি হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের বা অন্য কোন মাযহাবের কোন ফতোয়াকে মূল্যায়ন করা মোটেই সংগত নয়। তাই বলে (নাউযুবিল্লা) আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, আমি পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী শরীফকে বা মুসলিম শরীফকে অশ্রদ্ধা করছি। বরং এ যাবৎ আমার দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা অনায়াসেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বুখারী শরীফে বা অন্য কোন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত যে হাদীসটি পাঠকের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যের পরিপন্থী বলে মনে হচ্ছে, হতে পারে হানাফী ইমামদের নিকট সে হাদীসটি 'মানুসূখ' প্রমাণিত হয়েছে, অথবা অন্য কোন প্রবল যুক্তির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ বলে তাঁরা সেটাকে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অনুরূপ, এও সম্ভব যে, তাঁরা যেসব বিশুদ্ধ ও প্রবল দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা পেশ করেছেন সেগুলো উল্লেখিত মুহাদ্দিসদের নিকট আদৌ পৌঁছেনি, অথবা দুর্বল সূত্রে পৌঁছেছে যার কারণে সে সব হাদীস তাদের গ্রন্থগুলোতে স্থান পায়নি। কাজেই কোন হাদীস বুখারী মুসলিমে নেই বলেই তো সেটাকে দুর্বল বা 'মওযু' বলে আখ্যা দেয়া যায় না।

এবার পরিশেষে আরজ করব, আমরা বিতর্কের মনোভাব না নিয়ে

স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। সেই সাথে আমাদের পূর্বসূরী ইমামদের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হতে চেষ্টা করি। তাঁদের অনন্য ইহ্‌সানের কথা ভুলে না গিয়ে তাঁদের ইহ্‌সানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

আরও আরজ করব, বিষয়টি যেহেতু অনেকটা বিতর্কিত ও জটিল কাজেই আমার লেখনীতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা সুধী পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে অথবা আপত্তিকর কোন বিষয় পরিলক্ষিত হলে বা কোন প্রকার প্রশ্ন থাকলে সরাসরি আমাকে জানিয়ে দিলে বাধিত হব। প্রয়োজনবোধে পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ



Contents

গ্রন্থ পঞ্জী

পুস্তিকাটি রচনাকালে যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

١- القرآن الكريم

٢- ترجمة القرآن : حكيم الأمة أشرف على تهانوى رح

٣- تفسير القرآن العظيم : حافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى – المتوفى ـ ٧٧٤ هـ

٤- تفسير الفخر الرازى : (المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب) الإمام محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر (٥٤٤ – ٦٠٤)

• دار الفكر، بيروت، لبنان

٥- الجامع لأحكام القرآن الكريم : للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى (المتوفى ٦٧١ هـ/١٢٧٣م) دار إحياء التراث، بيروت.

٦- تفسير أبي السعود : المسمى ب: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لقاضى القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادى المتوفى ٩٠. دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان

٧- فتح القدير : محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى ـ ١٢٥٠ هـ

٨- مختصر تفسير الطبرى : لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى المسمى ب: جامع البيان عن تأويل آى القرآن، اختصار وتحقيق : الشيخ محمد على الصابونى، والدكتور صالح أحمد رضا، دار التراث العربي.

٩ تفسير معارف القرآن، مفتى محمد شفيع رحمة الله عليه.

١٠ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخارى) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعفى، المتوفى بسنة ٢٥٦ هـ

١١ صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ سنن أبي داؤد، أبو داؤد سليمان بن الأشعث السجستانى

١٣ سنن الترمذى،

١٤ سنن الدارمى، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى. (٢٥٥ هـ)

١٥ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (٩١١ هـ)

١٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ)

١٧ مسند الحميدى،

١٨ مصنف عبد الرزاق

١٩ مصنف بن أبي شيبة

٢٠ مسند الإمام الشافعى، الإمام محمد بن إدريس الشافعى

٢١ رياض الصالحين، الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى، ٦٣١-٦٧٦ هـ

٢٢ صحيح ابن خزيمة، المكتبة الإسلامى، (الطبعة الأولى ـ ١٣٩٥ هـ)

٢٣ سنن النسائى، إحمد بن شعيب النسائى

٢٤ المراسيل، الإمام أبو داؤد سليمان السجستانى المتوفى ٢٩٥ هـ، (الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ)

٢٥ فتح البارى شرح صحيح البخارى، أحمد بن على محمد الكنانى العسقلانى.

٢٦ فيض القدير للمناوى

٢٧ أجر المسالك، شيخ الحديث زكريا رحمه الله المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة

٢٨ المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج، الإمام يحيى بن شرف النووى.

٢٩ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

٣٠ حاسية السندى على النسائى

٣١ مشكل الآثار

٣٢ شرح معانى الآثار، أبو جعفر أحمد محمد بن سلمة الطحاوى ـ ٢٢٩-٣٢١ هـ، دار الكتب العلمية (الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ)

٣٣ اختلاف الحديث، الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت (الطبعة الأولى)

٣٤ ميزان الإعتدال فى نقد الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى، دار المعارف، بيروت

٣٥ الجرح والتعديل، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى، المتوفى ـ ٣٢٧ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

٣٦ تهذيب الأسماء واللغات، الإمام يحيى بن شرف النووى، إدارة الطباعة المنيرة

٣٧ تهذيب الآثار.

٣٨ زاد المعاد فى هدى خير العباد، الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقى، المشهور ب: ابن

القيم الجوزيـة ، مؤسسة الرسالة ومكتبه المنار الإسلاميـة
٣٩ السنة و مكانتها
٤٠ فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، الامام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى ٩٠٢ هـ) دار الكتب العلمية
٤١ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ، حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (٨٤٩ - ٩١١ هـ)
٤٢ ماتمس إليـه حاجة القارى لصحيح الإمام البخارى ، الإمام يحى بن شرف النووى ، دار الفكر عمان
٤٣ الإعتبار فى الناسخ و المنسوخ ، الإمام حافظ أبوبكر محمد بن موسى (المتوفى - ٥٨٤) دار الطباعة المنيرة (الطبعة الأولى)
٤٤ عقود الجواهر المنيفة ، الإمام سيد محمد مرتضى الزبيدى ، مكتبة الرخصى بالأزهر
٤٥ الهداية شرح بداية المبتدى ، على بن بكر المبرغينانى (٥٩٣ هـ)
٤٦ در المختار شرح تنوير الأبصار ، للتمرتاشى محمد بن على الحصكفى
٤٧ رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدين محمد أمين
٤٨ نصب الـراية الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى دار الحديث
٤٩ المناية فى شرح الهداية
٥٠ كتاب المغنى والشرح الكبير
٥١ مجموع فتوى ابن تيمة ، تقى الدين أحمد بن تيمة (٦٣٠ هـ)
٥٢ المجموع شرح المذهب محى الدين يحى بن شرف الدين النووى (٦٧٦ هـ)
٥٣ إحياء علوم الدين، الإمام أبوحامد محمد الغزالى ، المتوفى : ٥٠٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان (الطبعة الاولى ١٤٠٦ هـ)
٥٤ الإحكام فى أصول الأحكام ، لأبى محمد على بن أحمد بن سعد بن أبي حزم الظاهرى دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان (الطبعة الأولى - ١٤٠٥هـ)
٥٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لحافظ أبونعيم بن عبد الله الإصفهانى ، دار الكتب العربى (الطبعة الرابعة -)
٥٦ مناقب الإمام الشافعى ، الإمام فخر الدين الرازى (المتوفى ٦٠٦ هـ)
٥٧ مناقب الشافعى ، الإمام أبوبكر أحمد بن إسماعيل البيهقى (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ)
٥٨ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، حافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى
٥٩ حياة الصحابة ، الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى دار القلم ، دمشق ،
٦٠ آداب الشافعى ومناقبه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان -
٦١ كشف الظنون ، مكتبة المثنى ، بغداد
٦٢ تاريخ بغداد للخطيب ، دار الكتب العربى، بيروت
٦٣ معجم الأدباء ، أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى (شهاب الدين ، دار المستشرقين
٦٤ عقود الجمان فى مناقب أبي حنيفة النعمان
٦٥ حجة الله البالغة ، شاه ولى الله المحدث الدهلوى رحمة الله عليه -
٦٦ أثر الحديث الشريف فى اختلاف الفقهاء ، محمد العوامة ، دار السلام ، بيروت
٦٧ رفع الملام عن الائمة الأعلام ، تقى الدين أحمد بن تيمية
٦٨ الإنصاف فى سبب الاختلاف ، شاه ولى الله المحدث الدهلوى رح
٦٩ دراسات فى اختلافات الفقهية ، دكتور محمد أبو الفتح البيانونى مكتبة الهدى -
٧٠ جامع بيان العلم وفضله ، للعلامه ابن عبد البر
٧١ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعى رح مكتبة العلميه ، بيروت ،لبنان .
٧٢ المعجم الوسيط
٧٣ تقليد كى شرعى حيثت ، مولانا تقى عثمانى
٧٤ فضائل نماز ، شيخ الحديث مولانا زكريا رح
٧٥ فضل علم السلف على الخلف ، لابن رجب الحنبلى
٧٦ إعلام الموقعين ، ابن القيم الجوزية
٧٧ الفقيه والمتفقه ، أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى
٧٨ كتاب الجامع ، لأبى محمد عبد الله بن أبي زيد القيراوانى ، المتوفى : ٣٨٦ ، مؤسسة الرسالة - (الطبعة الثانية -)